স্মরণ অর্ঘ্য

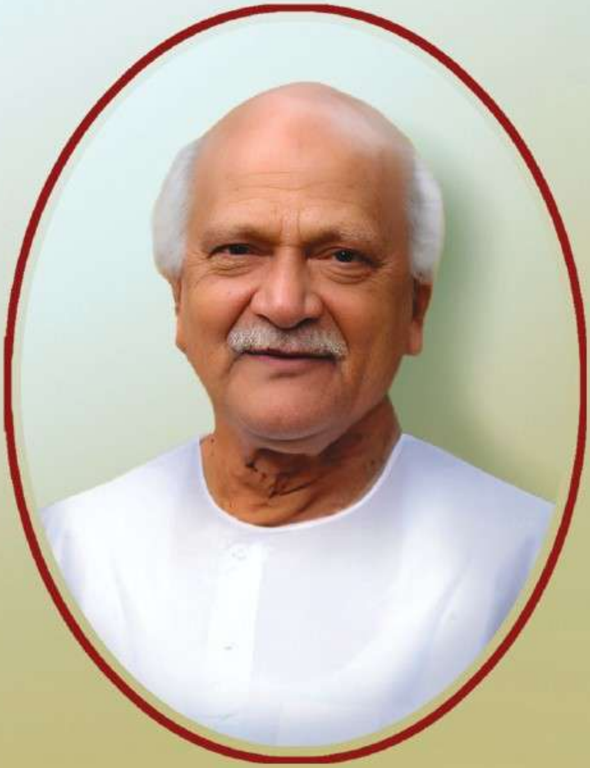

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়

(১৬/০৪/১৯৪১ – ২২/০৫/২০২৩)

শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া

স্মরণ অর্ঘ্য

বিশ্বনাথ রায়

(১৬.০৪.১৯৪১ — ২২.০৫.২০২৩)

শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া

জগুদাসপাড়া রোড

হুগলী

৭১২১০৩

স্মরণ অর্ঘ্য

(SMARAN ARGHYA)

প্রকাশক

ত্রিদিব রঞ্জন সরকার

শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া

জগুদাসপাড়া, হুগলী

৭১২১০৩

website: www.sriaurobindobhavanhooghlychuchura.org

email: *sriaurobindobhavanhc@gmail.com*

Mobile No. : +91 6289840487

প্রকাশের দিন

প্রথম প্রকাশ: ১৫ই মার্চ ২০২৬

সম্পাদনা : গৌতম মুখোপাধ্যায় ।। অমিতাভ সিংহ

প্রচ্ছদ

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা : সকল শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমা কেন্দ্র

পরিবেশক

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা

© শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া

মুদ্রক

বাসব চট্টোপাধ্যায়

শিলালিপি

আদ্যাভবন, ২০-এ, বলাই সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

দূরভাষ ৯৮৩৬০ ৩৭৬০১

বিনিময় মূল্য : চারশো টাকা

যাঁদের চরণ ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের আশ্রয়স্থল
শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের সেই চরণে এই স্মরণ অর্ঘ্য
স্মৃতিকথা উৎসর্গীকৃত হল।

সূচীপত্র

প্রাককথন ৭
বিশ্বনাথ রায় (ত্রিজ রায়)-এর রচনা ১১
প্রয়াণলেখ ৬১

প্রাককথন

বর্তমান প্রকাশনাটি একটি স্মরণ সংকলন যার নাম দেওয়া হয়েছে স্মরণ অর্ঘ্য। একাধিক মানুষের সম্মিলিত ভাবনায় একটি আলোকিত জীবনের পুনর্নির্মাণ। দার্শনিকেরা বলেন মানুষকে অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনার সমষ্টি হিসেবেও যেমন দেখা যায়, আবার মাত্র দু-একটি বড়ো জিনিসের সমষ্টি হিসেবেও দেখা যায়। স্মারকগ্রন্থ তাই আমাদের দুটো সুযোগই এনে দেয়। পরিচিতদের মধ্যে কেউ কেউ অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে খোঁজেন তাঁদের প্রিয় মানুষটিকে—অনেকের অঞ্জলির ভিত্তি আবার দু-একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা। তাই বিশ্বনাথদাকে সম্পূর্ণভাবে জানতে হলে আমাদের পড়তে হবে এই অমনিবাসের প্রতিটি নিবেদন।

বিরাশি বছর বয়সে বিশ্বনাথদার দেহাবসান। শ্রীঅরবিন্দ চর্চায় যারা জড়িত তাদের সম্মিলিত উদ্যোগে কয়েকটি স্মরণসভায় আমরা তাঁর কথা শুনেছি। চুঁচুড়ায় আয়োজিত একটি সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে একটি স্মরণাঞ্জলি প্রকাশিত হবে মূলত হুগলী চুঁচুড়া কেন্দ্রের উদ্যোগে ও অন্যান্য কেন্দ্রের সহযোগিতায়। একইসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে একটি সময়োপযোগী তথ্যচিত্রও প্রস্তুত করা হবে আধুনিক মাধ্যমে স্মৃতিচারণার চিরস্থায়ী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে।

স্মরণসভার আয়োজন এবং স্মরণাঞ্জলি প্রকাশের মধ্যে প্রভেদ কিন্তু অনেকখানি। স্মরণসভায় সবাই বক্তা আবার সবাই শ্রোতা। স্মৃতিকথার জন্যে যখন আমরা লিখতে বসি তখন কিন্তু আমরা শুধুই বক্তা—আমাদের এই স্মৃতিচারণ, কে কবে পড়বে অথবা আদৌ পড়বে কিনা সে বিষয়ে আমাদের কোন ধারণাই থাকে না। এই ধরনের সংকলন আমাদের একটি দুর্লভ সুযোগ এনে দেয় একটি বিরল অনুভবের অর্থাৎ আমি তাকে যেভাবে জানতাম অন্যেরাও কি তাঁকে সেইভাবেই জানতেন? নাকি প্রয়াত মানুষটি ছিলেন আমার নিজস্ব চেনা পরিধির থেকে অনেক অনেক বড়।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ের জীবনের দুটি পর্ব — প্রথম পর্ব ছিল প্রস্তুতি পর্ব— দ্বিতীয়টি ছিল প্রকাশের। প্রথম পর্ব অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় থেকে সর্বজনীন বিশ্বনাথদা

হয়ে ওঠার ইতিহাস। এই পর্বটি আসলে ছিল তাঁর নিজেকে চিনে নেবার journey। এই যাত্রাপথের সময়ে তাঁর অঙ্গে দ্বিজত্বের উপবীত — তখন তিনি দ্বিজ। এই পরিক্রমার মধ্যাহ্নে একদিন দিক পরিবর্তন হল — প্রায় আচম্বিতে আকৃষ্ট হলেন আধ্যাত্বিকতার দিকে। প্রবেশ করলেন শ্রীঅরবিন্দ ভাবলোকের তরঙ্গস্রোতে। সে ছিল এক অকপট সমর্পণ; দৃঢ় করে বাঁধা হয়ে গেল হৃদয়ের গ্রন্থিটি। মায়ের আশ্রয়ে নিজেকে বোধহয় সঁপে দিয়েছিলেন এই বলে:

জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে
জানি নাই
আমি ধুলায় বসে খেলেছি এই তোমার দ্বারে
জানি নাই...

যে ব্রতটি সেদিন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এক নিষ্ঠাবান ব্রতচারীর মতো নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন সেই ব্রতের শৃঙ্খলায় — আর এই নবজন্মেই তিনি হলেন ত্রিজ। সাহিত্যচর্চায় তাঁর পরিচিতি এই 'ত্রিজ রায়' নামেই। অনুমান করা যায় পরিচিত জনেরা তাদের বিভিন্ন লেখায় তাদের এই প্রিয় মানুষটির একাত্ম, দ্বিজত্ব ও ত্রিজত্বের প্রকৃত রূপ নির্ধারণের প্রচেষ্টাতেই বোধহয় নিমগ্ন থাকবেন।

এবার দ্বিতীয় পর্বের কথা। এই পর্ব কিন্তু বিপরীতমুখী — এইপর্ব আসলে আমাদের তাঁকে চিনে নেবার পর্ব। এই বাঁধনহারা 'মত্ত প্রলাপে'র সময়ে তাঁর ভাবনা ও লেখালেখি ফিরে দেখা তাই জরুরি। সেই চিনে নেবার-ই একটি প্রয়াস তাই এই স্মৃতিঅর্ঘ্য। মৃত্যু এসে প্রাণ নিয়ে গেলেও জীবনের স্মৃতি কি আর নিয়ে যেতে পারে? তিনি তো শুধু জীবন ধারণ করেননি — বেঁচে ছিলেন — শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। জীবনের সায়াহ্ন কালেও ছিল যৌবনোচিত উদ্যম নিয়ে বেঁচে থাকা — যুগের উপযুক্ত হয়ে বেঁচে থাকা।

বক্তা হিসেবে এমন তেজস্বী মানুষটি স্বভাবে ছিলেন কিন্তু মৃদুভাষী। তাঁর সামনে যখন সবাই বিপুল উত্তেজনায় তুমুল তর্কে চারিদিক কাঁপিয়ে তুলেছেন, তিনি কিন্তু মৃদু হাস্যে, সংযত ব্যবহারে পরিস্থিতি সামলে দিতে জানতেন এবং সামাল দিতেন। পরিণত বয়সেও 'শ্রীঅরবিন্দঃ শরণং মম' এই মন্ত্রে জয় করেছিলেন বার্ধক্যের মানসিক আলস্য। তাই চলার পথে কাঙ্খিত সকল ক্ষেত্রেই সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। একাধারে কাব্যবিশারদ, সুলেখক, গবেষক, সংগঠক, বিনীত কর্মী, শিক্ষক, আকর্ষণীয় বক্তা — তাঁর বক্তৃতার ভাষা ও ভঙ্গি সময় সময় আগ্নেয়াস্ত্র হয়ে উঠত। পরিপূর্ণ বাঙালি মানসিকতায় মোড়া একটি চরিত্র অথচ উদাসীনতা শব্দটি তাঁর অভিধানে ছিল না। যুগপোযোগী আধুনিক মাধ্যমকে গ্রহণ ও পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেবার অসাধারণ

ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। ঘরবন্দী কোভিড পরিস্থিতিতেও তাই তিনি ছিলেন সমান সক্রিয়।

কথামুখ লিখতে বসে মনে পড়ছে জীবনের অনেকখানি পথ আমরা একসঙ্গে অতিক্রম করেছি এই বলয়ের বিভিন্ন কর্মসূচির সূত্রে। এই যাত্রায় ভালোমন্দের সঙ্গে সার্থকতা ও ব্যর্থতা যা কিছু এসেছে আমরা দুজনেই তার সমান অংশীদার। কর্মী হিসেবে যেটুকু প্রস্তুত হয়েছি সেটা তাঁর অধীনে apprentice থাকার ফলেই — নাবালকত্বের গন্ডি অতিক্রম করে, কর্মী হিসেবে আমরা অনেকেই সাবালক হয়েছি তাঁর হাত ধরেই। নতুন নতুন গুণী মানুষদের সুভদ্রতার স্বচ্ছ আচরণে বরণ করে নেবার অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। জেলায় জেলায় তাই তাঁর ক্রমবর্ধমান অনুগামী অথচ দৃঢ়তা দেখানোর প্রয়োজন হলে অনুগামীদেরও সঠিক বার্তাটুকু পৌঁছে দিতেন নিজস্ব ভঙ্গিমায়।

এই সংকলনে সুধীজনের একাধিক স্মৃতিচারণা প্রকাশিত হচ্ছে। সে সব লেখায় একজন মানুষ হিসেবে তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রাক প্রকাশনাকালে সেই সব লেখার একটিও পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। অনুমান করে নিয়েছি যে সকলেই তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সমকালীন শ্রীঅরবিন্দ প্রেক্ষাপটে তাঁর ভূমিকা বিশ্লেষণে। প্রাককথন প্রস্তুতির সময় আমি ইচ্ছাকৃতভাবে যে স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ করেছি তা শুধুমাত্র এই বিশ্বাসে, যেন এই প্রাককথন কোনভাবেই আমার একার প্রাককথন হয়ে না ওঠে। এই নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় যেন আমি এই সংকলনের সকল অংশীদারদের সম্মিলিত ভাবনার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারি। আর একটি কথা বোধহয় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই সংকলন কিন্তু একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংকলন নয়। এই সংকলনে স্মৃতিচারণায় অংশগ্রহণ করেছেন যতজন তার থেকে অনেক অনেক বেশি মানুষ এই গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এই বিয়োগবেদনা প্রকাশের ভাষা তাঁদের ভিন্ন। সংখ্যায় সত্যিই তাঁরা কিন্তু কম নন যাঁরা এই বৃত্তের বাইরে থেকেই নীরবে স্মরণ করছেন তাঁদের দীর্ঘ দিনের প্রিয় পথপ্রদর্শককে।

আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে এই সংকলনের একটি সহোদরও আছে — সেটি একটি তথ্যচিত্র। পড়ার থেকে শোনা যাদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় তারাও বিশ্বনাথদেরকে ফিরে পাবেন ঘনিষ্ঠজনদের বক্তব্যের মধ্যে। আসলে স্মৃতিসংকলন ও তথ্যচিত্র একে অপরের পরিপূরক — পড়তে পড়তে শোনা আবার শুনতে শুনতে পড়া।

এই সুযোগে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্বনাথদার সহধর্মিণী প্রণতিদি ও কন্যা পরমাকে। এই উদ্যোগটিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ডাঃ দীপ্তেন্দু শেখর ভট্টাচার্য প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁর স্বভাবসুলভ নিষ্ঠা ও দৃঢ়তায়। এই সংকলন

প্রস্তুতিতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছেন শ্রী আশিস কুমার রুদ্র। হুগলী চুঁচুড়া ভবনের সকল সদস্য এই যৌথ পরিক্রমা অর্থাৎ সংকলন ও তথ্যচিত্র প্রস্তুতিতে নিরন্তর সহযোগিতা করেছেন। সারা বাংলা ঘুরে (এবং বাংলার বাইরেও) সুধীজনদের স্মৃতিচারণ এবং প্রয়োজনে তথ্যচিত্রে অংশগ্রহণে আমরা কৃতজ্ঞ। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির ও লক্ষ্মীহাউসের বিশ্বনাথদার সহকর্মী ও সহযোগীদের নিরবচ্ছিন্ন সাহায্য ভোলার নয়। কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবনে তথ্যচিত্র প্রস্তুতিতে বিশ্বনাথদার ছাত্রদের স্মৃতিচারণা এই পর্বের একটি বিশেষ আকর্ষণ। নবীন যুবক দিব্যদূত রায়চৌধুরী বিশ্বনাথদার বিশেষ স্নেহের পাত্র — তথ্যচিত্র নির্মাণ ও সম্পাদনায় তাঁর team কে নিয়ে অসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

সব শেষে গৌতমদার কথা — হুগলী কেন্দ্রের শ্রী গৌতম মুখোপাধ্যায়। একজন কৃতি সম্পাদকের যেসব গুণকে লেখকরা ভয় পান তার সব কটিই পুরোদস্তুর আছে বর্তমান সংকলনের সম্পাদকের। গ্রন্থ-গঠনে তাঁর তাগাদার একনিষ্ঠতা যে কোন ভাবী সম্পাদকের কাছে সত্যিই শিক্ষণীয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের, বিভিন্ন কেন্দ্রের মানুষদের আলস্যকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। লেখা সংগ্রহ থেকে প্রুফ দেখা, ছবি নির্বাচন, প্রচ্ছদ, গ্রন্থের সামগ্রিক নান্দনিক বৈশিষ্ট্য— প্রতিটি ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ তাঁর একাগ্রতা ও মুন্সিয়ানার ছাপ বহন করছে। তাঁকে সকলের পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমাদের কাছের মানুষ চলে গেছেন দূরে — কোন পথে? কোন সুদূরে?

যে পথ সকল দেশ পারায়ে উদাস হয়ে যায় হারায়ে
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরাণ যেতে চায় কোন অচিনপুরে।

বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কলকাতা

বিশ্বনাথ রায় (ব্রিজ রায়)-এর রচনা

স্বাগত শ্রীঅরবিন্দ ।। ১৩
ভবনকর্মীর কথা ।। ১৫
চরণতীর্থের সন্ধানে ।। ১৭
চৌঠা এপ্রিল, ২০১০ : শ্রীশংকর চেট্টিয়ারের বাড়িতে ।। ২০
ডি. এন. কলেজের প্রথম পর্বের দিনগুলি ।। ২৫
শ্রীঅরবিন্দ ও 'হুগলী অধিবেশন'-এর সভাপতি বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন ।। ২৮
যেমন দেখেছি ।। ৩৭
শ্রীঅরবিন্দের 'কারাকাহিনী' প্রসঙ্গে ।। ৩৯
সমাজ নয়, সংঘ ।। ৪৪
সংঘজীবনে অর্থব্যবস্থা ।। ৪৭
শ্রীঅরবিন্দের গ্রামভাবনা ।। ৫৪
শ্রীঅরবিন্দের অভূতপূর্ব কারাবাস ।। ৫৭

স্বাগত শ্রীঅরবিন্দ

ত্রিজ রায়

[স্বভাবগত ভাবে বিশ্বনাথদা অনুভূতির প্রকাশে স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। প্রসঙ্গ উঠলে এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু কখনও কখনও প্রকাশ হয়ে যেত। এরকম দুটি অনুভবের কথা 'স্বাগত শ্রীঅরবিন্দ'-তে প্রকাশ পেয়েছে।]

... বছর পাঁচেক আগের কথা বোধহয়। ফিরছি কলকাতার কাজ সেরে। শ্রান্ত শরীর। ভিড় ভেদ করে প্রতিদিনের মত সেদিনও উঠেছি ট্রেনে। ছাড়ার সময় হয়ে আসছে, চাপে শ্বাস বন্ধ হওয়ার মত। এমন সময় লক্ষ্য করলাম, ঠাসা মানুষের ফাঁক ফোকর দিয়ে ভেতর থেকে একজন আমাকে ইঙ্গিতে তাঁর দিকে যেতে বলছেন। পরিচিত নন। ভুল করছেন না তো? অপেক্ষা করি। কিন্তু এবার তিনি বললেন , এগিয়ে আসুন। ওঁকে একটু আসতে দিন না, - ভদ্রলোকের অনুরোধ চারপাশের লোককে। আশ্চর্য! অস্বস্তিতে পড়ি। যাওয়া সম্ভব নয়। ভদ্রলোক উঠছেন, বসছেন। বয়স বছর তিরিশেক। কে? কোথাও পড়িয়েছি কি? এ অঞ্চলে আমার ছাত্র থাকার কথা নয়। কোন্নগরে সামান্য যে সময় পড়িয়েছি, তখনকার কি? সে সময়ের ছাত্র হলে তার বয়স কোন অবস্থাতেই চল্লিশের নীচে হবে না। এসব ভাবতে ভাবতে, চোখ বুজেছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার হাত টেনে ধরেছেন উনি, অর্থাৎ ঠেলেঠুলে একটু জায়গা করে অনেকের বিরক্তি, কটু কথা শুনেও আমায় তাঁর নিজের জায়গাটুকুতে বসিয়ে তৃপ্তিতে দাঁড়ালেন। এবার আমার পালা। শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রকে চিনতে না পারার মত লজ্জা আর কিছুই নেই। চালাকি করে বলি – কোথাকার, লেক এভিনিউ না মুর্শিদাবাদ....... আমার কথাকে আর এগোতে না দিয়ে তিনি বললেন – আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি আপনাকে চিনি। আপনি তো বিশ্বনাথ দা; তাই না? শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্সের সঙ্গে ছিলেন। ভদ্রলোক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। জোর করে চোখের জল আটকে রাখলাম। আরে! এই তো আমার Identity, এই তো

আমার সত্যকার পরিচয়, তাঁর সঙ্গে পথ চলেছি। ট্রেন চলতে থাকে, থামে চলে, ভিড় কমে; ভদ্রলোক নেমে যান, মৃদু হাসির বিনিময় হয়। চন্দননগর, চুঁচুড়ার ওপর দিয়ে যাই, আর ভাবি এই যেটুকু পেলাম তাঁর সাথে থেকে, এতো আমার রাজসিংহাসন। ট্রেন ফাঁকা হয়ে গেছে। হুগলী এসেছে। সাইকেলে পথ চলায় কাঁদতে বাধা নেই। এ জলের স্বাদ আলাদা, এতে হারানো নেই, রয়েছে প্রাপ্তির, স্বীকৃতির আনন্দ।

আর এক সন্ধিক্ষণের কথা মনে পড়ছে, ১৯৮৯-এর ৩১শে আগস্টের মধ্যরাত। আগস্টের শেষ সেপ্টেম্বরের শুরু। করমণ্ডল এক্সপ্রেস তীব্রবেগে ছুটে চলেছে। আমার আসন ৭ নং। সামনের ক্যুপটির মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের ছবির নীচে তাঁর জাগ্রত উপস্থিতি বহন করে আধারটি ফুলে ফুলে ঢাকা। ভেতরে রাতের প্রহরায় থাকা ভক্তরা হয় মাঝে মাঝে ফুলের সাজ পালটে দিচ্ছেন অথবা ধ্যানে চুপ। সারা কামরায় প্রতিটি আসনে প্রায় সকলেই শুয়ে পড়েছেন, দু'চারজন নীরবে তাদের পরদিনের দায়িত্বের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সমস্ত বগিতে নৈঃশব্দ; শুধু ট্রেনের দ্রুতগামিতার শব্দ মাঝে মাঝে আরও তীব্র হয়ে উঠছে মনে হয় যান্ত্রিক কারণে।

আমি গা এলিয়ে রয়েছি আসনে। শরীরে মনে ক্লান্তির চিহ্ন নেই। বাঁদিকে তাকালে রাজরাজেশ্বরের মহিমময় মূর্তি, ডানদিকে বাইরের ঘোর ঘন অন্ধকার রাত। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ে, আবার থেমে যায়; তখন এমনকি আকাশে তারা দেখা যায়। ঠিক কটা বলতে পারব না, বারোটা বা তার কাছাকাছি। গাড়ি উড়িষ্যায় ঢুকে গেছে। আমি শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। তারা ফুটেছে। অসংখ্য তারা। তারার সমুদ্র। তারা তারা তারা। হঠাৎ খোলা চোখে আমার এক আশ্চর্য অনুভব হল। অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে মহাকাল ভেদ করে ছুটে চলেছে শ্রীঅরবিন্দদেবের রথ, আর আমরা তাঁর সঙ্গে চলেছি। এটা ট্রেন নয়। লোকেরা কেউ ঘুমিয়ে নেই। সবাই চলছে। সবাই তাঁর সঙ্গে এগিয়ে চলছে। এগিয়ে চলছে। বোধহয় কয়েক সেকেন্ড এ অভিজ্ঞতা স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু তা আমার সমস্ত চেতনাকে নাড়া দিয়ে গেল। কেউ জানতে পারল না, অস্ফুটে সাহানাদির কয়েকটা লাইন আমার ঠোঁটে ফুটে উঠল ,

'জীবন তব চরণে বাঁধি
কর গো চির চলার সাথী
তরণী মম আপন হাতে
আপনা পানে ভাসাও ......
ডেকেছ যদি দিও না যেতে
ঘিরিয়া মোরে দাঁড়াও'

তিনি ডেকেছেন বলেই তো আমরা তাঁকে ডাকতে পেরেছি। আমাদের আহ্বান 'স্বাগত শ্রীঅরবিন্দ' তাঁরই আশীর্বাদে চিরজীবী হোক।

[উৎস: স্বাগত শ্রীঅরবিন্দ পৃ. ৩৫-৩৬, প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া]

ভবনকর্মীর কথা

ত্রিজ রায়

সেপ্টেম্বর ফিরে এল। ফিরে এল মূল্যায়ণের বাৎসরিক সুযোগ। এখনও ভবন স্থূলে রূপ নিতে পারে নি। একখণ্ড ভূমি, তার আইনগত অধিকারের সীমানায় এখনও এলো না।

প্রশ্ন—কিসের অভাব?

উত্তর—অর্থের।

—তার প্রচেষ্টা কতদূর?

—কর্মীরা জানিয়েছেন অর্থের প্রয়োজন। গ্রহণের ব্যবহারিক ব্যবস্থা রয়েছে।

—এতেই কি তা সম্ভব?

—মায়ের কথা মনে পড়ে। সেটা ১৯৩৮ সাল।

মায়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় একজন মায়ের কাছে একটি বিবৃতি চাইল, কাজের সুবিধার জন্য। তখন, মা লিখেছিলেন—

"I am not in the habit of writing for money from anybody. If people do not feel that it is for them a great opportunity and grace to be able to give their money for the Divine cause, *tant pispour eu*! (so much the worse for them.!) Money is needed for the work –money is bound to come as for who will have the privilege of giving it, that remains to be seen."

(কারও কাছে টাকা চেয়ে লেখার অভ্যাস আমার নেই। যদি লোকেরা না অনুভব করে যে, দিব্য প্রয়োজনে তারা যে অর্থশক্তি যোগাতে পারছে, সেটা তাদেরই পক্ষে বিরাট সুযোগ এবং ভগবৎ করুণা—তা হলে এ তাদেরই দুর্ভাগ্য! কাজের জন্য অর্থশক্তি প্রয়োজন, এবং অর্থ আসতে বাধ্য। এখন শুধু এই দেখার অপেক্ষা, যে কে দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে।)

শ্রীঅরবিন্দ ভবন মায়ের। কর্মী মায়ের বাক্যে আস্থা রেখে, সেই সুযোগ-গ্রহীতাদের অপেক্ষায় থাকবেন। এর চেয়ে পৃথক ভূমিকা নেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ভবন, তা'তো থেমে নেই।

আলোকিতমুখর নগরীর ব্যস্ত রাজপথের পাশে নীরব শান্ত গলিপথে প্রতি সন্ধ্যায় সুনির্দিষ্ট সময়ে খুলে যাচ্ছে সুরভিত আসন। দূরান্তের প্রার্থী তাঁর আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন সাধন-পাথেয়। গ্রন্থাগার, রত্নের তালিকা বাড়িয়ে চলেছে। সাপ্তাহিক পাঠচক্রটি অনুভব করে জিজ্ঞাসুর সংখ্যার পক্ষে কক্ষটি আর একটু প্রশস্ত হলে ভাল হত। ফেব্রুয়ারীতে গত ক'বছর ধরে অনুরাগীরা ব্যক্তিগত সম্মেলনে মিলছিলেন—এবার পরিধি বাড়ল। কাছেই ত্রিবেণীতে রূপ নিয়েছে মায়ের আর এক আসন শ্রীঅরবিন্দ মন্দির। সেখানে ভবনে-মন্দিরে মিশে ফেব্রুয়ারীর একটি দিন উৎসর্গ হল। কর্মীদের আস্পৃহা ও কর্মের আদান প্রদান হল। এই প্রথম, শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া, তাদের অঞ্চলের বাইরে অনুষ্ঠান নিবেদন করলেন।

গত সেপ্টেম্বর ছিল চুঁচুড়ায় শ্রীঅরবিন্দের পদার্পণের ৭৫তম বার্ষিকী। '৪-৫-৬' তিনদিন সন্ধ্যায় কেন্দ্রকক্ষ ধ্যানে নীরব। ৯ই সেপ্টেম্বর, রবিবার রবীন্দ্রভবনে নিবেদিত হল—শ্রীঅরবিন্দ প্রণাম। বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম করে আজও সেদিনের দিব্যস্মৃতি অনেকের ওষ্ঠ ছুঁয়ে যায়। এই উপলক্ষ্যে ভবন, প্রথম প্রকাশ করলেন বাৎসরিক স্মরণিকা। একাজে যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরাও তাঁদের আনন্দ গোপন রাখেন নি। কিন্তু সব ছাপিয়ে গেছে একটি বাক্যে—আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত বিভাগ যখন লিখলেন— 'We congratulate you for the beautiful work you have done–the high quality of printing and get up."

এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কি হতে পারে, আমাদের কাছে? তাই বলছিলাম, কাজ থেমে নেই। কিন্তু, তবু মাঝে মাঝেই মায়ের স্বর ভেসে আসে। শান্তিনিকেতনের শ্রীঅরবিন্দ নিলয়কে দেয়া বাণীতে মা বলেছিলেন- 'To open a centre is not sufficient in itself. It must be the pure hearth of a perfect sincerity in a total consecration to the Divine.

Let the flame of this sincerity rise high above the falsities and deceptions of the world.'

(একটি কেন্দ্র শুরু করাই যথেষ্ট নয়। তাকে হয়ে উঠতে হবে, পরমের কাছে পূর্ণ নিবেদনে পূর্ণ আন্তরিকতার পবিত্র যজ্ঞকুণ্ড।

পৃথিবীর সমস্ত মিথ্যা ও প্রতারণাকে ছাড়িয়ে এই আন্তরিকতার শিখা উঠে চলুক ঊর্দ্ধ হতে আরও ঊর্দ্ধে।)

কি আমরা করতে পারি নি, বা কি আমরা করতে চেষ্টা করেছি, তখন ম্লান হয়ে যায়। এক সুগভীর দায়িত্ববোধ আমাদের নত করে দেয়। প্রার্থনা ছাড়া অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে না। শুধু বলার থাকে-'মা, আমরা যেন তাই হতে পারি।'

উৎস:—শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া স্মরণিকা ১৯৮৫

চরণতীর্থের সন্ধানে

ত্রিজ রায়

নিজের দিকে তাকিয়ে সে হাসে। কি রয়েছে ঐ ঘরে যার জন্য সে বারে বারে ঘুরে আসে? সন্ধ্যায় শ্রান্ত শরীরটি যখন এগিয়ে দেয় গলিপথে, ছোট্ট ঘরটির ভেতর থেকে ঠিকরে আসা নীল আলোর কণা কি এক প্রশান্তির নিশ্চয়তা নিয়ে আসে। এটি হুগলী-চুঁচুড়ার শ্রীঅরবিন্দ ভবনের অস্থায়ী কর্মকেন্দ্র—ছোট একটি ভাড়া-করা ঘর।

এখন সন্ধ্যা নয়। সেপ্টেম্বরের পড়ন্ত দুপুর। ঘরটিতে নানা বয়সের পুরুষ মহিলা -এঁরা এসেছেন নানা প্রান্ত থেকে। স্থান পর্যাপ্ত না হওয়ায় কেউ কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে। এদের পরিচয়-এঁরা শ্রীঅরবিন্দকে ভালবাসেন। এই একটি পরিচয়েই সেও তার জীর্ণ অতীত নিয়ে এঁদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে।

যাত্রা শুরু করার আগে কি এক নীরবতা সকলকে ঘিরে ধরে। প্রত্যহের গ্লানি মুছে যায়। তীর্থযাত্রীর চন্দনস্পর্শ ছুঁয়ে যায় সকলকে। ভবন ব্যবস্থা করেছেন, পঁচাত্তর বছর আগে শ্রীঅরবিন্দ চু'চুড়ায় এসে যেখানে বসেছিলেন, যেখানে সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই পুণ্যস্থল স্পর্শ করার সুযোগ করে দেবেন ভক্তদের।

গলিপথ পার করে ক্ষুদ্র এই জনগোষ্ঠী নেমে এল মূল রাজপথে। তার ভেতরে কে যেন বলে উঠলো—এর উপর দিয়েই তাঁর গাড়ীটি বাঁক নিয়েছিল ডাইনে।

গত কয়েকটি বছর ধরে সে খুঁজে চলেছে পত্রপত্রিকার কোনা—শ্রীঅরবিন্দের চুঁচুড়ায় পদার্পণ বিষয়ে সংবাদের আশায়।

আজ আর 'ডাচ ডান্সিং হল' স্মৃতিতে নেই কারও; 'শ্রীগৌরাঙ্গ নাট্যমঞ্চ' প্রবীণদের মন থেকে বিদায় নিতে বসেছে। তবু তা এখানেই ছিল। দর্শনার্থীদের সে দেখায় পুরাতন পাঁচিলের ইটগুলি। নবনির্মিত বাড়ীর ভিত্তিতে প্রাচীন অট্টালিকার অবশেষ দেখিয়ে সে উৎসাহীদের স্মরণ করিয়ে দেয় এরই চত্বরে ১৯০৯-এর ৫ আর ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি স্থূলদেহে দাঁড়িয়েছিলেন, কথা বলেছিলেন।

চত্বরের একপ্রান্তে নবনির্মিত গৃহের ছাদ থেকে জঙ্গলাকীর্ণ অবশিষ্ট অংশটুকুর দিকে তাকিয়ে সে হারিয়ে যায় অতীতে। দেখে, জামার একটি হাতের বোতাম খোলা, মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বলে চলেছেন শ্রীঅরবিন্দ—

'Now we are extremely anxious for the Unity of the Congress– we are anxious we should throw no obstacle in the way of any hope of union............

শেষ লোকটিও চলে গেছে দেখে সে দ্রুত নেমে আসে। গলির অপ্রশস্ত পরিসরে হঠাৎ এতগুলি অপরিচিত মুখ দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা উৎসুক হন। 'ওঃ শ্রীঅরবিন্দ এসেছিলেন? এখানে? কবে?...'

উত্তর অসমাপ্ত থাকে, কেননা এখন যাত্রা সেই ঘরে, যেখানে এসে তিনি প্রথম বসেছিলেন। এর আগে আরও দু'একবার এসেছে সে। প্রশ্ন করেছে, বাড়ীর বর্তমান বাসিন্দাদের, নানাবিষয়ে। তাঁরা শুনেছেন, জানেন—শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন তাঁরা। কিন্তু প্রয়োজন দুস্তর। ঘরটি প্রত্যহের সাধারণ ব্যবহারেই রয়েছে।

এঘরে সকলকে নিয়ে আসার আগে তার একটু সংশয় ছিল। বর্তমান কি অতীতকে ধরাতে পারবে? কিন্তু ঘরে পা দিতেই সে বুঝল—মনের বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসা তার এখনো হয় নি। প্রতিদিনের এই ঘরখানি কোন এক আশ্চর্য যাদুতে পৃথক হয়ে গেছে। এখানেই কি এসেছিল সে কয়েকদিন আগে দর্শনের ব্যবস্থার জন্য! ঘণ্টাখানেক মাত্র আগে একজন কর্মী শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের ছবি রেখে ফুল ধূপ দিয়েছেন। ঘরটিতে রয়ে গেছে দৈনন্দিন ব্যবহারের সবকিছুই। তবে কি যেন নেমে এসেছে এখন! কোথাকার স্তব্ধতা! এপথের নবীন যাত্রীর পাশে প্রবীণেরা নিস্তব্ধ হয়ে বসে। সে দেখল যাঁরা গত চার দশকেরও বেশী আশ্রম সান্নিধ্যে রয়েছেন, দর্শন করেছেন শ্রীঅরবিন্দ-শরীর, বসেছেন বছরের পর বছর শ্রীমায়ের পায়ের নীচে, যাঁরা মায়ের নির্দেশে আশ্রমের বাইরে শ্রীঅরবিন্দ কর্মধারায় নিযুক্ত—তাঁরাও কি যেন পাচ্ছেন।

কিন্তু সময় দাঁড়িয়ে থাকে না। একে একে ধ্যান থেকে উঠে আসে সকলে। আসবার আগে সে লক্ষ্য করে, এঘরটি পুরাতন সবকিছুই বজায় রেখেছে। বিরাট জানালার ভিতর দিয়ে তার চোখ পড়ে ভিতর-বাড়ীর ঠাকুর দালানে। বর্তমান মুছে যায়।

বহুলোকের পদধ্বনি তার কানে ভেসে আসে। শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদী দলের সদস্যরা এ বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছেন। মধ্যপন্থী ও জাতীয়তাবাদীদের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছে। সমস্ত প্ররোচনা ও চাপের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আদর্শে স্থির অথচ ঐক্যপ্রচেষ্টায় অটল।

স্মৃতি ছিঁড়ে যায়। আবার পথে। গন্তব্য-রবীন্দ্রভবন। আর ক'মিনিট বাদেই শ্রীঅরবিন্দ প্রণামের অনুষ্ঠান সেখানে। কত কথা ভীড় করে আসে। এঘরটিতে তিনি প্রথম এসে বসেছিলেন; কিন্তু এক মারাঠী প্রতিনিধি বলেছেন, তাঁর ব্যবহারের পৃথক ঘরের কথা। সে ঘর কোন্‌টি ? অধিবেশনের স্থান ছাড়াও শ্রীঅরবিন্দ অন্যত্র গিয়েছিলেন, বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভা অন্যত্র হয়েছিল। সে বাড়ী কোথায়? যাঁরা তাঁকে নেতা বলে মেনেছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের কথা আমরা সামান্যই জানি। আরও কত নাম-না-জানা রয়ে গেলেন, যাঁরা সেদিন অর্ঘ্য সাজিয়েছিলেন শ্রদ্ধার। আর যাঁরা বিরোধিতা দিয়ে তাঁকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন, তাঁরা কারা? তাঁদের পরিচয়?

সব জানতে ইচ্ছে করে। সব?

—কি দরকার এসবের? এর কি প্রয়োজন সাধনায়।

—কেন? আশ্রমে সব কর্ম নিবেদনের সঙ্গে গড়ে ওঠে নি আরকাইভস্? সামান্যতম আঁচড়টিও অমূল্যের মর্যাদা পেয়েছে। তিলে তিলে তথ্যের পঞ্জীতে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ইতিহাস ভরে উঠছে আরকাইভসের পত্রিকায়। কি নিষ্ঠা! কি আন্তরিকতা!

কর্মে আন্তরিকতাই তো সাধনার চাবিকাঠি। মনে পড়ে, মা বলেছিলেন, ইতিহাস চর্চাও তাঁর কাছে নিয়ে যায় আমাদের। ভাবে সে—চুঁচুড়ায় শ্রীঅরবিন্দের আসার নিখুঁত ইতিহাস কি আমরা পাব না?

এক নীরব প্রার্থনা তাঁর হৃদয় থেকে উঠে যায়। সে এসে পড়েছে, আলোকিত অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে। সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় সে একবার ঘুরে দাঁড়াল তাঁর পদস্পর্শ-ধন্য বাড়ীটির দিকে।

মায়ের আশ্বাস মনে পড়ে তার—

"It is never in vain that an ardent and sincere prayer is addressed to the Divine's grace." 'ভগবৎ-করুণার কাছে কোন একান্ত, আন্তরিক প্রার্থনাই বিফলে যায় না।'

[উৎস:— শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া স্মরণিকা ১৯৮৫]

চৌঠা এপ্রিল, ২০১০ : শ্রীশংকর চেট্টিয়ারের বাড়িতে

ব্রিজ রায়

শ্রীঅরবিন্দের মূর্তি নিয়ে গাড়ী এসে থামল, শ্রীশংকর চেট্টিয়ারের বাড়ির সামনে। আজ ৪ঠা এপ্রিল ২০১০, এখন দুপুর আড়াইটে। ভক্তরা মূর্তি নিয়ে উঠছেন গাড়ির ভিতরে।

এই সেই মূর্তি, যাঁকে ভক্তরা কেমব্রিজ থেকে নিয়ে এসে বোম্বাইয়ের আপেলো বন্দরে ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সালে বিশেষ অনুষ্ঠান করেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশ প্রত্যাগমনের স্মারক-রূপে। সেখান থেকে মূর্তি নিয়ে তাঁরা চলে যান বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ নিবাসে। শতবর্ষ পূর্বের স্মৃতি মনে রেখে তেরো বছর পরে গুজরাটের ভক্তবৃন্দ বাংলার উদ্দেশ্যে রওনা হন ১৯শে জুন ২০০৬ সালে। কলকাতায় পৌঁছে বিশেষ অনুষ্ঠানের পর তাঁরা মূর্তির দায়িত্ব দিয়ে যান শ্রীঅরবিন্দ ভবনকে। সেই থেকে শ্রীঅরবিন্দের মূর্তি চার বছর ধরে তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ দিনের স্মৃতি বহন করে বহু জায়গায় প্রণামের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শেষে ৩১শে মার্চ ২০১০ চন্দননগর থেকে মূর্তি এসে পৌঁছয় কলকাতায়। শ্রীঅরবিন্দ নিজে জানিয়েছেন চন্দননগর থেকে পণ্ডিচেরী যাওয়ার পথে, তিনি দু'মিনিটের জন্য কলেজ স্কোয়ারের বাইরে থেমে ছিলেন। (In his passage from Chandernagore to Pondicherry Sri Aurobindo stopped only for two minutes outside College Square.) সেজন্য, সময় স্থান স্মরণে রেখে সমবেতভাবে প্রণামের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। পয়লা এপ্রিল, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির থেকে মূর্তি নিয়ে ভক্তরা রওনা হন পণ্ডিচেরীর উদ্দেশ্যে। ৩রা এপ্রিল মাদ্রাজে নেমে শ্রীমায়ের লেক আবাসে মূর্তি এসে পৌঁছয়। আজ দুপুরে সেখান থেকে রওনা হয়ে শ্রী শংকর চেট্টিয়ারের বাড়ি। চোখের সামনে ভেসে উঠল দীর্ঘ যাত্রা। আর কিছু পরে, শতবর্ষ পূর্বে তাঁর পণ্ডিচেরীতে পদার্পণের শুভ মুহূর্ত স্মরণ করে শ্রীঅরবিন্দের মূর্তি অর্পণ

করা হবে আশ্রমে, বিকেল চারটেয়।

যিনি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী বাসের ব্যবস্থা করতে আগেই উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁর লেখা মনে পড়ল। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছিলেন—'তামিল বন্ধুরা তাঁকে যে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে উঠালেন সেটি ভাড়া-বাড়ি নয়, সেটি শহরের গণ্যমান্য একজন ভদ্রলোকের বসত-বাটি। এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত শংকর চেট্টিয়ার। ইনি ব্যবসায়ী এবং শহরের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। এরই বাড়ির ত্রিতলটি অরবিন্দের বাসের জন্য ঠিক করা হয়েছিল। তখন পণ্ডিচেরীতে সেই একমাত্র তেতলা বাড়ি ছিল।'

আজ একশ' বছর পরেও বাড়িটির মূল কাঠামোর পরিবর্তন হয়নি। শুধু, পঁচিশ বছর আগে ১৯৮৫ সালে যখন আশ্রম ব্যবস্থা করেছিলেন এ বাড়িতে 'দর্শন'-এর তখন বাড়িটিকে এত উজ্জ্বল বর্ণে দেখা যায়নি; শুনলাম বর্তমান উপলক্ষ্যে শ্রীচেট্টিয়ারের উত্তরাধিকারীরা বাড়িটির সংস্কার করেছেন।

মূর্তির অনুগমন করে বাড়িটিতে প্রবেশ করে ভক্তরা উঠে যাচ্ছেন তেতলায়, যেখানে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, ছ'মাস। সুরেশচন্দ্রের বর্ণনার সংগে পুরোপুরি মিলে যায় শতবর্ষ পরের দেখা— 'চেট্টিয়ার মহাশয়ের বাটির এই ত্রিতল অংশ বৃহৎ বা প্রশস্ত ব্যাপার কিছু নয় এবং সেই কারণেই এখানে কারো পক্ষে গোপনে নিরিবিলি বাস করার জন্যে প্রশস্ত। দুখানি ছোট ছোট ঘর, আন্দাজ নয় দশ বর্গহাত করে তাদের আয়তন। তার চাইতেও ছোট আর একখানি ঘর, যেটায় প্রবেশ করলে হঠাৎ মনে হয় যেন কোনো লাইট-রেলওয়ের গাড়ীর একটা কামরায় প্রবেশ করেছি। সামনে উত্তর দিক (এই বাড়িটি উত্তরমুখী) রেলিং-ঘেরা খানিকটা খোলা ছাদ; পিছনে পূর্ব পশ্চিমে লম্বা এক ঢাকা বারান্দা। এই বারান্দার পশ্চিম প্রান্তের অংশ থেকে দু'তিন ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে একখানি রান্নাঘর। এই হচ্ছে বাড়িটির ত্রিতলের অংশ। ত্রিতলের এই অংশটি তৈরী হয়েছে সদর রাস্তার উপরে নয়, তৈরী হয়েছে বাড়িটির পিছনের দিকে। সুতরাং না জানা থাকলে সদর রাস্তা থেকে বুঝবারই উপায় নেই যে, এই বাড়ির ত্রিতলের একটা অংশ আছে। যেন কারো গোপন বাসের জন্য হিসেব করেই বাড়ির এই অংশটি তৈরী করা হয়েছিল।'

শ্রীঅরবিন্দ যেদিন পণ্ডিচেরীতে পৌঁছন, সেদিনই তাঁর অনুপস্থিতিতে কলকাতায় বের হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট। সেজন্য ফরাসী শাসনাধীন অঞ্চলে হলেও, সাবধানতার প্রয়োজন ছিল। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই জানিয়েছেন তিনি গোপনে বাস করেছিলেন এক বিশিষ্ট নাগরিকের বাড়িতে, যতদিন না মুক্ত হন মামলা থেকে। (I remained in secrecy in the house of a prominent citizen until the acquittal,......)

এখন, শ্রীঅরবিন্দের মূর্তি রাখা হয়েছে সেই ঘরে, যেখানে তিনি বাস করেছেন।

ছোট ঘর, সারিবদ্ধভাবে ভক্তরা সেখানে প্রবেশ করছেন প্রণামের জন্য। সামনের, সেসময়ের খোলা ছাদের ওপর এখন আচ্ছাদন রয়েছে। বসবার জন্য বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আসন। অনেকেই নিজেদের মত করে একা বা কয়েকজন মিলে বসে রয়েছেন। মূর্তি এখানে এক ঘন্টার মত থাকবে। অনেকে কথা বললেও নীরবতার আবহাওয়া রয়েছে।

একটা কৃতজ্ঞতার অনুভব বোধ হয় ভেতরে। একশ' বছর আগে, কি আন্তরিকতায় ও সম্মানে শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এই শহরের কিছু মানুষ। যদিও কখনো কখনো আঘাত নেমে এসেছে আশ্রমের ওপর খুব তীব্রভাবে এই শহরের থেকেই। কিন্তু কি করে ভোলা যাবে, যখন পণ্ডিচেরীতে আসার এক বছরের মধ্যেই আবার আশংকা দেখা দিয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর সংগীদের এখানে থাকার বিষয়ে। সেসময়ে শ্রীশংকর চেট্টিয়ার, নিজে এবং আরও চারজন দ্রুত এগিয়ে আসেন সাহায্যে। নলিনীদা লিখেছেন—'এই পঞ্চজনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত। সে সময়ে এঁরা সত্যসত্যই বিশেষ সাহসের ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন—এঁদের ওই স্বাক্ষরের বলেই আমাদের এখানে স্থায়িত্ব সহজ হয়ে গেল।' মা নিজে জানিয়েছেন, এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, বুদ্ধিতে, এবং শুভ ইচ্ছায় উন্নত মানের, তাঁরা শুধু যে আশ্রমকে স্বাগত জানিয়েছেন তাই নয়, তাঁরা তাঁদের সহানুভূতি, প্রশংসা এবং শুভ-অনুভূতিও প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অনেক আন্তরিক বিশ্বস্ত অনুগামী ও সুহৃদ রয়েছেন। (...all those in this population who are of a higher standard in culture, intelligence, good will and education not only have welcomed the Ashram but have expressed their sympathy, admiration and good feeling. Sri Aurobindo Ashram has in Pondicherry many sincere and faithful followers and friends.) শ্রীঅরবিন্দের পদার্পণের ৭৫তম বার্ষিকীতে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল প্রথম, স্থানীয় নাগরিক সমিতির শোভাযাত্রা এবং সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের। এবার শতবার্ষিকীতে তা শতধারে যেন এসেছে সরকারী এবং নানাবিধ সংস্থার নানাভাবে উদযাপনে। চৌঠা এপ্রিল রাতে পণ্ডিচেরীর আকাশ আতশবাজির রোশনাইয়ে রঙীন হয়ে জানিয়ে দিয়েছে, যে তাঁকে যেভাবে ধরতে চাইছে, সে তাঁকে সেভাবেই পাচ্ছে।

কিন্তু আমরা বলছি, দুপুর গড়িয়ে বিকেলের কথা। কিছু পরেই মূর্তি নিয়ে যাত্রা শুরু হবে সমুদ্রের পথে, যেখানে তিনি প্রথম পা রেখেছিলেন—সে জায়গা ছুঁয়ে 'গেস্ট হাউস'-এর দিকে, যেখানে শ্রীঅরবিন্দ ন'বছর (১৯১৩-১৯২২) থেকেছেন; সেখানেই তাঁর মূর্তি স্থায়ীভাবে রাখার কথা হয়েছে।

কেন পণ্ডিচেরীতেই এলেন তিনি? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, তিনি প্রশ্ন করতে পারেননি, কেননা শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ছিল তা, এ তাঁকে মানতেই হবে। (I could not question. It was Sri Krishna's Adesh. I had to obey.) শুধু আসা নয়, বেশ কিছু বছর ধরে নানা ভাবে তাঁকে পণ্ডিচেরী থেকে সরানোর নানা উপায়ে চেষ্টা চলেছে। তিনি কিন্তু রয়ে গেলেন পণ্ডিচেরীতে চল্লিশ বছরের বেশি সময়। তৃতীয় মামলায় মুক্ত হওয়ার পরে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় জানিয়েছিলেন, তিনি পণ্ডিচেরীতে রয়েছেন এবং থাকবেনও পণ্ডিচেরীতে। (I am and will remain in Pondicherry.) ঋষিবাক্য, কিছু নড়াতে পারেনি তাঁকে। যে জড়-তনু তিনি গ্রহণ করেছিলেন, রয়ে গেল সেবাবৃক্ষের নিচে, পণ্ডিচেরীতেই।

কেন পণ্ডিচেরী আসা ও থেকে যাওয়া, সে প্রসংগে মনে পড়ে পণ্ডিচেরী শহরের ইতিহাস রচয়িত্রীকে মা চিঠিতে লিখেছিলেন, আশা করি, একদিন আসবে যেদিন আমরা সহজে এবং সত্য করে বলতে পারব, পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতির তাৎপর্য কি! .... A day will come, I hope, when we shall be able to tell freely and truly all that Sri Aurobindo's Presence has meant for the town of Pondicherry.)

শ্রীঅরবিন্দের কথায় একটু ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, এখানে আসা আশ্রমের জন্য আর কাজের জন্য। (Later on I found it was for the Ashram and for the work.) মায়ের কথায় জানতে পারি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক নূতন জগতের দোলনা হয়ে ওঠার জন্য। (The Ashram has been founded and is meant to be the cradle of the new world.) দোলনা, যা হচ্ছে ভালবাসায় আর যত্নে শিশুর বেড়ে ওঠার আশ্রয়ের প্রতীক। ভাবী পৃথিবীর গড়ে ওঠার, বেড়ে ওঠার ক্ষেত্র আশ্রম। তার জন্মলগ্ন তাই, যিনি পৃথিবীর জন্য দিব্য ভবিষ্যতের আশ্বাস এনেছেন (Sri Aurobindo has brought to the world the assurance of a divine future. –The Mother), সেই শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে শুভাগমনের পুণ্য দিনে। মার কথায় আশ্রমের নববর্ষ তাই ৪ঠা এপ্রিল। (The 4th April is the Ashram New year, date of Sri Aurobindo's arrival in Pondicherry.), নিশিকান্ত লিখেছেন:

'যেই দিন তুমি
বরণ করিলে তব সাধনার ভূমি
হেথা আসি, ঊর্ধ্বের ঋষির দল জ্যোতির্ময় লোকে
নিম্নে চাহি নিরখিল কোন অভ্যুদয়ের আলোকে
আলোকিত মর্ত-লোক; অনন্তের দেববৃন্দ আসি

কোন মহামহোৎসবে সবে মিলি বাজাইল বাঁশি,
তারি সুর বিচ্ছুরিল ধরণীর দিগন্ত দুয়ারে
তোমার চরণ-লীন ধূলি তীর্থে এই সিন্ধুপারে',

'এই দক্ষিণ ভারত-সিন্ধুকূলে' পবিত্র এই নগরীর পরিচয় স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন, তাঁর নিভৃত আবাস, তাঁর তপস্যার গুহা—যা তাঁর নিজের মতো, সন্ন্যাসীদের মতো নয় বলে। (Pondicherry is my place of retreat, my cave of tapasya, not of the ascetic kind, but of a brand of my own invention.) আশ্রমের আর কাজের জন্য তাঁর আসা, বলেছিলেন। কি তাঁর কাজ? মা জানিয়েছেন, শ্রীঅরবিন্দের কাজ হল, এক অনন্য বিশ্ব-রূপান্তর। (Sri Aurobindo's work is a unique earth-transfomation.)

শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগের পর প্রথম ৪ঠা এপ্রিলের বাণীতে মা ঘোষণা করেছিলেন পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে নূতন জ্যোতি, এক নূতন জগৎ জন্ম নেবে। (A new Light shall break upon the earth, a new world shall be born.) পাঁচ বছর পরে বলেছেন— 'এক নূতন জগৎ জন্ম নিয়েছে।' (A new world is born.)

মনে পড়ল, ১৯৫৭ সাল, মা একটি চলচ্চিত্র দেখেছিলেন 'রাণী রাসমণি'। তার পরে নানা কথায়, প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে মা বললেন, আমরা এখন দেখছি এক নূতন জগতের জন্ম, এটি এখন খুবই তরুণ, খুবই দুর্বল— না, সারবস্তুতে নয়, কিন্তু তার প্রকাশে—এখনও তা চিনতে পারা যায় নি, এমনকি অনুভবেও আসেনি, অধিকাংশের কাছেই অস্বীকৃত, তবুও তা রয়েছে এখানে, চেষ্টা করছে বেড়ে ওঠার, পরিপূর্ণ নিশ্চিত তার ফল সম্বন্ধে। (We are now witnessing the birth of a new world; it is very young, very weak—not in its essence but in its outer manifestation —not yet recognised, not even felt, denied by the majority. But it is here, making an effort to grow—absolutely sure of the result.) এ কথার অর্ধশতাব্দী পরেও নিজেকে দেখতে পাই সেই 'অধিকাংশ'-এর মধ্যে। সেই 'নূতন জগৎ', যা সৃষ্টির জন্য পণ্ডিচেরীতে এসে তাঁর আসন পাতা—যার শতাব্দী জয়ন্তীর অংশ এই যাত্রা, তার বাইরের এই আনুষ্ঠানিকতা যতই প্রাণকে ছুঁয়ে যাক্, একটা প্রশ্ন থেকে যায় নিজের কাছে।

'শ্রীঅরবিন্দ মূর্তি'র যাত্রা শুরু হল শংকর চেট্টিয়ারের বাড়ি থেকে আশ্রমের উদ্দেশে; মনে পড়ল মায়ের কথা, নূতন জগৎ জন্ম নিয়েছে—যারা তার মধ্যে নিজেদের জন্য স্থান চায়, তাদের অবশ্যই তার জন্য আন্তরিক ভাবে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে হবে। (A new world is born — all those who want to have a place in it must sincerely prepare themselves for it.)

(উদ্ধৃতির বানান অপরিবর্তিত-সম্পাদক)

[পুনর্মুদ্রণ: শ্রীঅরবিন্দ কর্মী সংঘ, হাবড়া প্রকাশিত নতুন জগৎ ২০১০ সংখ্যা]

ডি. এন. কলেজের প্রথম পর্বের দিনগুলি

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়

১৫ই আগস্ট, ১৯৬৭; সন্ধ্যার কিছু পরে ট্রাম চলেছে হাওড়া স্টেশনের দিকে। আলো ঝলমলে লেক এভিনিউর দিকে চোখ পড়ল তার, ছেড়ে যাওয়া স্কুলটির দিকে, যেখানে তিন বছরের শিক্ষকতার পর ছাব্বিশ বছরের জীবনটি চলেছে দূর মুর্শিদাবাদের প্রান্তে, কলেজে শিক্ষকতা করবে বলে। ভোর ফুটলে নিমতিতা স্টেশনে নেমে দেখা গেল টাঙ্গা, যা আগে কেবল চলচ্চিত্রে দেখেছে, ভাষা বাংলা হলেও তার উচ্চারণ ভিন্নতর। রিক্সায় উঠতে গিয়েই পরিচয় আর একজনের সঙ্গে। তিনিও চলেছেন যোগ দিতে একই কলেজে।

কলেজের ক্লাস শুরু হয়নি। উদ্যোক্তাদের অতিথিশালায় রিক্সা পৌঁছল। মনে আছে, অরঙ্গাবাদ শুনে প্রথমে মনে হয়েছিল কোনো উত্তর প্রদেশিয় জায়গা। কিন্তু এখানে আসার পথে 'ব্যাংডুবির মাঠ' শুনে আশ্বস্ত হওয়া গেল। অধ্যক্ষ আগেই যোগ দিয়েছিলেন। শিক্ষকতার দীর্ঘ প্রায় চার দশকে এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নানা গুণের অধিকারী এই অসামান্য মানুষটির মতো দক্ষ প্রশাসক অথচ হৃদয়বানের আন্তরিক স্পর্শ লাভ করিনি। তিনি শ্রী বিজনকান্তি বিশ্বাস। কলেজটির সূচনা থেকে দু'বছরের কিছু বেশি সময় বোধহয় ছিলেন। তার মধ্যেই সুনিশ্চিত দৃঢ় ভিত্তি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজের।

১৬ই আগস্ট, ১৯৬৭। আমরা পাঁচজন শিক্ষক যোগ দিলাম। ইংরাজির সুধারঞ্জন সেনগুপ্ত, ইতিহাসের ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, বাণিজ্যের জগবন্ধু মণ্ডল আর বাংলার আমি। দুপুরে দাশ কোম্পানির অতিথিশালায় ইলিশ সহযোগে আহারের পর, বাজারের মধ্যে একটি বাড়ির দোতলায় যাওয়া গেল। তিনটি ঘর নিয়ে আমাদের মেসবাড়ি। উঠেই প্রথম ঘরে আমি আর সুধারঞ্জন। যতদিন অরঙ্গাবাদে ছিলাম, এটিই ছিল আমার আবাস। সব ছাড়িয়ে মনে পড়ে, জানলা দিয়ে

দেখা নীচের মিষ্টির দোকানে কড়াইয়ে ভাসমান বিপুলাকৃতি রাজভোগ, আর কাঠের থালায় স্বাস্থ্যবান চমচমেদের (এদের স্থানীয় বিশেষ নাম ছিল, আজ আর মনে নেই)। মিষ্টি শুধু জিভেই পাইনি; পেয়েছি বহু সম্পর্কেও। তবে তার মধ্যে বিশেষ বন্ধু হয়ে উঠেছিল আমার সম্বোধনে 'জগ',—ছাত্রদের অতি প্রিয়, বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক জগবন্ধু মণ্ডল। এ বয়সে এতদিন পরেও তাঁর অসময়ে চলে যাওয়ার স্মৃতি, বেদনা দেয়।

২৩শে আগস্ট, ১৯৬৭; বাজার থেকে কিছু দূরে একটি লম্বা গুদাম ঘর সংলগ্ন মাঠে সামিয়ানার নীচে কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো বিকাল বেলায়। যতদূর মনে পড়ে, জিয়াগঞ্জ কলেজের সে সময়ের অধ্যক্ষ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। পরদিন, ২৪শে আগস্ট থেকেই সেই গুদাম ঘরটিকে কয়েকটি অস্থায়ী দেওয়াল দিয়ে ভাগ করে, ক্লাস শুরু হয়ে গেল। অধ্যক্ষ বিশ্বাসের নানা কুশলী কর্মের মধ্যে মনে পড়ে সেই অস্থায়ী আবাসের অসুবিধা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার শুরু করে দেওয়া।

একেবারে শুরুতে অফিসে প্রধান ছিলেন দিবাকরবাবু, সঙ্গে রাখহরিবাবু। আর নানা কাজে সহকারী হয়ে এসেছিলেন নরেন্দ্রনাথ বারিক আর নজরুল ইসলাম। এছাড়া মনে পড়ে সে বছরই, পরে এসে যোগ দেন অর্থনীতি বিভাগের জ্যোতিকুমার রায় আর দর্শন বিভাগে শান্তিরঞ্জন পাণ্ডে।

পরের বছর ১৯৬৮ সালে, বাংলা বিভাগে আসেন নুরুল ইসলাম মোল্লা আর ইংরাজি বিভাগের বিশ্বনাথ রায়। একই কলেজে একই নামের দু'জন থাকায় যে কত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা লিখতে গেলে আর একটি প্রবন্ধ হবে। শুধু এটুকু বলি, ইংরাজির বিশ্বনাথ বাবুর অকাল প্রয়াণের পরে কারও কারও ধারণা হয়েছিল, আমিই চলে গেছি। যাই হোক, ইংরাজির বিশ্বনাথ আর ভাই নুরুল মিলে একটি সাময়িক পত্রিকা—'অরঙ্গাবাদ বার্তা' কিছুদিন আগে প্রকাশ করেছিলেন।

এভাবে লিখতে থাকলে, স্মারক গ্রন্থের সবটা জায়গা নিয়ে নেবে, তাই অনেকের কথা না-বলা রইল; অবশ্য অনেকের মুখ, চোখের সামনে আসলেও নাম ভুলে যাওয়ায় অতৃপ্তিও বোধ করছি।

আমরা শিক্ষকেরা, সকলেই অধ্যক্ষকে 'স্যার' বলতাম, সহবতের জন্য নয়; তাঁর ব্যক্তিত্বই সেটা দাবি করত। আর আমরা ছাত্রতুল্যই ছিলাম। সম্ভবত, ধীরেনবাবু ওঁর ছাত্রই ছিলেন। স্যারের চেষ্টায়, দ্রুতই কলেজ বাড়ির কাজ শুরু হয়ে গেল, আর তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষও হলো। অরঙ্গাবাদ ছাড়িয়ে এ কলেজের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তরবঙ্গে, এমনকি পাশের বিহার প্রদেশেও। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজ হওয়ার জন্য সেখান থেকেও ছাত্ররা আসতে লাগল। আর কলেজ বাড়ির উদ্বোধনে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী সত্যেন সেন এলেন, সে

সময়ের প্রেক্ষিতে ব্যাপারটা—জয় জয়কার।'

ছাত্র-ছাত্রীদের কথা কিছুই বলা হলো না। তবে একটা বিষয় ভোলার নয়। যতদিন অরঙ্গাবাদে ছিলাম, রাস্তায় হাঁটলে কিছু সময় পর পিছন ফিরে তাকাতে হতো। প্রথমদিকে কিছুটা বিস্ময় বোধ হতো, পরে স্বাভাবিকভাবেই নেওয়া যেত। তা হলো, ছাত্ররা কখনোই শিক্ষককে পার হয়ে যেত না, যতক্ষণ না শিক্ষক বলতেন—যাও। চশমা খুলে, সাইকেল ঠেলে একটি ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা অনুগমন করত। এসব স্মৃতিই থেকে যাক।

বলতে বাধা নেই, আজ যখন কলেজটির কথা পঞ্চাশ বছর পরে, দূর থেকে ভাবি, তখন মনে হয়, ডি. এন. কলেজের সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে রইল। এ সত্য স্থায়ী হয়ে থাকবে যে আমি ছিলাম, প্রথম শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম আর বাংলা বিভাগের প্রথম শিক্ষক।

কৃতজ্ঞতার অনেক বিষয়ই তো রয়েছে। শেষ করি, আর একটি প্রসঙ্গে। কলেজ বাড়িটি যখন তৈরি হচ্ছে, তখন আমাদের অনেকেরই উৎসাহের বিষয় ছিল, তার প্রতিদিনের সংযোজন। কলেজে ক্লাস করা ছাড়া বিশেষ কোনো কাজ ছিল না, তাই ঘুরে ফিরে বাড়িটিতেই যাওয়া। আমার এ বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি ছিল বোধ হয়, সহকর্মীরা টিপ্পনীও কাটতেন একটু। বাড়ি কিছুটা বেড়ে উঠলে, স্থানীয় অনেকেই দেখতে আসতেন। এদের মধ্যে ছোটরা আঁকিবুঁকি দাগ কাটলে, তাদের সঙ্গে একটু লেগেও যেত। আজ ভাবি, সত্যিই, কি ছেলেমানুষি করেছি। আবার ভাবি, পরে কত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তো যুক্ত হয়েছি, এরকম তো হয়নি। মনে হয় আমার সে বয়স, আর তার সঙ্গে একটি শিশু প্রতিষ্ঠান মিলে যে ভাব হয়েছিল, তা তখনকার পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল।

যখন ছাদ হয়ে গেল, বিকেলে অনেকটা সময় সেখানে হাঁটতাম। আমি নিশ্চিত, কলেজ বাড়ির চারপাশে আজ আর সেই নির্বাধ দৃষ্টি যাবে না। কিন্তু অর্ধ শতাব্দী পূর্বের সেই বিকেলগুলি, নির্মল উদার আকাশ মেলে ধরত। পশ্চিমে সূর্য অস্ত গেলে, দূর দিগন্তে ফুটে উঠত বারহারোয়া পাহাড়ের রেখাচিত্র। সেই আশ্চর্য অনুপম দৃশ্য আজ এখানে বসে দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

[লেখক এই কলেজের সূচনালগ্নে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।। সুবর্ণজয়ন্তীর আলোয় দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ স্মরণিকা ১৯৬৭-২০১৭]

শ্রীঅরবিন্দ ও 'হুগলী অধিবেশন'-এর সভাপতি বাবু বৈকুন্ঠনাথ সেন

ত্রিজ রায়

শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনে, সমসাময়িক যে সব ব্যক্তিত্ব এসেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের বাদ দিলে বাংলার পরিসরে যাঁরা তখন পরিচিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রী বৈকুণ্ঠ নাথ সেন, শ্রীঅরবিন্দের লেখায় বেশ কয়েকবার উল্লেখে এসেছেন। এমন কি শ্রীঅরবিন্দ যখন রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে বহুদূরে পণ্ডিচেরির নিভৃতবাসে, তখনও তাঁর উল্লেখ পাই,[১] এবং সে প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয় বৈকুন্ঠনাথের ব্যক্তিত্বে, কোন্ দিক শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতিতে সজীব রয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় দলের বিরোধী মধ্যপন্থীদের অন্যতম প্রধান ছিলেন বৈকুন্ঠনাথ সেন। শ্রীঅরবিন্দের চেয়ে বয়সে প্রায় তিরিশ বছরের বড়ো ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল রূপেই তাঁর পরিচিতি হলেও, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম সম্পাদক (১৮৯৩) রূপে। এছাড়া তিনি দশ বছর বহরমপুর পৌর সংস্থার সভাপতি ছিলেন।[২] পরিণত বয়সে (১৯১৭) জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এর সঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে চাই, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশিত একটি গ্রন্থে তাঁকে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক রূপে (a selfless patriot) উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] শ্রীঅরবিন্দের লেখায় বৈকুন্ঠনাথের প্রথম উল্লেখ পাই 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় ১৯০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আর শেষ উল্লেখের কথা আগেই আমরা মনে করেছি প্রবন্ধের সূচনায়। কিন্তু বাংলায় থাকতে তাঁর শেষ মন্তব্য 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় ১৮ ডিসেম্বর ১৯০৯ আর 'ধর্ম' পত্রিকায় ২৭ অগ্রহায়ণ

১৩১৬। দেখা যাবে, এই তিন বৎসরের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯০৬ সালের তিনটি মন্তব্য চার দিনের মধ্যে; আর সেগুলিতে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের স্বদেশী উৎপাদনের প্রতি আনুকূল্য এবং তার বিরুদ্ধে বোম্বাই এর বাধা ও শেষ পর্যন্ত তার 'বয়কট' আন্দোলনের প্রতি আঘাতই পরিণতিতে নেমে আসার কথা উল্লেখ করেছেন। এ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন কয়েক বৎসর ধরেই কংগ্রেসে প্রস্তাব অনুমোদনের যে চেষ্টা চলেছিল স্বদেশী বস্তুকে ব্যবহারের জন্য তাতে বিশেষ করে বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেনের ভূমিকা স্বীকার্য। (For some years past attempts have been made, especially by Babu Baikunthanath Sen of Berhampur, to pass a Resolution recommending the use of Swadeshi goods.....)[৪]।

এ মন্তব্যের একদিন পরেই বৈকুণ্ঠনাথকে সর্বজনমান্য নেতা বলে নির্দেশ করেছেন। ('.....so universally respected a leader like Babu Baikunthanath Sen of Berhampur')[৫]।

এরপরের দিনই, কংগ্রেসকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে বৈকুণ্ঠনাথের প্রচেষ্টার উল্লেখ করে বলেছিলেন যে তা ছিল দেশীয় উৎপাদনের ব্যবহারের আগ্রহ যা কুটিরশিল্পকে শক্তি যোগাবে। (..... Babu Baikunthanath Sen wanted to commit the Congress to a very mild and permissive declaration to encourage the use of indigenous products as encouragement to home industry...)[৬] কিন্তু ঐ 'mild' (নরম) ভাবটিতে যে ইঙ্গিত ছিল সেটি, ছ'মাস পরে যখন রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যের মাত্রায় সীমা ছাড়াল, তখন শ্রীঅরবিন্দের লেখনী বৈকুণ্ঠনাথকে তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করল। 'বহরমপুর অধিবেশন' ১৯০৭-এর এপ্রিলের শুরুতে। শ্রীঅরবিন্দ এতে যোগ দেননি, কিন্তু 'বন্দেমাতরম্'-এর ৬ এপ্রিলের একটি দীর্ঘ রচনা ধরে রেখেছে বৈকুণ্ঠনাথকে সামনে রেখে দেশসেবার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত। মধ্যপন্থীদের সম্বন্ধে এক প্রতিবেদনে 'রাজভক্ত''[৭] লেখা হয়েছিল, সেই ভক্তির প্রকাশ বৈকুণ্ঠনাথকে সরকারি নির্দেশের যাতে কোনো অমর্যাদা না হয় সে নিশ্চয়তা স্পষ্ট করতে প্রতিনিধিদের ধ্বনির ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি আদায়ে সক্রিয় করেছিল। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'Last year the right of raising the cry of the Motherland wherever even two or three of her sons might meet, whether in public places or private, was asserted by the whole body of delegates in spite of Police cudgels; this year the right was surrendered because Babu Baikunthanath Sen had pledged his personal honour to a foreign bureaucrat that there would be no breach of the peace."[৮] কোনরকম

শান্তি ভঙ্গ হবে না বিদেশী রাজকর্মচারীর কাছে অঙ্গীকার করে বৈকুণ্ঠনাথ নিজের আত্মসম্মানের দোহাই দিয়েছিলেন।

প্রবন্ধের মধ্যে বারে বারে ফিরে এসেছে এই ব্যক্তিগত সম্মানের (Personal honour) প্রসঙ্গ এবং শ্রীঅরবিন্দ এতদূর লিখেছিলেন যে ব্যবস্থাপক রূপে বৈকুণ্ঠনাথ যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারেননি, ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার যাই হোক না কেন। প্রতিনিধিরা তো সেখানে ভালমন্দ খেতে বা পারস্পরিক সামাজিকতা দেখানোর জন্য যাননি, গিয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই একমাত্র দেশের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পালনের জন্য। ব্যক্তিগত স্তরে কোনো ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান যাই হোক না কেন সমগ্র জাতির সাহস এবং সম্মানের সঙ্গে, আপস করার জন্য তা বিসর্জন দেওয়া আমরা অস্বীকার করি। নেতারা এই অজুহাতটিকে তৎপরতার সঙ্গে মেনে নিয়েছেন, যাতে বরিশালের পুনরাবৃত্তি না হয়, সেটাকে একটা ভালো অজুহাত স্বীকার করে নিয়ে। (We deny that Babu Baikunthanath stood in the position of host to the Conference whatever may have been his relation to individual delegates; in any case the representative of Bengal went to Berhampur not to eat good dinners and interchange kindly social courtesies, but simply and solely to do their duty by the country. We deny the right of any individual, whatever his position, to pledge a whole nation to a course inconsistent with courage and with honour. But the leaders seem to have accepted the plea with alacrity as a good excuse for avoiding a repetition of Barisal.)[৯]

লক্ষ্য করার, বৈকুণ্ঠনাথকে সামনে রেখে শ্রীঅরবিন্দ তীব্রভাবে দেশের প্রতি দায়িত্ব আর ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রশ্নটিকে তুলে ধরেছেন। এখানে, এখনও যে সব সম্মেলন হয়, সেখানে অভ্যর্থনা সমিতির আপ্যায়ন ও প্রতিনিধিদের দায়িত্বের মধ্যে যে যোগাযোগ ঘটে থাকে, তা এখনও স্পষ্টতই প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। শ্রীঅরবিন্দ এটুকুর মধ্যে যে দু'বার 'we deny' বললেন সে কণ্ঠ এখনও প্রয়োজন। বহরমপুরের এ ঘটনার পরে 'হুগলী অধিবেশন'-এ তাঁরা মুখোমুখি হলেন সভাপতি ও জাতীয় দলের নেতা রূপে। আমাদের প্রবন্ধের সেটাই মূল প্রসঙ্গ। সে বিষয়ে যাওয়ার আগে, বাংলায় থাকতে আরও তিনবার বৈকুণ্ঠনাথের উল্লেখ তাঁর লেখায় পাওয়া যাচ্ছে।

তার মধ্যে প্রথমটি ১৯০৯-এর ২রা অক্টোবর 'কর্মযোগিন' পত্রিকায়। এই মন্তব্যটি উৎসাহী পাঠককে পন্ডিচেরিতে থাকার সময় লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। দুটিরই সঠিক অনুবাদ বর্তমান প্রবন্ধকারের সাধ্যে নেই, কেননা যে রসিকতা শ্রীঅরবিন্দের লেখনীতে, তা নষ্ট হয়ে যাবে। পড়া যাক -'Naturalist Organisation' শিরোনামের লেখাটির একটু অংশ -'In fact our all India body must be not

a Congress or Conference even, but a Council, and since in spite of Shakespeare and Sj. Baikunthanath Sen, there is much in a name and it largely helps to determine our attitude towards the thing....; [১০]। সে যুগের রাজনীতিতে বিদেশী যে প্রথা প্রকরণজনিত বিধি নিষেধ, তার প্রতি তির্যক মন্তব্য ছাড়িয়ে, কোথাও এ প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রের সুপরিচিত উদ্ধৃতির ব্যবহার সূক্ষ্ম রসিকতার স্পর্শ আনে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায় বাংলায় থাকতে শেষ দুটি মন্তব্য, একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই— তা হল 'কৌন্সল' নির্বাচন। 'The Council Election' শিরোনামে 'কর্মযোগিন'-এর লেখাটিতে শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য তুলনায় অনেক মৃদু। বোধহয় বাংলার নির্বাচন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাই। তবুও গভীর রাজনৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে বৈকুণ্ঠনাথ সম্পর্কে; যেখানে তিনি বলেছেন তাঁরা এমন কিছুর প্রতিনিধিত্ব করছেন, যা এমনকি বাংলার মধ্যপন্থীরাও বহু পিছনে ফেলে রেখে এসেছে। (..... Sj. Baikunthanath Sen and Mr. K. D. Dutta stand not for the new movement in Bengal, so much as far the old antiquated Congress politics which Bengal, even its Moderate element– has left far behind.)[১১]। কিন্তু বাংলায় যখন 'ধর্ম' পত্রিকার জন্য লিখলেন তখন তা যে রূপ নিল; সে তির্যকভঙ্গি মূল লেখাটি পড়া ছাড়া ধরা যাবে না। "...পশ্চিমবঙ্গে যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ তেজস্বী পুরুষ সিংহ আছেন, তেমনই নির্লজ্জ ধামাধরার পালও আছে। যাহারা কোমর বাঁধিয়া নির্বাচন দৌড়ে প্রথম স্থান পাইতে লালায়িত, তাহারা প্রায়ই দেশের অজ্ঞাত অপূজ্য স্বার্থান্বেষী ধামাধরার পাল। তাহারা ব্যবস্থাপক সভায় ভিড় করিলে দেশের লাভও নাই, ক্ষতিও নাই,— সভা অযোগ্য তোষামোদকারীর চিড়িয়াখানা বিশেষে পরিণত হইবে, আর কোন কুফল হইবে না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুয়েকজন দেশপূজ্য লোকের নাম দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। বঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেনের কি এত অল্প আদর যে শেষে এই ভিড়ের মধ্যে কৌন্সিলে ঢুকিবার জন্যে ঠেলাঠেলি করিতে হইল? বৃদ্ধবয়সে বৈকুণ্ঠবাবুর এই অপমানপ্রিয়তা কেন? চিড়িয়াখানায় প্রবেশ কি এত লোভনীয়?"[১২] —এই বিদ্রূপের অন্তরালে কোথাও কি একটি ব্যথাতুর অভিমান ব্যক্তিত্বটির প্রতি প্রচ্ছন্ন মূল্যবোধের পরিচয় দেয় না! বাংলায় থাকতে এটি বৈকুণ্ঠনাথ সম্পর্কে শেষ লেখা শ্রীঅরবিন্দের, যেখানে 'দেশপূজ্য'-দের মধ্যে তাঁকে রেখেছেন।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত বৈকুণ্ঠনাথ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের কথাই শুনেছি। এখন আমরা শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্কে বৈকুণ্ঠনাথের কথা শুনতে পারি। অবশ্য সেটি শ্রীঅরবিন্দের প্রতিবেদনেই আমাদের শুনতে হবে। হুগলী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল চুঁচুড়া শহরে ৫ ও ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ সালে। তখন শ্রীঅরবিন্দ দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করছেন।

এ দুটিতেই ‘হুগলী অধিবেশন’ প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আমরাও সে সব নিয়ে স্মরণিকার নানা সংখ্যায় আলোচনা করেছি। বর্তমান প্রসঙ্গে ‘কর্মযোগিন’ পত্রিকার ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ সংখ্যায় এবং ‘ধর্ম’ পত্রিকার ২৮ ভাদ্র, ১৩১৬ সংখ্যায় একটি করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যেগুলির ‘শিরোনাম’ ছিল ‘Impatient Idealists’ এবং ‘অসম্ভবের অনুসন্ধান’। জাতীয় দলের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দ যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গেই সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন নিজের ভাষণে সম্বোধন করেন ‘Impatient Idealists’ বলে। শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজী ও বাংলায় উপরোক্ত দুটি প্রবন্ধে দেশবাসীকে এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানান। দুটিরই ভাব ও বিষয়বস্তু প্রায় এক হওয়ায় প্রবন্ধ দুটির প্রায় সবটাই উদ্ধৃত করা হচ্ছে। আলাদা অনুবাদের প্রয়োজন নেই। ইংরাজী বয়ানের বিষয়বস্তুর কিছুটা অংশ বাংলায় নেই, সেটি যথাস্থানে নির্দেশ করে বাংলা অনুবাদ, উল্লেখপঞ্জিতে থাকবে।

‘Impatient Idealists’

The President of the Hughly Conference, in reference to the formal statement by Sj. Aurobindo Ghose of the adherence of the Nationalist Party to the policy of self-help and passive resistance in spite of their concessions to the Moderate minority, advised the party of the future under the name of impatient idealists to wait. The reproach of idealism has always been brought against those who work with their eye on the future by the politicians wise in their own estimation who look only to the present. The reproach of impressions is levelled with equal ease and readiness against those who in great and critical times have the strength and skill to build with rapidity the foundations or the structure of the future.

[The advice to wait is valueless unless we know what it is that we have to wait for and why it is compulsory on us to put off the effort which might be made at the present. If we can progress quickly there must be adequate reasons given us for preferring to progress slowly or to stand still. We have not yet heard those adequate reasons.] এই অংশটির অনুবাদ ‘অসম্ভবের অনুসন্ধান’ উদ্ধৃতির মধ্যে আছে।

...The whole Asiatic world is moving forward with enormous rapidity. In Persia, in Turkey, in Japan the impatient idealists...effected the freedom and are now busy building up the dignity and strength of their motherland...Even in Russia a Duma has been established

...Of all the great nations of the world India alone is bidden to wait. It is bidden by Lord Morley and Anglo-India to wait forever. It is bidden by its own leaders to wait under the circumstances, which is the more unpractical and idealistic, the impatience of the Nationalist or the supine and trustful patience of the President of Hughly Conference?

অসম্ভবের অনুসন্ধান [১৪]

'হুগলীতে প্রাদেশিক সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে সভাপতি শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সেন জাতীয় দলকে অধীর ও অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাঁহারা অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, মধ্যপন্থীরাই অধীরতার পরিচয় দিয়াছেন; জাতীয় দলের বিরুদ্ধে অধীরতার অভিযোগের কারণ নাই। হুগলীতে যে জাতীয় দলের সংখ্যাধিক্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; অথচ বিরোধ-বর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ স্বাবলম্বন ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সমর্থন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। ইহাও যদি অধীরতা হয় তবে ধীরতা বোধহয় জড়তার নামান্তর মাত্র। অসম্ভব আদর্শের কথায় আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, যাহারা বর্তমানের সংকীর্ণ সীমার বাহিরে কিছুই দেখিতে চাহে না ও পারে না তাহারা ভবিষ্যতের ভাবনার ভাবুকদিগকে চিরদিনই অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। যে সকল কর্মবীর সংকট সময়ে বিশেষ বিচার ও বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যতের উন্নতির ভিত্তিস্থাপনক্ষম তাঁহাদের ভাগ্যেও ঐরূপ উপহাস লাভ ঘটিয়া থাকে। ফলের বিষয় না জানিয়া অপেক্ষা করা জড়ত্ব, তাহা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। সেখানে স্থৈর্য্য মূঢ়ের কার্য; গতিই জীবন। ভারতের মধ্যপন্থী সম্প্রদায়ের অকারণ ভীতিই জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে।

*[অপেক্ষা করার পরামর্শ অর্থহীন যদি না আমরা জানতে পারি কিসের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং কেনই বা আমাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে প্রচেষ্টা থামিয়ে রাখা, যা এখনই করে ফেলা যায়। যদি আমরা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে পারি, সেখানে যথেষ্ট কারণ থাকবে আমাদের জানানোর কেন আমরা ধীরে অগ্রসর হব বা স্থির দাঁড়িয়ে থাকব। আমরা এখনও পর্যন্ত সে সব যথেষ্ট পরিমাণ কারণ শুনতে পাইনি।][১৪ক]

সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে জাগরণ, যে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, যে আবেগ আসিয়াছে জাপানে, পারস্যে, তুরস্কে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টো স্বীকার করিয়াছেন, সে প্রবাহের গতিরোধ করা মানবের সাধ্যাতীত, অথচ

মধ্যপন্থীরা একথা বুঝেন না বা বুঝিয়াও বুঝেন না। সর্বত্রই সংস্কারের প্রজাশক্তির[১৫] সমর্থন করিয়া জীবনের সায়াহ্নে ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্য জড় জীবনযাপনের আদেশ করিয়াছেন। এ অবস্থায়—জাতীয় দলের উন্নতি-চেষ্টা উপহাসাস্পদ না মধ্যপন্থীদের পরনির্ভরতা ও জড়ত্ব উপহাসাস্পদ?

আমাদের মূল মন্তব্যে প্রবেশের আগে একটি বিষয় উল্লেখে আগ্রহ বোধ করছি, তা হল যদি কোন অনুভবী আলোচক একই বিষয়ে দুটি ভাষায়, প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় স্তরে পার্থক্যের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগে রচয়িতার কুশলতার দিকটি কূটনীতির দৃষ্টিকোণ, এবং তার উপযুক্ত প্রকাশের দক্ষতার দিকটি আলোকিত করতে পারেন, তা সত্যই উপাদেয় হবে। কিন্তু আমরা বর্তমানে বৈকুন্ঠনাথ সেনের মন্তব্যের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যাটির সময়োচিত তাৎপর্য্য এবং সম্ভব হলে তার চিরকালীন কোন মূল্য আছে কিনা ভাবতে পারি। তবে 'কর্মযোগিন'-এর লেখাটির পরেই, তার সূত্র ধরে আর একটি লেখা মুদ্রিত হয়েছে সেখান থেকে আমরা আর একটু শুনতে পারি। জাতীয়তাবাদীদের উপযুক্ততার প্রশ্নে বৈকুন্ঠনাথের সংশয়ের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন— It is possible the President had his eye on the question of fitness or unfitness which is the stock sophistry of the opponents of progress.[১৬]

11 Sept. 1909 The Question of Fitness

(এটাই সম্ভব যে সভাপতির দৃষ্টি ছিল উপযুক্ততা বা অনুপযুক্ততার প্রশ্নে, আর সেটা হল প্রগতির বিরোধীদের কুতর্কের বাঁধা বুলি।) (অনুবাদ)

এটি প্রবন্ধের সূচনা, আর উপসংহার অংশে লিখলেন— In times of difficulty to stop still for a long time is a cardinal error, the best way is to move slowly forward, warily watching its step, but never faltering. Action solves the difficulties, which action creates. Inaction can only paralyse and slay." [১৭]

11 Sept. 1909 The Question of Fitness

(বিপত্তির সময়ে কখনও কখনও দীর্ঘসময় থেমে থাকা একটা মৌলিক ভ্রান্তি, সবচেয়ে ভালো পথ হল ধীরে সামনে অগ্রসর হওয়া সাবধানে প্রতি পদক্ষেপে, কিন্তু মনোবল কখনও না হারিয়ে। কাজ করা যে বাধা সৃষ্টি করে, কাজ করেই তা সমাধান করা যায়। কাজ বন্ধ করা, কেবলমাত্র বিকল করতে আর বিনষ্ট করতে পারে।) (অনুবাদ)

....যে কারণে বৈকুন্ঠনাথ 'অধীর আদর্শবাদী' বলে সম্বোধন করেছিলেন তার বহু আগেই 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তুললে, তাঁকে উন্মাদ আখ্যাও দেওয়া হয়েছিল। গোখলের মন্তব্য বহুশ্রুত। অতএব বৈকুন্ঠনাথের মন্তব্যে তো তবু

আদর্শের স্বীকৃতি রয়েছে, শুধু উপযুক্ততার সংশয় থেকে অধীরতার প্রশ্ন এসেছে।

শ্রীঅরবিন্দের যুক্তি, ১৯০৯ এর প্রেক্ষিতে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে অধীরতার অভিযোগ, স্থবিরতার দৃষ্টি থেকে আসছে কিনা। এখানে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই, কিন্তু শতাব্দীর অধিককাল ধরে যে আলোচনা সে সময়ের 'হুগলী অধিবেশন' নিয়ে হয়েছে, তাতে দ্বিমত নেই যে শ্রীঅরবিন্দের দিকে প্রশ্নাতীত অধিকতর সমর্থন প্রতিনিধিদের মধ্যে থাকলেও, তাঁর ঐক্যপ্রয়াসের জন্যই ভাঙন রুদ্ধ হয়েছিল। 'কর্মযোগিন'-এর ঐ সংখ্যাতে, 'The Hughly Conference' লেখাটির একটু পড়লে তাঁর ব্যবহারিক দূরদৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট হবে। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, 'The Nationalist Party is a practical possession of the heart and mind of Bengal. It is strongly supported in other parts of India and controls Maharastra. It is growing in strength– energy and wisdom. It surely inherits the future. Under such circumstances it can afford to wait."

11 Sept. 1909 'The Hughly Conference'

SABCL 2, P.199

(জাতীয়দল বাস্তবে বাংলার হৃদয় ও মন অধিকার করেছে। ভারতের অন্যান্য অংশে দৃঢ় সমর্থন পেয়েছে আর মহারাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করছে। এই দল বেড়ে উঠছে শক্তিতে, উৎসাহে ও বুদ্ধিতেও। ভবিষ্যতে এদেরই উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত। এ অবস্থায় জাতীয় দল অপেক্ষা করতেই পারে।) (অনুবাদ)

হুগলী অধিবেশনের সে সময়ের উত্তাপ, চুঁচুড়ার গৌরাঙ্গ নাট্য মন্দিরের শতাব্দী অতিক্রমী পরিবেশে নিশ্চিহ্ন হয়ে লুকিয়ে রয়েছে 'আর্কাইভস্'-এর নিথর অক্ষরগুলিতে, কিন্তু কখনও কখনও আশ্চর্য্য রকমে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, যখন কালজয়ী উচ্চারণ আমাদের নাড়া দেয়। আমরা যেমন এর পূর্বে বহুবারই স্মরণ করেছিলাম প্রেক্ষিত বিস্মৃত হয়ে চিরন্তন বলে মনে হয় সেই উচ্চারণ যা ৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ তাঁর ভাষণে এসেছিল 'I want to be heard in silence.' শ্রীঅরবিন্দকে বোঝবার পক্ষে এর চেয়ে বড়ো নির্দেশ আর হতে পারে না। তেমনি মানব প্রগতির ধারায় দেশ কাল পাত্র অতিক্রম করে যখনই স্থিতাবস্থার সঙ্গে গতিশীলতার পার্থক্য প্রকট হবে; তখনই মনে পড়বে শ্রীঅরবিন্দের লেখা 'Action solves the difficulties– which action creates. Inaction can only paralyse and slay', বর্তমান প্রবন্ধের দাবি মিটিয়ে বলা যায় এই কালজয়ী সমাধান এসেছে শ্রীঅরবিন্দের লেখনী থেকে হুগলী অধিবেশনের সভাপতি বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেনের মন্তব্যের উত্তরে।

উল্লেখপঞ্জি

১। SABCL-3, P. 458-59

২। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান (১৯৯৪) পৃ. ৩৬৭

৩। Glossary and Index of Proper Names in Sri Aurobindo's Works.(1st.edition 1989) Compiled by Gopal Das Gupta."

৪। SABCL 27, P. 33

৫। ঐ P. 36

৬। ঐ P. 41

৭। শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া স্মরণিকা ২০১৮ পৃ.৩৮-এ উদ্ধৃত হয়েছে 'ধর্ম্ম' পত্রিকার 'সংবাদ' বিভাগ থেকে তারিখ, ২৮এ ভাদ্র ১৩১৬ 'সম্মিলিত কংগ্রেসের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন—দেশভক্ত দলের চারিজন—যথা শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত রজত নাথ রায়, শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক) এবং শ্রীযুক্ত কৃতান্ত কুমার বসু, এম.এ.বি.এল। আর রাজভক্ত দলে চারিজন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বৈকুন্ঠনাথ সেন, শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু'

৮। SABCL-1, P.238-39

৯। SABCL-1 P. 238-39

১০। SABCL-2– P. 222

১১। ঐ P. 305-06

১২। SABCL 4, পৃ.২২৯

১৩। SABCL 2, P. 192-93

১৪। SABCL 4, পৃ. ১৮৭-১৮৮

১৪ক। Impatient Idealists থেকে উদ্ধৃতির মধ্যে আছে। SABCL-2, Page 192-র অনুবাদ।

১৫। বাংলা রচনার (২০১২) সংস্করণে একটু ভিন্নতর পাঠ রয়েছে। পৃ. ১৬২-তে পূর্বের সংস্করণে 'সংস্কারে প্রজাশক্তি'র পরে মুদ্রিত হয়েছে 'আত্ম বিকাশ দেখা যাইতেছে। কেবল ভারতেই অপেক্ষার আদেশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে...'

১৬। SABCL 2, P. 193

১৭। SABCL 2, P. 194

১৮। Sri Aurobindo Archives & Research Dec. 1983, P.192 সরকারি নথিতে রয়েছে—'All reports agree that Arabinda Ghosh had a strong numerical majority in the gathering inside the pandal; but he kept his forces in order and refrained from pressing his amendments to the resolutions for the sake of securing a united Congress' No.1889.—P.D. dated 20th Sept. 1909. From Sir Charles Allen. Kt Off. Chief Secretary to the Government of Bengal.To the Secretary to the Government of India, Home Department.

১৯। SABCL 2, P.199

* SABCL—Sri Aurobindo Birth Centenary Library

**** অনুবাদ প্রবন্ধকারের।**

[পুনর্মুদ্রণ—শ্রীঅরবিন্দ ভবন,হুগলী চুঁচুড়া স্মরণিকা ২০২০]

যেমন দেখেছি

বিশ্বনাথ রায়

অনেক বছর ধরে যার সঙ্গে সময় কাটাতে হয়, তিনি যদি হঠাৎই প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায় নিকটজনকে রেখে দিয়ে চলে যান তাহলে প্রকাশ্য সভায় তাঁর সম্পর্কে কথা বলা অস্বস্তিই হয়। এটা অভিজ্ঞতা। কিন্তু তবুও ভাগ করে নিতে হয় এবং সেইজন্যেই আমি এসেছি। বাবুয়া আমাকে সুযোগও দিয়েছিল—আমি নাও আসতে পারি। আবার সঙ্গে সঙ্গে বলেছে লক্ষ্মী হাউসের হয়ে বলার জন্যে। অনেকটা বছর এই বাড়ির সঙ্গে থাকার সুযোগ আমার হয়েছে। আর এর প্রাণ যিনি-জয়াদি-তাঁর সঙ্গে কাজেরও। সেই সূত্রে রথীনদা। কিছু সময় এখানে আমি বাসও করেছি। একটু আগে আসার ফলে আমি ডঃ সেনের কথা শুনলাম যিনি ছাত্রজীবনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সে ধরনের সুযোগ আমার হয়নি। ছেলেবেলায় মিল্টনের একটা কবিতার লাইন পড়েছিলুম, ঠিক তার ছবি দেখতে পাইনি, নিঃসন্দেহে রথীনদা'র মধ্যে সেটা আমি দেখেছিলুম— "They also serve who only stand and wait'। এইটে আমার খুব ওঁকে দেখলে মনে হত। একটা নিঃশব্দ ভালোবাসা মা-শ্রী অরবিন্দের প্রতি এবং যখন ওঁর বাইরের জীবনও অনেকটা গুটিয়ে এল তখন এখানে বাড়ির প্রায় সমস্ত দিকের প্রতি। আরেকটা বড়ো জিনিস—যেটা পরের দিকে আরও মনে হয়েছে তখন আমার ক্লাসের সংখ্যাও এখানে কমেছে। শেষের দিকে এখন মাসে একদিন আসি। কিন্তু আমার ক্লাসের ডানপাশটি আগের ক্লাসে ফাঁকা হয়ে গেল। অনেকেই সরেছেন। তবে রথীনদা'র যাওয়াটা, এই সরাটা বোঝা খুব অদ্ভুত। কারণ উনি ক্লাসেও আসতেন নিঃশব্দে, চলেও যেতেন নিঃশব্দে। কিন্তু এইবারই মনে হলো ওঁর যাওয়াটা শব্দময়। বড়ো শেখার। আর শেষ কথা এই আমাদের সমস্ত ব্যর্থতা, শুষ্কতার মধ্যে একটা বড়ো জিনিস আমরা এইখানে পেয়েছিলাম। আমাদের জীবনের মধ্যে শ্রী অরবিন্দ-মা'য়ের ছোঁয়া পড়েছে। এটা একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সেটা তো আমাদের অধিকার নয়। শাস্ত্র দিয়েছে।

কোনো না কোনোভাবে একটা জায়গায় ছোঁয়া পড়েছে। ওঁর জীবনে শ্রীঅরবিন্দের আরেকটা জিনিস আমার খুব মনে হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের লেখা একজায়গায় পড়েছিলাম —তারা ভগবানের প্রিয় যারা তাঁর হয়ে যুদ্ধ করে, আর যারা তাঁর উঠোন পরিষ্কার করে। কার্যত রথীনদা হাতে ঝাঁটাটি তুলে নিয়েছিলেন—লোক দেখানোর জন্যে নয়, যখন লোক তাকিয়ে থাকে না তখন তিনি এই প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করেছেন। খবর পেয়েছিলাম যেদিন তিনি চলে গেলেন সেদিন সকালেও তিনি পরিচ্ছন্ন করেছেন। এর চেয়ে আর বড়ো করুণা লাভ মানুষের জীবনে কী হতে পারে।

যে ভালোবাসা শ্রী অরবিন্দ-মা'র থেকে এসে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা হয়েছে সেটা মানুষী ভালোবাসা। সেই ভালোবাসাই এতদিন নিখাদ হওয়ার কাজ এখানে চলেছে। অগ্রজ রথীনদা'র কাছ থেকে সেই ভালোবাসা নিখাদ করার যেটুকু পেয়েছি সেটা যদি এ বাড়ির জন্যে কাজে লাগাতে পারি বাকি সময়টুকু ধন্য মনে করব।

[উৎসঃ বসুধারা, নবপর্যায়—১০, ২৪ জুন ২০০৭]

শ্রীঅরবিন্দের ‘কারাকাহিনী’ প্রসঙ্গে

ত্রিজ রায়

শ্রীঅরবিন্দের রচনায় হাস্যরসসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে মা বলেছিলেন, তিনি এ বিষয়ে এর চেয়ে বেশি বিস্ময়কর আর কিছু কখনো পড়েননি। তাঁর ছিল দেখবার এক বিশেষ ভঙ্গি, যা অবিশ্বাস্য—অবিশ্বাস্য।

(‘And you know, from the point of view of humour I have never read anything more wonderful, Oh! ......He had a way of looking at things......it’s incredible. Incredible......’)[১]

মায়ের এই মন্তব্য ‘কারাকাহিনী’র হাস্যরস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে খুবই সাহায্যের। যে কোনও বিষয় সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটি দেখবার সুযোগ নিলে হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। ধরা যাক বিচারব্যবস্থার বিশেষ দিক সম্বন্ধে—

‘আসামী চিনিবার ব্যবস্থাও অতি রহস্যময় ছিল।....

ত্রিশ চল্লিশজন দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের নাম জানা নাই, তাঁহাদের সহিত কোন জন্মে একবারও আলাপ হয় নাই, অথচ দুইমাস পূর্বে কাহাকে দেখিয়াছি, কাহাকে দেখি নাই, অমুককে অমুক তিন স্থানে দেখিয়াছি, অমুক দুইস্থানে দেখি নাই;—উহাকে দাঁত মাজিতে একবার দেখিয়াছি অতএব তাঁহার চেহারা আমার মনে জন্ম-জন্মান্তরের মত অঙ্কিত হইয়া রহিল। হরিকে দশবার দেখিয়াছি সুতরাং তাঁহাকে ভুলিবার কোন সম্ভাবনা নাই, শ্যামকে একবার মোটে আধ মিনিটের জন্য দেখিলাম, কিন্তু তাহাকেও মরণের অন্তিম দিন পর্যন্ত ভুলিতে পারিব না, কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই—এইরূপ স্মরণশক্তি এই অসম্পূর্ণ মানব প্রকৃতিতে, এই তমাভিভূত মর্তধামে সচরাচর দেখা যায় না। অথচ একজনের নহে, দুইজনের নহে, প্রত্যেক পুলিস পুংগবের এইরূপ বিচিত্র নির্ভুল অভ্রান্ত স্মরণশক্তি দেখা গেল। এতদ্বারা সী. আই. ডী.-র উপর আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা দিন দিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল।’...

'কোর্টের সময় তাঁহাদের পক্ষে অতি বিরক্তিকর ছিল,

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাইত যে, মোকদ্দমা চলিতেছে, ত্রিশ চল্লিশ জন আসামীর সমস্ত ভবিষ্যৎ লইয়া টানাটানি হইতেছে, তাহার ফল ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে পারে, অথচ সেই আসামীগণ সেই দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কেহ বঙ্কিমের উপন্যাস, কেহ বিবেকানন্দের রাজযোগ বা Science of Religions, কেহ গীতা, কেহ পুরাণ, কেহ য়ুরোপীয় দর্শন একাগ্র মনে পড়িতেছেন।......একদিন বার্লি সাহেবের দৃষ্টি এই দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল, এই আচরণ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অসহ্য হইয়া উঠিল..... বাস্তবিক বার্লি এমন সুন্দর বিচার করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোথায় সকলে আনন্দ লাভ করিবেন, না সকলে বই পড়িতেন। ইহাতে বার্লির গৌরব ও বৃটিশ জষ্টিসের মহিমার প্রতি ঘোর অসম্মান প্রদর্শন করা হইত সন্দেহ নাই।'

'যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারেন। পুলিস ও গোয়েন্দা, পুলিসের প্রেমে আবদ্ধ নিম্নশ্রেণীর লোক ও ভদ্রলোক এবং স্বদোষে পুলিসের প্রেমে বঞ্চিত, অনিচ্ছায় আগত সাক্ষীচয়। প্রত্যেক শ্রেণীর সাক্ষ্য দিবার প্রথা স্বতন্ত্র ছিল। পুলিস মহোদয়গণ প্রফুল্লভাবে অম্লানবদনে তাঁহাদের পূর্বজ্ঞাত বক্তব্য মনের মত বলিয়া যাইতেন, যাহাকে চিনিতে হয়, চিনিয়া লইতেন, কোনও সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই, ভুলচুক নাই। পুলিসের বন্ধুসকল। অতিশয় আগ্রহের সহিত সাক্ষ্য দিতেন, যাহাকে চিনিতে হয়, তাহাকেও চিনিয়া লইতেন, যাহাকে চিনিতে হয় না, তাহাকেও অনেকবার অতিমাত্র আগ্রহের চোটে চিনিয়া লইতেন। অনিচ্ছায় আগত যাঁহারা, তাঁহারা যাহা জানিতেন, তাহা বলিতেন, কিন্তু তাহা অতি অল্প হইত; নর্টন সাহেব তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষীর পেটে অশেষ মূল্যবান ও সন্দেহনাশক প্রমাণ আছে ভাবিয়া জেরার জোরে পেট চিরিয়া তাহা বাহির করিবার বিস্তর চেষ্টা করিতেন।.....জেরা শেষ হইলে অর্দ্ধনির্গত প্রাণ আবার ধড়ে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে যন্ত্রণামুক্ত করিত। কয়েকজন সাহসের সহিত সাক্ষ্য দিয়া নর্টনের গর্জনে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, ইংরাজ কৌন্সিলীও তাহা দেখিয়া জাতীয় প্রথা অনুসরণ পূর্ব্বক নরম হইয়া পড়িতেন।'

'কোন কোন সাক্ষী নর্টনকে ব্যতিব্যস্ত করিত।... বকিয়া ঝকিয়া, চেঁচাইয়া শাসাইয়া কোন উপায়ে অভীপ্সিত উত্তর বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার শেষ প্রশ্ন এই হইত, "What is your belief?"..........সাক্ষী হাঁ-ও বলিতে পারিতেন না, না-ও বলিতে পারিতেন না,..... নর্টনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে তাঁহার কোনও belief নাই,....... কিন্তু নর্টন সেই উত্তর চাহিতেন না, বারবার মেঘ-গর্জনের রবে সেই সাংঘাতিক প্রশ্নে সাক্ষীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িত, "Come, Sir, what is your belief?" নর্টনের রাগে বার্লি রাগিয়া উপর হইতে গর্জন করিতেন, "টোমার বিস্‌ওয়াস

কি আছে?" বেচারা সাক্ষী মহা ফাঁপরে পড়িতেন। তাঁহার কোন বিস্‌ওয়াস নাই, অথচ একদিকে ম্যাজিস্ট্রেট, অপর দিকে নর্টন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার নাড়ী ভুঁড়ি ছিঁড়িয়া সেই অমূল্য অপ্রাপ্য বিস্‌ওয়াস বাহির করিতে কৃতোদ্যম হইয়া দুইদিক হইতে ভীষণ গর্জন করিতেছেন। প্রায়ই বিস্‌ওয়াস বাহির হইত না... এক একজন বিস্‌ওয়াসের অপেক্ষা প্রাণই প্রিয় জিনিস বলিয়া কৃত্রিম বিস্‌ওয়াস নর্টন সাহেবের চরণকমলে উপহার দিয়া বাঁচিতেন...

'এই সত্যবাদী সাক্ষী (দেবদাস করণ) সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, যখন মেদিনীপুর সম্মিলনীর সময় সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার ছাত্রের নিকটে গুরুভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অরবিন্দবাবু তখন বলিয়া উঠিয়াছিলেন "দ্রোণ কি করিলেন?" ইহা শুনিয়া নর্টন সাহেবের আগ্রহ ও কৌতূহলের সীমা ছিল না, তিনি নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন দ্রোণ কোন বোমার ভক্ত বা রাজনৈতিক হত্যাকারী, অথবা মাণিকতলা বাগান বা ছাত্র ভাণ্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত।... অতএব তিনি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দ্রোণ কি করিলেন?" প্রথমতঃ সাক্ষী কিছুতেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। তাহা লইয়া পাঁচ মিনিট টানাটানি হয়, শেষে করণ মহাশয় দুই হাত আকাশে নিক্ষেপ করিয়া নর্টনকে জানাইলেন, "দ্রোণ অনেক অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছিলেন।" ইহাতে নর্টন সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন না। দ্রোণের বোমার অনুসন্ধান না পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন কেন?.......নর্টন সাহেব চটিলেন, গর্জন আরম্ভ করিলেন। সাক্ষীও চীৎকার আরম্ভ করিলেন। একজন উকিল হাসিয়া এই সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে, সাক্ষী বোধ হয় জানেন না, দ্রোণ কি করিলেন। করণ মহাশয় ইহাতে ক্রোধে অভিমানে আগুন হইলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি? আমি? আমি জানি না দ্রোণ কি করিলেন? বাঃ, আমি কি আদ্যোপান্ত মহাভারত বৃথা পড়িয়াছি?" আধঘণ্টা দ্রোণাচার্য্যের মৃতদেহ লইয়া করণে নর্টনে মহাযুদ্ধ চলিল। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর নর্টন আলিপুর বিচারালয় কম্পিত করিয়া তাঁহার প্রশ্ন ঘোষণা করিতে লাগিলেন, "Out with it, Mr. Editor What did Dron do?"

জেলের জীবন যাত্রার সম্বন্ধে দুএকটি বিষয়

'আমাদের বাসস্থান ত এইরূপ ছিল, সাজ-সরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের সহৃদয় কর্তৃপক্ষ আতিথ্য সৎকারের ত্রুটি করেন নাই। একখানা থালা ও একটি বাটি উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্ব্বস্বস্বরূপ থালা-বাটির এমন রূপার ন্যায় চাক্‌চিক্য হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দোষ কিরণময় উজ্জ্বলতার মধ্যে 'স্বর্গজগতে' নিখুঁত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উপমা পাইয়া রাজভক্তির নির্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একটু জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণ্যমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন এক হাতে আহার করা, এক হাতে থালা

ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুষ্ট্যন্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত।'

'অপর আসামীদের ভাগ্যে ইহাও ঘটে নাই, এক বালতির জলেই তাহাদিগকে শৌচক্রিয়া, বাসন মাজা ও স্নান সম্পন্ন করিতে হইত। মোকদ্দমার আসামী বলিয়া এই অতিমাত্র বিলাস করিতে দেওয়া হইত, কয়েদীদের দুই-চারি বাটি জলে স্নান হইত। ইংরাজেরা বলে ভগবৎ প্রেম ও শরীরের স্বচ্ছন্দতা প্রায়ই সমান ও দুর্লভ সদ্‌গুণ, তাহাদের জেলে এই জাতীয় প্রবাদের যাথার্থ্য রক্ষণার্থ অথবা অতিরিক্ত স্নানসুখে কয়েদীর অনিচ্ছাজনিত তপস্যায় রসভঙ্গ ভয়ে এই ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আসামীরা কর্তৃপক্ষদের এই দয়াকে কাকের স্নান বলিয়া তাচ্ছিল্য করিত। মানুষমাত্রই অসন্তোষপ্রিয়।'

এবার শোনা যাক্ আহার সম্বন্ধে

'জেলের আহারের অদ্ভুত চেহারা দেখিয়াও এই ভাবের ব্যাঘাত হয় নাই। মোটা ভাত, তাহাতেও খোলা, কঙ্কর, পোকা, চুল, ময়লা ইত্যাদি কত প্রকার মশলা দেওয়া, —স্বাদহীন ডালে জলের ভাগ অধিক, তরকারীর মধ্যে ঘাস-পাতা শুদ্ধ শাক। ....এই শাকের বিমর্ষ গাঢ় কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়াই ভয় পাইলাম, দুই গ্রাস খাইয়া তাহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিয়া বর্জ্জন করিলাম।

.........দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, কিন্তু দুবেলা শাকের তরকারী, ঐ ডাল, ঐ ভাত। জিনিষটা বদলান দূরের কথা চেহারারও লেশমাত্র পরিবর্তন হয় নাই, তাহার ঐ নিত্য সনাতন অনাদ্যনন্ত অপরিণামাতীত অদ্বিতীয় রূপ। দুই সন্ধ্যার মধ্যেই কয়েদীকে এই নশ্বর মায়াজগতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাইবে।'

'অল্পক্ষণ পরে লফ্‌সী আমার দরজায় হাজির হইল। কিন্তু সেই দিন তাহা খাই নাই, কেবল তাহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হইল। ইহার কয়েকদিন পরে প্রথমবার এই পরমান্ন ভোগ হয়। লফ্‌সীর অর্থ ফেনের সহিত সিদ্ধ ভাত, ইহাই কয়েদীর ছোট হাজরী। লফ্‌সীর ত্রিমূর্তি বা তিন অবস্থা আছে। প্রথম দিন লফ্‌সীর প্রাজ্ঞভাব, অমিশ্রিত মূলপদার্থ, শুদ্ধ শিব শুভ্রমূর্তি। দ্বিতীয় দিন লফ্‌সীর হিরণ্যগর্ভ, ডালে সিদ্ধ, খিচুড়ি নামে অভিহিত, পীতবর্ণ, নানা ধর্ম্মসঙ্কুল। তৃতীয় দিনে লফ্‌সীর বিরাট মূর্তি অল্প গুড়ে মিশ্রিত, ধূসর বর্ণ, কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যের ব্যবহার যোগ্য। আমি প্রাজ্ঞ ও হিরণ্যগর্ভ সেবন সাধারণ মর্ত্ত্য মনুষ্যের অতীত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, এক একবার বিরাটের দুগ্রাস উদরস্থ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের নানা সদ্‌গুণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চ দরের humanitarianism ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইতাম।'

দেবদাস করণের 'আদ্যোপান্ত মহাভারত পাঠ'—উপাখ্যান-এর মত বিস্তৃতভাবে না হলেও অনুরূপ ঘটনার নানা প্রসঙ্গ বারে বারেই ফিরে এসেছে 'কারাকাহিনী'তে,

আর সে সময়ের শাসন ব্যবস্থার ছিদ্রগুলি 'নিখুঁত ব্রিটিশ রাজতন্ত্র' বা 'ব্রিটিশ জষ্টিসের মহিমা' এই রকম বাক্য ব্যবহারে বিদ্রূপের আঘাতে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এরই মধ্যে শব্দের ভিন্নতর উচ্চারণের সুযোগ নিয়ে, যখন বিদেশীর মুখে 'বিশ্বাস' শব্দের 'বিসওয়াস' ব্যবহার করে সাক্ষীর পেট চিরে বার করার প্রসঙ্গ আসে, তখন ভক্ত পাঠক বিস্মিত হয়ে ভাবেন তাঁর প্রণম্য পরম নীরবতার মূর্ত প্রতীকই কি এসব অংশের লেখক! এই রকম ঘটনার মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ চরিত্রের দুর্বল দিকটি চিনিয়ে দেন, যে গর্জনে ভ্রূক্ষেপ না করলে 'জাতীয় প্রথা' অনুসারে তারা নরম হয়ে পড়েন। মনে পড়বে গ্রেপ্তারের সময়ের কথায় লিখেছিলেন, ক্রেগানের 'অভদ্র কথায়' তিনি যখন উত্তর করেন, তখন 'ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন।'

হাস্যরস সৃষ্টিতে তাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলির প্রসংগে মনে হয় এসময় তাঁর জীবনযাত্রায় যেমন প্রচলিত হিন্দু অভ্যাসের কথা অনেকে জানিয়েছেন,[২] তেমনই হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের আলোচনায় যে ধরনের ভাষা ব্যবহার হত, তারই প্রয়োগ এসময়ে পাই, যা পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় আর দেখা যায় না। ' কারাকাহিনীতে, 'অসম্পূর্ণ মানবপ্রকৃতি', 'তমাভিভূত মর্তধাম', 'অনিচ্ছাজনিত তপস্যা', 'নিত্য সনাতন অনাদ্যনন্ত অপরিণামাতীত অদ্বিতীয় রূপ', 'নশ্বর মায়াজগতের স্থায়িত্ব' শব্দবন্ধ এমন সব প্রসঙ্গে প্রয়োগ করেছেন, যে সাধনার এই ভাবগুলিকে হাস্যরসের সৃষ্টিতে ব্যবহার; ভাষাটির ওপর কতখানি অধিকার জানিয়ে দেয়, তা কেবলমাত্র ঐ ভাষা ব্যবহারকারীরাই বুঝবেন। অর্থাৎ ভিন্ন ভাষায় ঐ শব্দবন্ধের অনুবাদ কখনোই বাঞ্ছিত রস সৃষ্টি করবে না। লফ্‌সীর ত্রিমূর্তি প্রসঙ্গে 'প্রাজ্ঞ' 'হিরণ্যগর্ভ', 'বিরাট'—এর যে পরিচয় নিয়েছেন, এরপর কারও কি অধিকার রেখেছেন বলার যে, তিনি হাসতে জানেন না। যদি তাই বলা হয়, তাহলে শুধরে বলতেই হবে—হাসাতে জানেন।

অথচ, প্রসঙ্গ পালটে গেলেই তাঁর এই ভাষা হয়ে ওঠে মন্ত্রের সহোদর। 'কারাকাহিনী' সেই বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী।

উল্লেখপঞ্জি

বর্তমান লেখার মূল বিষয় 'কারাকাহিনী' হওয়ায় সেখান থেকে উদ্ধৃত অংশ এখানে নির্দেশ করা হয়নি। পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণের জন্য লেখক উদ্ধৃত অংশের কয়েকটি জায়গায় নিম্নরেখা দ্বারা চিহ্নিত করেছেন।

(১) Nirodbaran's Correspondence with Sri Aurobindo Vol-II, p. VII (Ed. 1984)

(২) 'যতদূর স্মরণ হয়, এসময় তিনি হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। দক্ষিণ দিকের বারান্দায় তোলা উনুনে তাঁর রান্না হইত।'

—বলাই দেবশর্মা, 'গল্পভারতী' পৌষ ১৩৫৭

পুনর্মুদ্রণঃ শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্তিকা, ২৪শে এপ্রিল ২০২০

সমাজ নয়, সংঘ

ত্রিজ রায়

'সমাজ নয়, সংঘ'-এই অংশটুকু শ্রীঅরবিন্দের সুপরিচিত বাংলা রচনা 'জগন্নাথের রথ' থেকে নেওয়া। সম্পূর্ণ বাক্যটি হোল— 'জগন্নাথের এই রথের আসল নাম সমাজ নয় সংঘ।' এখানে আর একটু তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হোল, যখন লেখাটি প্রথম প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবর্তক' পত্রিকায়, তখন শিরোনাম ছিল 'সমাজ-কথা', আর উপ-শিরোনাম ছিল— 'জগন্নাথের রথ'। গ্রন্থাকারে 'জগন্নাথের রথ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৮ (১৯২১), কিন্তু 'সমাজ-কথা' নামে প্রথম প্রকাশিত ৩০এ চৈত্র ১৩২৫ (১৩ এপ্রিল ১৯১৯)[১]। এতটা বলার কারণ, আমরা যে অংশটিকে আলোচনার বিষয় করতে চলেছি, সেটি ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের 'সংঘ' ভাবনার কথা উঠলেই স্মরণে আসে ভাই বারিনকে লেখা তাঁর ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসের চিঠিটি। আমাদের বর্তমান আলোচ্য অংশটি তার একবৎসর পূর্বের। ভাইকে লেখা চিঠির মধ্যে 'সমাজ-কথা'র উল্লেখ রয়েছে। এ প্রবন্ধটির গুরুত্ব বিশেষ এজন্যে যে এখানে শ্রীঅরবিন্দ 'সমাজ' ও 'সংঘ' শব্দের উৎপত্তিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় চিহ্নিত করেছেন। আবার এই প্রবন্ধের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাব সে ইংগিত, যে ত্রুটিমুক্ত আদর্শ সমাজই হয়ে উঠবে 'সংঘ'। আমরা মূল প্রবন্ধের কিছুটা পড়ে নিতে পারি।

'জগন্নাথের এই রথের আসল নাম সমাজ নয়, সংঘ। বহুমুখী শিথিল জনসংঘ বা জনতা নয়, আত্মজ্ঞানের, ভাগবত জ্ঞানের ঐক্যমুখী শক্তির বলে সানন্দে গঠিত বন্ধনরহিত অচ্ছেদ্য সংহতি, ভাগবত সংঘ।

অনেক সমবেত মানুষের একত্র কর্ম করিবার উপায় যে সংহতি, তাহাই সমাজ নামে খ্যাত। শব্দের উৎপত্তি বুঝিয়া অর্থও বোঝা যায়। সম প্রত্যয়ের অর্থ একত্র, অজ ধাতুর অর্থ গমন জীবন যুদ্ধ। সহস্র সহস্র মানব কর্মার্থে ও কামার্থে সমবেত, এক

ক্ষেত্রে নানা লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, কে আগে যায় কে বড় হয়, তাহা লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি—Competition— যেমন অন্য সমাজের সংগে তেমন পরস্পরের সংগেও যুদ্ধ ও ঝগড়া ঝাঁটি—এই কোলাহলের মধ্যেই শৃংখলার জন্য, সাহায্যের জন্য, মনোবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নানা সম্বন্ধ স্থাপন, নানা আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ফলে কষ্টসিদ্ধ অসম্পূর্ণ অস্থায়ী কিছু, ইহাই সমাজের প্রাকৃত সংসারের চেহারা।

ভেদকে ভিত্তি করিয়া প্রাকৃত সমাজ। সেই ভেদের উপর আংশিক অনিশ্চিত ও অস্থায়ী ঐক্য নির্মিত। আদর্শ সমাজের গড়ন ঠিক ইহার বিপরীত। ঐক্য ভিত্তি, আনন্দ—বৈচিত্র্যের জন্য—ভেদের নয়—পার্থক্যের খেলা। সমাজে পাই শারীরিক, মানসকল্পিত ও কর্মগত ঐক্যের আভাস, আত্মগত ঐক্য সংঘের প্রাণ।'[২]

সংহত প্রকাশে এই দুই শব্দের ভাবগত পার্থক্য নির্ণয়। আমাদের বুদ্ধির প্রচেষ্টায় যে মাত্রাতেই গিয়ে পৌঁছাই না কেন, সুদীর্ঘ প্রযুক্তি ছাড়া এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর সার্থকতার চরম বলে কিছু তো হয় না। ১৯১৯ সালে যে সূত্রটি ধরিয়ে দিলেন, 'প্রবর্তক সংঘ'-এর মধ্যে তার প্রথম প্রয়োগ বলা যায়; সে ইংগিত রেখে গেছেন ভাইকে লেখা চিঠিতে ১৯২০ সালে। পরে সরাসরি একান্ত নিজের প্রয়োগ রূপে দেখা দিল শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আর সেই আদর্শ সামনে রেখে সমাজ থেকে সংঘ-এর দিকে যাত্রা চলেছে ও চলবে। শতবর্ষ অতিক্রম করে, এতটা দীর্ঘ পথ পার হয়ে এখন আমাদের সংঘগুলি কি 'সমাজ' বলতে শ্রীঅরবিন্দ যা বুঝিয়েছেন, তার থেকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে? উত্তর পাওয়ার জন্য প্রশ্ন নয়। উত্তর এ প্রবন্ধের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দ রেখেছেন।

প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটি ছিল 'আদর্শ সমাজ, মনুষ্য সমষ্টির অন্তরাত্মা...' আর আমাদের উদ্ধৃত অংশের মধ্যে রয়েছে—'ভেদকে ভিত্তি করিয়া প্রাকৃত সমাজ। ... আদর্শ সমাজের গড়ন ঠিক ইহার বিপরীত।... সমাজে পাই শারীরিক, মানসকল্পিত ও কর্মগত ঐক্যের আভাস, আত্মগত ঐক্য সংঘের প্রাণ।' তাহলে, এর থেকে স্পষ্ট, 'সমাজ', 'আদর্শ সমাজ' হয়ে উঠলেই 'সংঘ' হতে পারে। যে 'আত্মগত ঐক্য' সমাজে নেই, সেটি ফুটে উঠলেই সার্থক হবে 'সংঘ' রূপে।

সাধারণ জীবনের মধ্যে নিঃস্বার্থবোধের প্রচেষ্টা দিয়েই যাত্রা শুরু হবে। তা দিয়েই এক 'সমাজ' ক্রমে লক্ষ্য করবে অহং থেকে মুক্তির, যা ক্রমে 'আত্ম ঐক্যে' প্রতিষ্ঠা পাবে। এর চিহ্ন কি কিছু দেখা যাচ্ছে প্রায় শতাব্দীর প্রচেষ্টায়, শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে? নিজেদের দিকে তাকালে নিরুত্তর হতে হয়। মনে পড়ে মায়ের কথা, বলেছিলেন, স্বেচ্ছা আশাবাদী হতে। সেই আলোয় দেখা দেয় 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের কয়েকটি ছত্র, আশ্বাসে ভরে দেয় বুক, শ্রীঅরবিন্দ কর্মীর—

I saw the Omnipotent's flaming pioneers
The sun-eyed children of a marvellous dawn.
The massive barrier-breakers of the world,
Into the fallen human sphere they came,
Feet echoing in the corridors of Time.
Their tread one day shall change the suffering earth
And justify the light on Nature's face."[৩]

"সর্বশক্তি ঈশ্বরের বহ্নিমান অগ্রগামী দল
অপরূপ ঊষসীর সূর্য চক্ষু সন্তান তাহারা
চূর্ণ করে জগতের গুরুভার বাধার প্রাচীর
মানবের বিপরীত ক্ষেত্রমাঝে তারা নেমে এল
পদধ্বনি তাহাদের শোনা যায় কালের প্রাংগণে
তাদের চরণপাতে একদিন পাল্টে দেবে ক্লিষ্ট ধরণীরে
সার্থক করিয়া দেবে সেই আলো যাহা আছে প্রকৃতি-আননে।"[৪]

কোন কর্মীসংঘের বার্ষিক অনুধ্যানে এর চেয়ে বড় আশ্বাসী-প্রসাদ আর কি হতে পারে!

উল্লেখ পঞ্জি

১। বিস্তৃত জানবার জন্য দেখুন- উল্লেখপঞ্জি-৬৯, শতবর্ষ পূর্বে স্নেহের বারিনকে 'শ্রীঅরবিন্দের একটি চিঠি', বর্তিকা, ২৪ এপ্রিল ২০২১, পৃ-২৯

২। শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা, ৫ম সংস্করণ ২০১২. পৃ. ২৫১-২৫৪

৩। Savitri Book III– Canto IV (Ed.1993,p.343-44)

৪। অনুবাদ: যুগল কিশোর মুখোপাধ্যায় (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০, পৃ ৩৬০)

পুনর্মুদ্রণ : নূতন জগৎ—১৪২৯ (ইং ২০২২) সংখ্যা

সংঘজীবনে অর্থব্যবস্থা

ব্রিজ রায়

কেন্দ্রগুলির সমবেত কর্মধারায় মূলত, বাড়িটি পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রয়োজনমত সংস্কার আর সমবেত ধ্যান ও আলোচনা, পাঠ, 'দর্শন' ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। কলকাতার তিনটি প্রধান কেন্দ্র ও কয়েকটি শহরের কেন্দ্রে আশ্রম ও অন্যান্য কেন্দ্রের উৎপাদিত কিছু জিনিসের বিক্রয়-ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য ধ্যান, আলোচনা ও অনুষ্ঠানের পাশে তারা গৌণ। কিন্তু কেন এমন? আশ্রম ঘুরে আসা ভ্রমণার্থী কিন্তু 'অনেক শান্তির ক্ষেত্র' উচ্চারণের সংগে ডাইনিং হল-এর ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা আর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকাণ্ডের কথা উৎসাহে, আবেগের সংগেই বলে থাকেন।

আমাদের কেন্দ্রগুলিতে ভেবে ওঠা হয়নি এসব নিয়ে। কেন? সাধারণত:, নিরুত্তর ভূমিকা। যদি প্রায় বাধ্য হতে হয়, তখন বলতে হয়- 'এটুকুর জন্যেই লোক নেই। তাছাড়া ওসব অনেক ঝুঁকির ব্যাপার।' সব ঠিক, কিন্তু সবই ঠিক কি? কোথাও কোনো সংস্কার লুকিয়ে নেই তো। একশ বছর আগে (এপ্রিল ১৯২০) ভাই বারিনকে চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ একজনের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—'তার আগে অনেক পুরাতন সংস্কার ছিল, কয়েকটি খসেছে, কয়েকটি এখনও আছে। আগে ছিল, সন্ন্যাসের সংস্কার, অরবিন্দ মঠ করতে চেয়েছিল, এখন বুদ্ধি মেনেছে সন্ন্যাস চাই না, প্রাণে কিন্তু সেই পুরাতনের ছাপ এখন একেবারে মুছে যায় নি।' অল্পবিস্তর এই ভাব আমাদের মধ্যেও অন্য দিক থেকে নেই কি? আমরা 'মা' গ্রন্থের ক্লাসে চতুর্থ অধ্যায়ে, 'অর্থ এক বিশ্বজনীন শক্তির স্থূল চিহ্ন' পড়ি, নানা দিক থেকে নানা উদাহরণে বুঝে নিই, অসুর কবলিত অর্থ শক্তিকে মায়ের পায়ে ফিরিয়ে আনার কথা, কিন্তু আমাদের কেন্দ্রে 'সমবেত কর্ম' নিবেদনে তার প্রকাশ কই? কোথাও যেন শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানীরূপের আড়ালে রয়ে গেছে তাঁর সাধনার পূর্ণতার লক্ষ্যের দিকটি।

ফিরে যেতে পারি তাঁর 'ঘোরম্ কর্ম্মম্'-এর দিনগুলিতে। ১৯০৮ সালের ১৫ জানুয়ারি বোম্বের গিরগাঁওয়ে এক দীর্ঘ ভাষণে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় শিক্ষাধারা নিয়ে নানাদিক থেকে আলোচনা করেন। ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে একথা জানাতে ভোলেন না যে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে স্বনির্ভর হতে হবে। বললেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে শিক্ষার্থীকে। জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য এই নয় যে অন্য কেউ তার ভার বইবে। শিক্ষার্থী অন্যের প্রত্যাশী হবে না। জাতীয় বিদ্যালয়ে অনলসভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে সে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। ('A student must be able to stand on his own. It is not the objective of National Education to make somebody else carry him on his shoulders. The student must support himself and not look helplessly to others. Self reliance is the basic principle we diligently try to impart to a student.') এই ভাষণে কিছু পূর্বেই তিনি জানিয়েছেন, জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা বিজ্ঞান গভীরভাবে পড়ে, কোন ওপরভাসা পাঠ নয়। তাদের কাঠের কাজ, কামারশালার কাজের মত অনেক বৃত্তিমূলক শিক্ষাও দেওয়া হয় বিজ্ঞানের সঙ্গে। ফলে যখন শিক্ষার্থী বিদ্যালয় থেকে বার হয়, তখন মাসে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা বেতন পাওয়ার বাধা থাকে না। ('In our schools, the students learn about science in depth and not just superficially. And they are taught many vocational subjects such as carpentry and smithy along with science. The result is that when a student comes out of our schools he does not find it difficult, to earn a monthly wage of twentyfive thirty rupees.') এতটা উদ্ধৃতি এটি বোঝবার জন্য যে চিরকালের স্বপ্ন জানানোর সময় প্রতিদিনের দায়ভার ভোলেন না। ১৯০৮-এ তিরিশ টাকাটি যে জীবনের মহৎ আদর্শের অনুসরণে বাধ্যতামূলক সহায়তা, সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন সকলকে। এ ধারা চলেছে তাঁর সঙ্গে বাংলা থেকে পণ্ডিচেরিতে।

এর বারো বছর পরে ভাইকে যখন লিখছেন (এপ্রিল ১৯২০) 'আমি আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে চাই বিশাল বীর সমতা, সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারের সকল বৃত্তিতে পূর্ণ দৃঢ় অবিচলিত শক্তি, শক্তি সমুদ্রে জ্ঞান সূর্যের রশ্মির বিস্তার, সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম আনন্দ ঐক্যের স্থির 'ecstasy'। তার একটু আগেই লিখেছেন—'এ দিকে দেশের ক্রমশ অবনতি, জীবনীশক্তি হ্রাস হয়েছে, শেষে বাংগালী নিজের দেশে কি হয়েছে, খেতে পাচ্ছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত, ব্যবসা বাণিজ্য জমিচাষ পর্যন্ত আস্তে আস্তে পরের হাতে যেতে আরম্ভ করেছে।' এই রকম দুটি ভাব সাথে সাথে চলেছে, তা আমরা দেখতে পাব। সবসময় আদর্শ ও বাস্তব একত্র। কারণটাও লিখেছেন এই চিঠিতেই-'আমরা জগতের

কোনো কার্য বাদ দিতে চাই না, রাজনীতি বাণিজ্য সমাজ কাব্য শিল্পকলা সাহিত্য সবই থাকবে, এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে। '

আমরা বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়োজনে বিশেষভাবে লক্ষ্য করব 'বাণিজ্য' বিষয়টি। শ্রীঅরবিন্দ যখন নিজের মধ্যে এই ভাবনাকে গড়ে তুলছিলেন, তা কোনো কল্পনার ছিল না। চন্দননগরের 'প্রবর্তক সংঘ', সারা বাংলা, এমনকি ভারতে যে নতুন আশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তার উৎসটি শতবর্ষ পূর্বের এই পত্রে পাওয়া যাবে। বারীন্দ্রকে লিখছেন— মতিলালের ক্ষুদ্র লোকসংহতি একটি experiment মাত্র, দেখছে সংঘবদ্ধ হয়ে বাণিজ্য industry চাষ ইত্যাদি করবার উপায়। আমি শক্তি দিচ্ছি watch করছি, ভবিষ্যতের মালমশলা আর useful suggestion এর মধ্যে থাকতে পারে। এখনকার দোষগুণ ও limitation দেখে judge করো না। এই সকলের এখন initial ও experimental অবস্থা।'

যে সময়ে ভাইকে চিঠি লিখছেন, তার কয়েক মাস পরেই '**Arya**' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যে সময় শুরু হয়েছিল, প্রায় ৬ বছর আগে, সে সময় থেকে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনাকে, তার মূল সত্যটিকে কালের আধারে ভবিষ্যতের দ্বিপ্রহরের প্রস্তুতিতে নিয়ে যাওয়ার বিপুল তাত্ত্বিক ভিত্তিটি গড়ে দেওয়ার কাজটি যিনি করলেন, তিনি যে পত্রিকাটির অর্থকরী সমস্ত ব্যবস্থা—কিভাবে গ্রাহক করা, গ্রাহক করার জন্য যারা কাজ করবে, তাদের 'কমিশন' দেওয়া, হিসাব রাখা, প্রুফ দেখা, প্রেসের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে প্রতিমাসের ১৫ তারিখে বের করা, পত্রিকার কাগজের মান অনুসারে দরদাম করা, এসব একা করে আমাদের কাছে উদাহরণ রেখে গেছেন। শুধু তাই নয়, 'আর্য'-এর আর্থিক সাফল্য লাভের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল, যার ফলে সেসময়ের সব খরচ সামলে, পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়ার সময়, যথেষ্ট বাড়তি থেকে যায়, সেকথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। ('The **Arya** was, in fact a financial success. It paid its way with a large surplus.')

এ সময়েই শ্রীমা এলেন (২৪ এপ্রিল ১৯২০)। ৬ বছর পরেই শ্রীঅরবিন্দ একান্ত বাস নিলে ধীরে গড়ে উঠল শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। আমরা শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্নকে আরও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবে রূপ নিতে দেখলাম। দক্ষিণ ভারতে, সমুদ্রতীরে এই আশ্রমটি বাইরের কোন প্রচলিত চিহ্নে চেনা কঠিন। জগতের কর্মধারার একটি সার্বিক প্রতিনিধিত্ব করছে বলে মনে হয়। উৎপাদন ও বিপণনের তালিকা ধরলে বৈচিত্র্যে বিস্মিত হতেই হয়। শ্রীঅরবিন্দের লেখায় যে তালিকা আমরা বারীন্দ্রকে লেখা চিঠিতে পেয়েছি, তার মধ্যে একমাত্র 'রাজনীতি' ছাড়া অন্য সবই এ আশ্রমে পাওয়া যাবে। নিজেদের উৎপাদনের বাইরের জিনিস বিপণনের ক্ষেত্রে যখন 'পেট্রল পাম্প' আর মুদি মনোহারী দোকান— '**Honesty**'-তে ঢোকা যায়, তখন এক ভ্রমণার্থীর সরস মন্তব্য মনে পড়ে— সত্যি All life is Yoga, সমগ্র জীবনই যোগ।

একটা ভূমিকা স্মরণ করানো জরুরী হয়ে পড়ছে যে, এসবের মধ্যে 'সেবা' (Service) বৃক্ষের নীচে সমাধির ওপর ফুলের আলপনা, আর নীরব ধ্যানকক্ষ কিন্তু এই বিপুল কর্মধারার কেন্দ্রেই রয়েছে। আমাদের এখানকার কেন্দ্রগুলি কি কোনভাবে, আশ্রমে মায়ের ওই সংগঠনের কিছু ছোঁয়া পেতে পারে না? অন্তত, সামান্য কিছু!

২৪ এপ্রিল, ২০২০; বাধ্য হয়েই যখন ঘরে বসে মোবাইলে মনোজদার (শ্রীমনোজ দাশগুপ্ত) কণ্ঠে মায়ের শতবর্ষ পূর্বে এদিনের অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম, বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিলাম; কেন না, মায়ের সে অভিজ্ঞতার কথা, এত বছরে কোথাও পড়িনি। সেই অংশগুলি বার বার শুনেও যেন আবার শুনতে ইচ্ছে করছিল। মা বলছিলেন—'... And 1920, marked the beginning of full development. Not spiritual development — that had been going on from the very start— but Action, the action with Sri Aurobindo. That was clearly from 1920. I had met Sri Aurobindo earlier but it really began in 1920 (১৯২০ চিহ্নিত করেছে পূর্ণ উপলব্ধির সূচনা। আধ্যাত্মিক অগ্রগতির নয়, সে তো হয়ে চলেছে একেবারে শুরু থেকেই। এ হলো 'অ্যাকশন'— কাজ, কর্মধারা, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কর্মধারা। তা স্পষ্টত ১৯২০ থেকেই। আমি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেছিলাম আগেই, কিন্তু তা বাস্তবে শুরু হলো ১৯২০ থেকে।) কর্মধারা— শ্রীঅরবিন্দ কর্মধারা। এরপরে, ঠিক ৫০ বছর পরে তো শ্রীমা, নিজেই এক সংগঠন গড়ে, নাম দিলেন 'Sri Aurobindo's Action' এবার তো সে কর্মধারার সুবর্ণ জয়ন্তী। এতো এক সুযোগ! এইভাবে উদ্দীপিত হওয়ার।

দুবছর আগে যখন 'অরোভিল'-এর সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছিল, তখন আমরা ভেবেছিলাম, শুধু অরোভিলের প্রশংসাতেই কি শেষ হবে কৃতজ্ঞতা? বরং আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই কিছু চেষ্টা করি। তার ফল 'নূতন জগৎ'-এর পূর্বের সংখ্যায় সমবেত আবাসের স্বপ্ন, প্রস্তাবনায় এসেছিল। নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ভাবনা চলছে, চেষ্টা শুরু হয়েছে।

আজ তবে স্বপ্ন দেখা যাক, আমাদের কেন্দ্রেই শুরু করা যাক কিছু না কিছু উৎপাদন এবং বিপণনের। চাইলেই সেই শ্রীঅরবিন্দ পরিমণ্ডলে এসব বিষয়ে নানা দিকের বহু অভিজ্ঞ রয়েছেন, তাদের কাছে আমাদের অধিকারে থাকা জায়গাটুকুর পরিমাণ বলি। আমাদের বাড়তি সময়টুকু জানাই। মা, দিনের মধ্যে অন্তত এক ঘণ্টা, নিঃস্বার্থ, পারলে অহংশূন্য কর্ম নিবেদনের কথা বলেছিলেন, ফুল, ধূপের মত সেটি উৎসর্গিত হোক।

যে ছেলেটি এসে প্রণাম করে যায়, তার 'টিউশনি' চাকরীর পরীক্ষা প্রস্তুতির পাশে, একটু সময় কিছুটা অর্থ বিনিময়েই পাওয়ার ব্যবস্থা হোক। পারলে উৎসাহী

তরুণটিকে সঙ্গে নিয়ে নিজেরা যোগ দিয়ে আলাদা একটা 'সমবায়' তৈরি করে, কেন্দ্রের সহযোগিতায় এ ধরনের কাজে গেলে কেন্দ্রের আইনগত দায় থেকে মুক্ত থাকা যাবে। নিজেদের অর্থের কিছুটা এসব উদ্যোগে সুদহীন ধার হিসেবেই আসুক। প্রয়োজনে যতদিন না আত্মনির্ভরশীলতা আসে, ততদিন যা স্থায়ী আমানতে রয়েছে তার কিছুটা এখানে ব্যবহারের সাহস আমরা পাই। কেন্দ্রের অছি পরিষদের সদস্যরা মাকে প্রার্থনা জানান। হয়তো মায়ের কথাই মনে আসবে, যা পাঠচক্রে শোনা গেছে—

"First of all, from the financial point of view, the principle on which our action is based is the following: Money is not to make money. This idea that money must make money is a falsehood and a perversion.

Money is meant to increase the wealth, the prosperity and the productiveness of a group, a country or, better of the whole earth. Money is a means, a force, a power and not an end in itself. And like all forces and all powers, it is by movements and circulation that it grows and increases its power, not by accumulation and stagnation.

What we are attempting here is to prove to the world, by giving it a concrete example, that by inner psychological realisation and outer organisation a world can be created where most of the causes of human misery will be abolished." (Collected Works of the Mother Vol.13, p-154)

('সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে, আমাদের কাজের মূলনীতির ভিত্তি হলঃ আরও অর্থ উপার্জনের জন্য অর্থ নয়। অর্থ দিয়ে আরও অর্থ বৃদ্ধি করতেই হবে এ ধারণা ভ্রান্ত এবং বিকৃত।

'অর্থের প্রয়োজনীয়তা হল কোনও গোষ্ঠী, দেশ অথবা বলা ভাল সারা পৃথিবীর ধনসম্পদ, ঐশ্বর্য এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার জন্য। অর্থ হল একটি মাধ্যম, একটি শক্তি, একটি ক্ষমতা, কিন্তু কখনোই চরম লক্ষ্য নয়। এবং অন্য আর সব শক্তি এবং ক্ষমতার মতই, তার শক্তিও বৃদ্ধি পায় তার চালনা এবং সংবহনের মধ্য দিয়ে, তাকে পুঞ্জীভূত করে বা আবদ্ধ করে রেখে নয়।

'আমরা এখানে যা করবার প্রয়াস করছি তা হল পৃথিবীর কাছে একটি বাস্তব উদাহরণ সহযোগে প্রতিপন্ন করা যে, অন্তরের মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি এবং বাহ্যিক সংগঠনের দ্বারা এমন এক জগৎ গড়ে তোলা সম্ভব যেখানে মানুষের দুঃখ কষ্টের বেশির ভাগ কারণগুলি অবলুপ্ত হবে।')

(শ্রীমায়ের রচনা সংগ্রহ ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ১৫৩)

শ্রীঅরবিন্দের সুগভীর তত্ত্বকে শ্রীমা আমাদের কাছে সহজবোধ্য করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘকাল ধরে প্রয়োগ করে অনুশীলনযোগ্য উদাহরণও সামনে ধরে রেখেছেন। এসব কর্মে যাঁরা মায়ের কাছে থেকে জেনেছেন, শিখেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা এখন অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সেসব নিয়ে আলোচনা হোক; কিন্তু কাজে নেমে আলোচনা চলুক। আমাদের নিজেদের মধ্যে সাবধানতা যে কখন আশংকায় পরিণত হয়েছে, আমরা জানি না। মনে পড়ে, একেবারে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলিতে, শ্রীঅরবিন্দ 'ধর্ম' পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় 'অসম্ভবের অনুসন্ধান' শিরোনামে লিখেছিলেন—'অসম্ভব আদর্শের কথায় আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাহারা বর্তমানের সংকীর্ণ সীমার বাহিরে কিছুই দেখিতে চাহে না ও পারে না তাহারা ভবিষ্যতের ভাবনার ভাবুকদিগকে, চিরদিনই অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে।'

এই সংকীর্ণ দৃষ্টি আমাদের মধ্যে বারে বারেই আমরা দেখতে পাই। কিন্তু, এও সত্য যে আবার 'অসম্ভবের আদর্শ' মনে হলেও প্রেরণা বোধ করি তা অতিক্রম করার। বিশেষ বিশেষ দিনগুলির উদ্‌যাপন, এই রকম উদ্দীপিত মুহূর্তের সুযোগ দেয় নিজেদের নতুনভাবে পাওয়ার। আমাদের মধ্যে শ্রীমায়ের স্থায়ীভাবে আসার শতবর্ষ উদ্‌যাপন, অন্যান্য সবের মধ্যে 'বাহ্যিক কাজ'—'External action' গুরুত্ব পাক যথার্থ অর্থেই— শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছিলেন—'আমরা জগতের কোনো কার্য বাদ দিতে চাই না।' ১১২ বছর আগের ভাষণে শ্রীঅরবিন্দ যে শিক্ষার্থীকে, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন ('A student must be able to stand on his own'), সেটা পণ্ডিচেরি হয়ে এখন আমাদের কেন্দ্রে আসুক, আমাদের মাত্রায়। কেন্দ্রগুলির অনুষ্ঠানে স্বনির্ভর তরুণের উপস্থিতিতে আমাদের সক্রিয় ভূমিকা হোক, শতবর্ষ উদ্‌যাপনের উপচার।

আমরা জানি, শ্রীঅরবিন্দ মায়ের কথার মধ্যে কাজের মোহ সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করা হয়েছে। মা বলেছেন— "The illusion of action is one of the greatest illusion of human nature. It hurts progress because it brings on you the necessity of rushing always into some excited movements." ('কাজের এই যে মোহ, এ হল মানুষের প্রকৃতিগত সবচেয়ে বড় রকমের এক বিড়ম্বনা। এর দ্বারা উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে। কারণ, অনুক্ষণ এই মোহ তোমাকে কোনো না কোনো চাঞ্চল্যকর আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে উত্তেজিত করবে।') অবশ্যই এ শিক্ষা আমাদের মনে রাখতে হবে। তা বলে কাজ ছেড়ে নয়। আমরা অবশ্যই মনে রাখব মায়ের নির্দেশ— 'Agitation, haste, restlessness lead no where' ('বিক্ষোভের সৃষ্টি করা, তাড়াহুড়ো করা, উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা, প্রভৃতির দ্বারা

কোনো কাজই হয় না।’) প্রশ্ন উঠবে, আমরা এসব বাধা থেকে মুক্ত থাকতে পারব কি? নিশ্চয়ই চলার পথে এসব বাধা আসতেই পারে, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কথাও মনে আসবে—“Action solves the difficulties, which action creates. Inaction can only paralyse and slay.”

(কাজ করা যে বাধা সৃষ্টি করে, কাজ করেই তা সমাধান করা যায়। কাজ বন্ধ করা কেবলমাত্র বিফল করতে আর বিনষ্ট করতে পারে।)

ভাবনাচিন্তা চলুক, সেই সঙ্গে কাজও চলুক। ‘মা’ গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ে “দিব্য কর্মের সত্য কর্মীর”—এই আদর্শকে সামনে রেখে, আর সেই সঙ্গে আশ্রমের অর্থনীতি-ব্যবস্থাকে এখানকার কেন্দ্রের পক্ষে যতটা গ্রহণ করা সম্ভব, তাকে আন্তরিক ভাবে প্রয়োগের প্রয়াস করে।

পুনর্মুদ্রণ: নূতন জগৎ—১৪২৮ (ইং ২০২১) থেকে

শ্রীঅরবিন্দের গ্রামভাবনা

ব্রিজ রায়

শ্রীঅরবিন্দের গ্রামভাবনার প্রসঙ্গ উঠলেই গোপালদা (শ্রী গোপাল চক্রবর্তী) আর তার স্বপ্নের ঊষাগ্রাম প্রকল্পের কথা মনে পড়ে। আমাদের বাংলায় এই ভাবনাটি তাঁর মত করে শ্রীঅরবিন্দ পরিমণ্ডলে আর কেউ গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে পড়ে না। গোপালদার এই প্রয়াস দ্যুমান ভাইকে (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম পণ্ডিচেরির এক সময়ের ম্যানেজিং ট্রাষ্টী) বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

বুদ্ধিগত স্তরে আলাপ আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে গ্রামের কথা উঠতো, কিন্তু সেও অন্য সব বিষয়ের তুলনায় যৎসামান্য। এখনও তাঁর আবির্ভাবের সার্ধশত বর্ষের অনুষ্ঠানে গ্রাম কই? কিন্তু গ্রাম তো তিনি যখন 'বন্দেমাতরম্'-এ লিখেছেন, তখন যেমন বাস্তব আজও তাই। বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগে যতই তথাকথিত পাউডার মাখা হোক না কেন কোষকে অবজ্ঞা করে বা তার সম্বন্ধে উদাসীন থেকে কি নীরোগ থাকা সম্ভব? গ্রাম বিষয়েও তাই।

সচেতন হলে আমরা দেখব ১৯০৮-এর ৮ মার্চ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় লিখতে গিয়ে পরিচিত কবিতার উল্লেখ এসেছিল—'It was a life beautifully simple healthy, rounded and perfect a delight to the poet..."—এ ছিল জীবন-যাত্রা, সরলতার সৌন্দর্যে, স্বাস্থ্যে, আনন্দে ভরা, যেমন কবি দেখেছেন। আমাদের মনে পড়বে—'ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড়, ছোট ছোট গ্রামগুলি'।

১৯০৮-এর এই গ্রাম, তাঁর জীবন লক্ষ্যের পূর্ণতর রূপায়ণে যখন বহুধা বিস্তৃত, তখনও কিন্তু 'গ্রাম'-এর স্মৃতিটি 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে ধরা পড়েছে। পিতার নির্দেশে সাবিত্রী যখন বেরিয়ে পড়েছেন পরিক্রমায় সেখানে রয়েছে— 'Hamlet and village saw the fate-wain pass.' ('কুটির সব, গ্রামসব চেয়ে দেখে চলেছে রথ এক মূর্ত নিয়তি যেন' (অনুবাদ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত)।

যে প্রবন্ধের (৮/৩/১৯০৮) প্রসঙ্গে আমরা 'সাবিত্রী' স্মৃতিতে চলে এসেছিলাম, গ্রামের স্নিগ্ধ অনুভবটির পাশে তিনি কিন্তু মনে করিয়ে দিয়েছিলেন সেই প্রবন্ধতেই যে সে সময়ে সামাজিক সংগঠন রূপেও আদর্শ ছিল ভারতের গ্রাম্যগোষ্ঠীগুলি। ('...then the village communities of India were ideal form of social organisation)

এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার সার্থক প্রকাশ পূর্ববঙ্গের কিশোরগঞ্জের ভাষণ, যেটি 'বন্দেমাতরম্' সাপ্তাহিক সংস্করণে ১৯০৮-এর ২৬ এপ্রিল মুদ্রিত হয়েছিল, যা 'পল্লীসমাজ' নামে, 'Speeches'-এ আমরা পড়ে থাকি। এগুলি অবলম্বন করে অমলেশ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ 'শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে স্বদেশী ও গ্রাম-স্বরাজ' বিশেষ উল্লেখের হবে। এ লেখাটি 'শৃন্বন্তু' পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১৩৮২ তে প্রথম প্রকাশিত হয়, এখন সে পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় সংকলিত হয়ে সহজ লভ্য হয়েছে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের গ্রামভাবনার মনে হয়, সুবিবেচিত মূল্যায়ন ('Considered estimate') সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ সামনে আসতে দেখিনি, তা হল ১৯১৩ সালে বা তার কাছাকাছি সময়ে (in or around 1913) লেখা গভীর দৃষ্টির সংহত প্রকাশের কিছু সংকলন, যা 'Thoughts and Aphorisms' নামে পরিচিত, তার একটি চিন্তাকণিকা, যার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ রেখে গেছেন তাঁর গ্রামভাবনার সার কথা "India had three fortresses of a communal life, the village community, the larger joint family, and the orders of the sannyasins, all these are broken or breaking with the stride of egoistic conceptions of social life, but is not this after all only breaking of these imperfect mould, on the way to a larger and diviner communism". ('ভারতে সংঘবদ্ধ জীবনের ছিল তিনটি দুর্গ—গ্রাম্যগোষ্ঠী, বৃহত্তর যৌথ পরিবার আর সন্ন্যাস আশ্রম। তিনটিই ভেঙে গিয়েছে কি ভাঙার উপক্রম হয়েছে সামাজিক জীবনের অহংপ্রতিষ্ঠ ব্যবস্থার প্রচলনে— কিন্তু এও কি একটা প্রয়াস নয় যাতে ওসব অসম্পূর্ণ আদর্শ ভেঙে ফেলে একটা বৃহত্তর দিব্যতর সমষ্টিতন্ত্রের দিকে হয় অগ্রগতি?' অনুবাদক— শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।)

যে গ্রামকে তিনি সংগঠনরূপে আদর্শ বলেছিলেন, সেই গ্রাম সম্বন্ধে ১৯০৮-এ সে লেখাতেই মন্তব্য করেছিলেন 'The day of the independent village and group of villages has gone and must not be revived, the nation demands its hour of fulfilment and seeks to gather the village life of its rural population into a mighty single and compact democratic nationality.' তাঁর কথায় বলা যায়, স্বাধীন গ্রাম বা গ্রামগোষ্ঠীর দিন চলে গিয়েছে, আর তাকে ফিরিয়ে আনার নয়। জাতির দাবী এখন তার পরিপূর্ণতায় গ্রাম ও গ্রাম্য

সমষ্টিকে এক শক্তিবদ্ধ স্বতন্ত্র জাতীয়তায় বাঁধা। এই ভাবনার পাঁচ বছর পরে এই চিন্তা কণিকাটিতে ইঙ্গিত করলেন যে ভারতের দুর্গ সদৃশ বলে চিহ্নিত করেছিলেন যে তিনটিকে, তার অন্যতম যে গ্রাম্যগোষ্ঠী, তার এই পরিণতি, এক বৃহত্তর, দিব্যতর রূপান্তরের প্রয়োজনেই; শ্রীঅরবিন্দের গ্রামভাবনার এই গভীর দিকটি, তাঁর অনুগামীদের কাছে এনে দিয়েছে এক আবশ্যিক নিবিড় সক্রিয় অনুধ্যানের দাবী। মনে হয়, ঊষাগ্রামের বর্তমান কর্মীরা এ বিষয়ে উদ্যোগী হলে, শ্রীঅরবিন্দ কর্মধারায় প্রয়োজনীয় একটি অধ্যায় যুক্ত হবে।

উৎস : ১৮৭২-২০২২ শ্রীঅরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি—অমৃত কথা (৭ই আগস্ট ২০২২)—ঊষাগ্রাম ট্রাস্ট

শ্রীঅরবিন্দের অভূতপূর্ব কারাবাস

ত্রিজ রায়
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কোলকাতা
(লেখকের "শ্রীঅরবিন্দ বঙ্গপর্ব" পুস্তকের অংশ বিশেষ)

শ্রীঅরবিন্দ জন্মেছেন বাংলায়। কিন্তু, শৈশবেই বিদেশে। ফিরলেন উচ্চ শিক্ষিত হয়ে একুশ বছরের যুবক। কর্মক্ষেত্র বরোদা- মহারাজা গাইকোয়াড়ের বিশেষ আমন্ত্রণে। ছুটি পেলেই আসেন বাংলায়, প্রস্তুতি চলে ভবিষ্যৎ কর্মের, কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে সময় নিল দীর্ঘ তের বছর। ১৯০৬ সালে এলেন স্থায়ী হয়ে, তাও চার বছরের কম সময়ের জন্য — এর মধ্যে এক বৎসর কারাবাস।

শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ২রা মে ১৯০৮ সালে। 'কারাকাহিনী'তে লিখেছেন— "চারিদিন পর আমরা স্নান করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম। স্নানের পর তাহারা (ব্রিটিশ প্রশাসন) সকলকে নিজ নিজ নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়, আমিও নির্জন কারাগারে ঢুকলাম, ক্ষুদ্র ঘরের গরাদ বন্ধ হইল। ৫ই মে আলিপুরে কারাবাস আরম্ভ। পর বৎসর ৬ই মে (১৯০৯) নিষ্কৃতি পাই।" এ এক অভিনব কারাকথা।

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে এই দ্বিতীয় মামলা, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নানা কারণেই অনন্য। এক বৎসর বিচারাধীন বন্দী হিসাবে আলিপুর কারাগারে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু উল্লেখ করেছেন এই স্থানটিকে "আলিপুরস্থ আশ্রম" রূপে। লিখেছেন— "সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার", "সেই যোগাশ্রম", 'সেই ক্ষুদ্র সাধন কুটিরে' তাঁর যে অভিজ্ঞতা, রেখে গেছেন তা 'কারা কাহিনী'তে মূল বাংলায়। বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে, এ ভাষা তিনি মুখে সহজ ব্যবহার করতে পারতেন না। চর্চার সময়ও ছিল না তাঁর। 'এই সবই ব্রহ্ম' 'বাসুদেবই সব'— এই অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল আলিপুর কারাগারেই। শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন—"এইরূপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না। সেই উচ্চপ্রাচীর, সেই

লোহার গরাদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্য্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিসপত্র যেন আর অচেতন নহে, সে সর্ব্বব্যাপি চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে, তাহারা আমাকে ভালোবাসে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায় এইরূপ বোধ হইত। মনুষ্য, গাভী, পিপীলিকা, বিহঙ্গ চলিতেছে, উড়িতেছে, গাহিতেছে, কথা বলিতেছে, অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া, ভিতরে এক মহান, নির্মল, নির্লিপ্ত আত্মা শান্তিময় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন।"

'উত্তরপাড়া অভিভাষণে' বললেন " যে জেল আমাকে মানবজগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই, আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব— দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার সেলের গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার ওপর পাহারা দিচ্ছিলেন। আমার পালঙ্ক স্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল, তার উপর শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন—সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের।"

এই অভিজ্ঞতার সঙ্গেই বিশেষভাবে উল্লেখ করার আর একটি অভিজ্ঞতা, যেটি সম্পর্কে যে কোনো কারণেই হোক, আমরা আগের অভিজ্ঞতা দুটির মত গুরুত্ব দিই না। অথচ এর গভীরে প্রবেশ করলে ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হবে এবং ভারতের ঋষি মুনিদের শিক্ষা থেকে শুরু করে শ্রীঅরবিন্দ যে ভবিষ্যৎ সাধনার দুয়ার উন্মুক্ত করেছেন, তার মধ্যে সেতুটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে এটা বাস্তবিক যে তিনি একপক্ষকালব্যাপী তাঁকে সম্বোধন করে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ শুনেছিলেন জেলে, তাঁর নিভৃত ধ্যানে এবং বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন।... সে কণ্ঠ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কেবলমাত্র এক বিশেষ এবং সীমাবদ্ধ অথচ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলেছিল এবং থেমে গিয়েছিল ঠিক তখনই, যখন সেই বিষয়ে যা বলার ছিল তা শেষ হয়ে যায়।

শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে প্রথম ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন এই যোগের দিকে। যে সময়ে তিনি এ চিঠি লিখছেন ততদিনে তাঁর নিজস্ব যোগধারা রূপ নিয়েছে — তাই বলেছেন "This Yoga"। সে যোগ, পূর্ণ যোগ, যা রূপান্তরের যোগ। যা প্রকৃতির রূপান্তর সাধন করে ভগবানকে বাইরের জীবনেও ফুটিয়ে ধরতে চায়। সেই চিঠিতেই তিনি আরও লিখেছিলেন, আলিপুর জেলে বিবেকানন্দ তাঁকে দিয়ে ছিলেন সেই জ্ঞানের ভিত্তি, যার ওপরে দাঁড়াবে আমাদের সাধনা। স্বামীজীর

দেওয়া জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে শ্রীঅরবিন্দ গড়ে দিলেন সেই সাধনপথ, যা নব প্রজাতির আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করে তুলছে। পৃথিবী হয়ে উঠছে দিব্য। যা ছিল স্বামীজীর স্বপ্নের ভাষায়- "The world shall know that it is one with God"- পৃথিবী জানবে যে ভগবানের সঙ্গে সে এক।

শ্রীঅরবিন্দের এই আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতার কাল তাঁর জীবনের বঙ্গপর্ব, সাক্ষী আলিপুর কারাগার। এসব যখন চলছে, তখন মামলা শেষ হয়ে গেল। এক সময়ের সহপাঠী বিচক্রফট্ বিচারক হয়ে রায় দিলেন যে— সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করে তাঁর সিদ্ধান্ত এই — যে গুরুতর অভিযোগ শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তাতে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ যথেষ্ট নেই। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে অন্য যাঁরা মুক্তি পেলেন তাঁদের সকলকে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

এই বিচার চলাকালীন আদালতের মধ্যেই ১৫ই আগস্ট ১৯০৮ সালে শ্রী অরবিন্দের জন্মদিন উদযাপিত হয়।

[জামশেদপুর থেকে ষান্মাসিক পত্রিকা যোগ ও বাণী ২০১৪ (শারদীয়া সংখ্যা) থেকে পুনর্মুদ্রিত]

ত্রিজ রায়ের রচনা—

১) শ্রীঅরবিন্দ: বঙ্গপর্ব—কিছু কথা কিছু আশা
২) বক্তা শ্রীঅরবিন্দ
৩) কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের শেষ আবাস
৪) Sri Aurobindo’s last Abode in Kolkata
৫) দুর্গাস্তোত্র প্রসঙ্গে
৬) শ্রীঅরবিন্দ স্মরণিকা
৭) শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাত্রা
৮) শ্রীঅরবিন্দের কারাকাহিনী প্রসঙ্গে
৯) শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত আর্য প্রসঙ্গে
১০) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির (১৯৪১-২০১৬)
১১) শ্রীঅরবিন্দ ও হুগলী
১২) শ্রীঅরবিন্দ ও হুগলী অধিবেশন
১৩) শ্রীঅরবিন্দ ও উত্তরপাড়া অভিবেশন
১৪) শ্রীঅরবিন্দ ও চন্দননগর
১৫) Sri Aurobindo and Hooghly Conference
১৬) Sri Aurobindo and Hooghly
১৭) স্বাগত শ্রীঅরবিন্দ
১৮) শ্রীঅরবিন্দ ও বারুইপুর অভিভাষণ
১৯) Sri Aurobindo and Uttarpara Speeches
২০) শ্রীমায়ের সংগঠন

প্রয়াণলেখ

দ্বিজ থেকে ত্রিজ ৷৷ ডালিয়া সরকার ৬৩

আলোর পথযাত্রী ৷৷ আভাস নারায়ণ বিশ্বাস ৬৪

পাঠমন্দির ও বিশ্বনাথদা ৷৷ অসিত ভট্টাচার্য ৬৮

দ্বিজ থেকে যিনি ত্রিজ হয়েছিলেন ৷৷ সুব্রত সেন ৭১

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় স্মরণে ৷৷ অনুরাগ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭

Biswanath Roy :
A Scholar of Unparalleled Devotion ৷৷ Dr. V Ananda Reddy ৮০

বিশ্বনাথ রায় স্মরণে ৷৷ এলিজাবেথ চক্রবর্তী ৮২

আমাদের সবার প্রিয় বিশ্বনাথদা ৷৷ সমরেশ চট্টোপাধ্যায় ৮৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি ৷৷ মিতা চক্রবর্তী ৮৬

In remembrance of Prof. Biswanath Ray ৷৷ Suman Sikdar ৮৯

বিশ্বনাথদা স্মরণে ৷৷ নমিতা দত্ত ৯২

শ্রদ্ধাঞ্জলি ৷৷ শ্রীলেখা মজুমদার ৯৪

বিশ্বনাথ রায় স্মরণে ৷৷ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ৯৬

বিশ্বনাথদার স্মৃতিতে ৷৷ সুব্রত গায়েন ৯৯

বিশ্বনাথ জ্যেঠু : রয়েছো মননে ৷৷ চন্দ্রিমা চ্যাটার্জী ১০৩

স্মৃতির তরণী বেয়ে ৷৷ ত্রিদিব রঞ্জন সরকার ১০৬

A Mad Child of The Mother ৷৷ Belarani Satpathy ১১২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে বিশ্বনাথদা ৷৷ দিলীপ কুমার চ্যাটার্জী ১১৭

শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের বাণীবাহক বিশ্বনাথদা ৷৷ সন্দীপ মজুমদার ১১৯

আমাদের বিশ্বনাথদা ৷৷ গৌতম দে ১২১

শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথদার স্মৃতিচারণ ৷৷ সমীর কুমার দাস ১২৫

আমার পথ-প্রদর্শক বিশ্বনাথ রায় ৷৷ গার্গী গুপ্ত ১২৬

আমাদের বিশ্বনাথদা ৷৷ শান্তনু সাহা ১২৮

পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় স্মরণে ৷৷ তপন প্রামাণিক ১৩২

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়– এক আলোকবর্তিকা ৷৷ আশিস কুমার বসু ১৩৫

বিশ্বনাথদা প্রসঙ্গে ৷৷ পার্থসারথি বসু ১৩৬

জন্মান্তর ৷৷ মৈত্রেয়ী মুখার্জী ১৩৮

বিশ্বনাথদাকে যেমন দেখেছি ৷৷ উত্তম কুমার ভৌমিক ১৪১

কি হবে আমার কল্পান্তের প্রলয়ের প্রশ্বাসেঃ বিশ্বনাথ রায় ।। মুকুন্দ গোস্বামী ১৫৫
স্মরণে মননে বিশ্বনাথদা ।। স্বপন ভট্টাচার্য্য ১৬০
বিশ্বনাথদার কাছে যা শিখেছি ।। সোমা রায়চৌধুরী ১৬৯
আচার্যের পদপ্রান্তে নতজানু এক শিক্ষার্থীর স্মৃতিচারণায়
অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় ।। ড. বুদ্ধদেব মণ্ডল ১৭৩
চিরসখা হে...।। ভাস্কর মুখোপাধ্যায় ১৮৯
আমাদের বিশ্বনাথ রায় ।। গৌরাঙ্গ শেঠ ১৯৫
অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় শুধু একটি নাম নয় ... ।। অধীতী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮
বিশ্বনাথদার কিছু স্মৃতি ।। মনোরঞ্জন দেবনাথ ২০১
অনন্য বিশ্বনাথদা ।। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৪
বিশ্বনাথদা ।। অতনু চট্টোপাধ্যায় ২০৭
বিশ্বনাথদা ও সখের বাজার কেন্দ্রের স্মৃতি ।। সর্বাণী ভৌমিক ২১১
সূর্যালোকিত পথে আমাদের বিশ্বনাথদা ।। সরস্বতী ভৌমিক ২১৩
স্মৃতির আয়নায় অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় ।। গোবিন্দলাল চক্রবর্তী ২১৭
Prof. Biswanath Ray—Our Biswanathda ।। Saswati Bhattacharya ২২০
প্রয়াত অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়-এর স্মরণে ।। দিলীপ কুমার রায় ২২২
অপূরণীয় ।। উত্তম কুমার ভৌমিক ২২৩
আমার দৃষ্টিতে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় ।। সঞ্জীবন সেনগুপ্ত ২২৪
আমার জীবনের আলোকবর্তিকা প্রফেসর বিশ্বনাথ রায় ।। সুপ্রিয় বিশ্বাস ২২৬
মনের মানুষ বিশ্বনাথদা ।। ডাঃ মহেন্দ্র রায় ২২৭
সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথদা ।। অনিতা চ্যাটার্জী ২২৮
ভগবানের মানুষী যন্ত্র ।। অমিয় মুখার্জী ২৩১
আমার চোখে বিশ্বনাথদা ।। অপরাজিতা চক্রবর্তী ২৩৮
Prof. Biswanath Ray — a profile ।। Dr. Soumitra Basu ২৪১
শ্রীঅরবিন্দ-সাধক-ভক্ত শ্রী বিশ্বনাথ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ।। শুভা মল্লিক ২৪৩
'ও অকূলের কূল' ।। শ্রীজা রায় ২৪৫
কর্মী বিশ্বনাথ রায় ও শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া ।। অজিত কুমার মল্লিক ২৪৭
আমার স্মৃতিতে শ্রী বিশ্বনাথ রায় ।। ডাঃ শৈলেন্দ্র লাহা ২৪৯
শ্রোতা ও বক্তা: শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ রায় ।। তপন মণ্ডল ২৫২
শ্রীঅরবিন্দ পথে এক অক্লান্ত পথিক — বিশ্বনাথ রায় ।। আশিস কুমার রুদ্র ২৫৩
চিত্ররূপময় ।। বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ২৬২

দ্বিজ থেকে ত্রিজ

ডালিয়া সরকার
পুদুচেরী

১৯৭৮ সালে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় তথা বিশ্বনাথদাকে প্রথম দেখি আশ্রমের ডাইনিং হলে সপরিবারে। তাঁর সহধর্মিনী প্রণতি রায় ও ছোট্ট ফুটফুটে কন্যা পরমা, সকলে মিলে আশ্রমে এসেছেন আশ্রম স্কুলে পরমার ভর্তির ব্যাপারে। প্রণতিদি কন্যাকে নিয়ে পণ্ডিচেরীতে থেকে গেলেন। অভিভাবক বিশ্বনাথদা তাই কলকাতা থেকে প্রায়ই আসাযাওয়া করতেন। তিনি একদিকে অধ্যাপক, অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমার রচনার উপর নিবিষ্ট গবেষক। অনেক পত্রপত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর অবদানে। আশ্রমে যখন তিনি আসতেন আমরা অপেক্ষা করে থাকতাম তাঁর বক্তৃতা (Talk) শুনব বলে। স্কুলের 'হল অফ হারমনি'তে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা হত। শ্রীঅরবিন্দ কিংবা শ্রীমার লেখা কোন একটি বিষয়ের উপর, বিশেষ করে তা যদি আবার কোন একটি বিতর্কিত বিষয় হয়, তাহলে সেই বিষয়ের উপর বিশ্বনাথদার যথার্থ আলোকপাত ও মূল্যবান আলোচনা আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ, শব্দ চয়ন, যুক্তি প্রয়োগ ও বিষয়ের উপস্থাপনা প্রভৃতি মিলিয়ে তাঁকে এক অসাধারণ বক্তা হিসাবে তুলে ধরে।

শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমার অসীম জগতে বিশ্বনাথদার যে উজ্জ্বল আসনটি ছিল তা চিরতরে শূন্য হয়ে গেল, কিন্তু তিনি চিরদিন ভাস্বর থাকবেন তাঁর সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্যে। তাঁকে আমরা সাহিত্যের জগতে 'ত্রিজ রায়' — এই নামে পাই। খুব তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্মান্তর। তিনি দ্বিজ ছিলেন, শ্রী অরবিন্দ-শ্রীমার চেতনায় আবার জন্ম নিয়ে তিনি হয়েছেন 'ত্রিজ'। এভাবেই জন্মে জন্মে তিনি শ্রী অরবিন্দ-শ্রীমার প্রবক্তা হয়ে আসবেন। আমরাও আসব তাঁর শ্রোতা হয়ে। তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করি।

আলোর পথযাত্রী

আভাস নারায়ণ বিশ্বাস
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ব্যারাকপুর

আজ এমন একজন মানুষের কথা আমাকে লিখতে হচ্ছে যিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ বলয়ের অন্তর্গত হাজার হাজার মানুষের পরম শ্রদ্ধাভাজন ও কাছের মানুষ , বিশ্বনাথদা। মা- শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তাঁর অস্তিত্বের মূল ভরকেন্দ্র ও চিরায়ত আশ্রয়। শ্রীঅরবিন্দচর্চা ও অনুধ্যান তাঁর জীবনে এতটাই সর্বগ্রাসী আকার নিয়েছিল যে জীবনের যে কোন বিষয় বা ঘটনাকে তিনি অত্যন্ত সহজভাবে relate করতে পারতেন তাঁর আন্তর-জীবনবোধ ও বিশ্বাসের সঙ্গে। মা- শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কাছে কোন মতবাদ ও বৌদ্ধিক চর্চার বিষয় ছিল না, তা ছিল তাঁর হয়ে ওঠার পৈঠা; সেই মহাজীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে যুক্ত করবার এক সচেতন প্রয়াস। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন বা পূর্ণযোগের উপর তাঁকে কোনদিন তাত্ত্বিক গুরুগম্ভীর বিশ্লেষণ করতে দেখিনি। 'মা' বইয়ের উপর কোলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবনে বা শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে 'সাধনা'র উপর ক্লাসে উপস্থিত থেকে দেখেছি, 'শব্দ' কিভাবে 'মন্ত্র' হয়ে ওঠে। সে এক প্রত্যাদিষ্ট প্রাণবন্ত কণ্ঠস্বর, যার অমোঘ আবেদন, স্বর ও ধ্বনি মাধুর্য আমাদের আবিষ্ট করে তুলত, যেন পৌঁছে যেতাম মা জননীর নিরাপদ আশ্রয়ে। আমরা নির্ভার, হালকা হয়ে উঠতাম। যেন চৈত্য আলোকে স্নান করে উঠতাম। ঠাকুরের ভাষায় ভগবানের 'চাপরাশ' পাওয়া কাকে বলে তা শনাক্ত করতে অসুবিধা হত না।

কিন্তু শুধু বক্তার category তে তাঁকে ফেলা যাবে না। তিনি ছিলেন একাধারে বক্তা, কর্মী, সংগঠক, গবেষক, লেখক, শিক্ষক ও আমৃত্যু আগ্রাসী পাঠক। তাঁর এক একটি বক্তৃতা শুনে বা সান্নিধ্যে এসে কত মানুষের জীবন যে ঘুরে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। কাকে কোন জায়গা থেকে ধরতে হবে, তা বুঝতে পারার এক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা তাঁর ছিল।

কোথায় যাননি তিনি? গোটা পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা চষে বেরিয়েছেন। গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত জায়গায় তাঁর সৎসঙ্গ অবাধ গমনাগমন। সর্বত্রই তাঁর মুখে দিব্যজীবনের রূপকারের বার্তা শুনতে সমাগম। একটা ঘটনা বলি, স্মৃতির পাতায় এখনও জ্বলজ্বল করছে। কালীনারায়ণপুর জংশন। সে এক স্বপ্নের জায়গা। গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা। মাঝখান দিয়ে চূর্ণী নদী বয়ে যাচ্ছে। খরস্রোতা। কত রংবেরঙের পরিযায়ী পাখির আনাগোনা। সেই নদী-সংলগ্ন , শ্রীঅরবিন্দ পাঠচক্র। সেখানকার প্রাণপুরুষ শ্রী অতুলচন্দ্র নাথ। বয়েস তখন সত্তর। সারা জীবন শ্রীমা- শ্রীঅরবিন্দ চর্চা করতে করতে তিনি তখন শ্রীঅরবিন্দময়। তদাকারাকারিত। তার সাদর আহ্বানে একদিন বিশ্বনাথদা এসে হাজির। এবং একেবারে প্রায় Vini Vidi Vici-র মত পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমাগত সর্বস্তরের মানুষকে এক অন্য জগতে নিয়ে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দের নবজীবনের মন্ত্রে সবাই যেন সেদিন দীক্ষিত হল। পাশে বসে থাকা অতুলবাবুর চোখ থেকে তখন কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। অনেকবারই বলেছিলেন 'বাক' এবং 'শক্তি' অবিনাভূত। সেদিন তা প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম 'বাক' কিভাবে ক্রিয়াতৎপর হয়ে ভিতরকার শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে।

আসলে মানুষটা যা বলতেন তা মনে প্রাণে ষোলআনা বিশ্বাস করতেন। এ বিশ্বাসের একটা জোর আছে যা সবাইকে নাড়িয়ে দিত, ভিতর থেকে সংশয়, ব্যামিশ্রতার জগদ্দল পাথর সরিয়ে সেখানে স্থান করে নিত মায়ের উপর নিঃসংশয় নির্ভরতা ও বিশ্বাস।

আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা ও কূপমণ্ডুকতার ঘেরাটোপের আড়ালে তাঁকে কোনদিন থাকতে দেখিনি। ঠাকুরের ভাষায় 'আম খেয়ে মুখ মুছে ফেলেননি'। 'আম' যে তিনি খেয়েছেন সেটা নিজেই আমাদের সঙ্গে হয়তো এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর চলে যাবার তিন-চার বছর আগেকার ঘটনা। আমি ছাড়া সেদিন আমার সঙ্গে ছিল ঝর্ণা সামন্ত ও উত্তম কুমার ভৌমিক। ঝিকিরার শ্রীঅরবিন্দ ভবনে এক বাৎসরিক অনুষ্ঠানে তাঁকে আসার আমন্ত্রণ জানাতে বেহালাস্থিত তাঁর আবাসনে আমরা একবার গিয়েছিলাম। খুব খোলা মেজাজে ছিলেন সেদিন। সত্তর দশকের শেষের দিকে যখন তিনি বেলডাঙায় ছিলেন তাঁর জীবনে একটা decisive moment এসেছিল, যা, তাঁর কথায় তাঁর পরবর্তী জীবনের গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কথাগুলি এখনও আমার কানে বাজে। "দেখ আভাস, আমি এজন্যে প্রস্তুত ছিলাম তাও নয়, সে এক explosion , অন্তর্জগতে যেন এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল, সবকিছু যেন শূন্য হয়ে গেল, শব্দ দিয়ে একে প্রকাশ করা যায় না।" উপনিষদের মর্মবাণী মনে পড়ে গেল , "যতো বাচো নির্বতন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" , এমন এক অভিজ্ঞতা মন ও বাক্ যাকে ধরতে গিয়ে বারবার ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে অথবা,

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ,
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

[তিনি যাঁকে বরণ করেন তাঁর কাছেই তিনি (আত্মা) নিজের তনু প্রকাশ করে ধরেন।]

এবার ইচ্ছে করছে দাদার কিছু বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করতে যা আজকাল ক্রমশঃ অপসৃয়মান, খুব একটা চোখে পড়ে না।

১) দাদা ছিলেন যে কোন শ্রীঅরবিন্দ পথিকের কাছে এক সুলভ তথ্যভাণ্ডার বা মহাফেজখানা। একেবারে কোট্ আনকোট্ করে বলে দিতে পারতেন প্রাসঙ্গিক মা-শ্রীঅরবিন্দের বাণী এবং সেই বাণী কোন বইতে পাওয়া যাবে তার রেফারেন্স, যে কোন তথ্য ও পরিসংখ্যান। যেখানেই যা বলতেন স্বতঃ-উৎসারিত যেন কেউ রাশ ঠেলে দিত। একেবারে জীবন্ত ready reckoner.

২) তাঁর নিয়মানুবর্তিতা ও অসাধারণ সময়সচেতনতা। নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট পরে তাঁকে কেউ ক্লাস শুরু করতে দেখেনি (ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া যেত)। আবার যে সময়ের মধ্যে তাঁকে বক্তব্যে ইতি টানতে হবে তার এক মিনিট বেশিও বক্তব্যকে প্রলম্বিত করতে দেখা যায়নি। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে তাঁকে মাত্র কুড়ি মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল 'শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ' , এই শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য। ঠিক কুড়ি মিনিটের মাথায় তিনি যখন বলা শেষ করলেন তখন মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা হিসাবে বিস্মিত হয়ে দেখলাম এই দুই মহামানবের নিগূঢ় সম্পর্কের এমন কোন দিক নেই যা এই বক্তব্যে পরিবেশিত হয়নি। অনেক বক্তাকে দেখেছি কথার তোড়ে ভেসে যেতে, পরিমিতিবোধ হারিয়ে ফেলতে। অলক্ষ্যে পরিহিত পাঞ্জাবি খুব ধরে টেনেও বক্তাকে থামানো যাচ্ছে না। এই বিষয়ে বিশ্বনাথদার sense of timing ব্যতিক্রমী ও শিক্ষণীয়।

৩) আমৃত্যু মানুষটা ছিলেন এক দুর্দমনীয় living torch-bearer of Sri Aurobindo's light. গ্রীষ্মের উষর খরদাহ বা বাঁধভাঙা বৃষ্টিপাত, বন্যার রক্তচক্ষু , কোন কিছুই তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত করতে পারেনি। গোটা বঙ্গদেশ ও ওড়িষার প্রত্যন্ত প্রায় সব কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল ও তাদের সাদর আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে নিজের বয়স বা শরীর স্বাস্থ্যের কথা খুব বেশি ধর্তব্যের মধ্যে আনতেন না। ঝিকিরার শ্রীঅরবিন্দ ভবনের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আমরা কতিপয় মানুষ যারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলাম, ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হেতু নিজেরাই সংশয়াচ্ছন্ন এই দুর্যোগে দাদাকে সেই বেহালা থেকে এতটা পথ পেরিয়ে এখানে আনা ঠিক হবে কিনা। দুই দিন দুই রাত নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাতে সর্বত্র জলমগ্ন। দাদাকে ফোনে যোগাযোগ করে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি কি আসতে পারবেন এই পরিস্থিতিতে?' তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "তোমরা যদি অনুষ্ঠান cancel না কর, তাহলে আমাকে যেতেই হবে। আমি যাব। তোমরা আমার জন্য চিন্তা কোর না। আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব।"

এই হল মায়ের সৈনিক। রবীন্দ্রনাথের অজস্র লাইন তিনি কোট করতেন। তারমধ্যে যে দুটি পংক্তি প্রায়ই বলতেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ,

"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি
তোমার সেবার মহান দুঃখ তারে সহিবারে দাও ভকতি"

৪) শ্রীঅরবিন্দ-ভাষ্যকার হিসেবে যে জনপ্রিয়তা, যশ, খ্যাতি, পরিচিতি তিনি লাভ করেছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজে কতটা সচেতন, এসব প্রাকৃত 'টান' তাঁকে কতটা motivate করে তা একবার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল। মনে আছে, শিয়ালদহগামী শান্তিপুর লোকালে ছুটির দিনে এক কামরায় একদিন পাশাপাশি বসার সুযোগ এসেছিল। কিছুক্ষণ অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার পর জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "দাদা, ৩৫ বছর আগে আমি ব্যারাকপুর ভবনে 'আবাসিক' হয়ে থাকার সময় আপনাকে মাঝেমধ্যে পেতাম। তখন যে বিশ্বনাথ রায়কে চিনতাম, তিনি তো আজ একটা মহীরুহ, নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান, শ্রীঅরবিন্দচর্চার এক সার্বজনীন আশ্রয়। জানতে ইচ্ছে করে, আপনার ক্রমোত্তরণের পথে নাম-যশ-খ্যাতিলাভের স্থান কতটা?" উত্তরে যে কথাগুলি বলেছিলেন তা যেন এক আত্ম-উন্মোচন। "তুমি মনে রেখো আভাস, 'যশ-প্রতিষ্ঠা' যে 'শুকরীবিষ্ঠা' , এই নিশ্চিত অভিজ্ঞান ভিতর থেকে অর্জন করে তবেই এই কাজে নেমেছি। 'বক্তা' বিশ্বনাথ রায়কে ভবিষ্যৎ যে মনে রাখবে না, রাখা উচিৎ নয়, তা আমি জানি। যা চেয়েছি তা হল, তাঁদের জীবনদায়ী বাণী যেন অবিকৃতভাবে মানুষের কাছে যথাযথ পৌঁছে দিতে পারি। এটাই আমার স্বধর্ম, শুধু লক্ষ্য রাখতে হয় আমার জীবনচর্চা ও চর্যা যেন বিপরীতমুখী না হয়ে সমমুখী হয়।"

এই আমাদের বিশ্বনাথদা। তাঁকে মনে রাখতে কোন চেষ্টার দরকার হয় না। যা বলা হল তার চাইতে না বলা কথা অনেক বেশি রয়ে গেল। আমরা, যারা একটু-আধটু শ্রীঅরবিন্দচর্চা করি, তাদের সঙ্গে এতটাই তিনি সংলগ্ন ছিলেন অভিভাবকের মতো, আচার্যের মতো, যে কখনোই মনে হয় না দাদা নেই। এই চিরজাগ্রত আলোর পথযাত্রীকে আমার প্রণাম।

পাঠমন্দির ও বিশ্বনাথদা

অসিত ভট্টাচার্য
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা

সম্পাদক হিসেবে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের দায়িত্বভার গ্রহণের অনেক আগে থেকেই পাঠমন্দিরের সঙ্গে শ্রী বিশ্বনাথ রায়ের গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির আশ্রমের বাইরে প্রথম প্রকাশ্য শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ১৫ই আগষ্ট। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা উভয়েই তখন তাঁদের মর্তকায়ায় অধিষ্ঠিত। তাঁদের অনুমোদন ও আশীর্বাদ নিয়েই এই প্রাচীনতম কেন্দ্রটি কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের মহান শিক্ষা ও জীবনদর্শনকে বহির্বিশ্বে প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে। সেইদিক থেকে বিবেচনা করলে পরবর্তী সময়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া অজস্র শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রের মধ্যে পাঠমন্দির এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

এই বিষয়ে বিশ্বনাথদা এতটাই সচেতন ছিলেন যে, যে সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব পেলেন তখন তাঁর আজীবন লালিত আদর্শ — কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদ গ্রহণ না করা , থেকে সরে এলেন। আমরা জানি তাঁর নিজের হাতে গড়া হুগলী চুঁচুড়ার শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রের কোন প্রাতিষ্ঠানিক পদও তিনি গ্রহণ করেন নি।

তাঁর আর্দশবিরুদ্ধ হলেও বিশ্বনাথদা এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এক পরমব্রত হিসেবে। পাঠমন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিনে শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত আশ্রম থেকে একটি লেখা পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও কর্মধারার রূপরেখাটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এই বিশেষ লক্ষ্যকে রূপায়িত করার জন্য তাঁর দূরদৃষ্টি পাঠমন্দিরের কিছু বহিরাঙ্গিক পরিবর্তন প্রাথমিক প্রয়োজন বিবেচনা করেছিলেন। আমরা সকলেই জানি পাঠমন্দির যে বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটি এক অতি পুরাতন বাড়ি যা তাদের নিজস্ব নয়, তাই স্থানসংকুলানের জন্য সেখানে ইচ্ছামতন পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। তিনি অনুভব করলেন উপরের হলঘরটিকে কেবলমাত্র

লাইব্রেরি, রিডিং রুম, পাঠচর্চা ও আলোচনার ক্লাসরূপে ব্যবহার করতে হবে।

স্থানসংকুলানের সমস্যা সমাধানের পর বিশ্বনাথদা মন দিলেন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের দর্শন ও শিক্ষার নিবিড় চর্চা ও গবেষণার ওপর। এই উদ্দেশ্যকে সফল রূপদানের জন্য পাঠমন্দিরে স্থাপিত হল 'স্কুল অফ শ্রীঅরবিন্দ স্টাডিজ' এবং পাঠ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজন হল পাঠমন্দিরের লাইব্রেরিটির সম্প্রসারণ ও আধুনিকিকরণের। তিনি চেয়েছিলেন এ হবে এমন একটি গ্রন্থাগার যেখানে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা সম্বন্ধে সমস্ত গ্রন্থ অনায়াসেই উপলব্ধ হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থভাণ্ডার সৃষ্টিতে মন দিলেন এবং আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে cataloguing এর জন্য প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিলেন। এই সঙ্গে পাঠমন্দিরের পুস্তক প্রকাশন বিভাগকেও তিনি নতুন করে সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করলেন। অনেক পূর্বপ্রকাশিত বই (এখন দুষ্প্রাপ্য) পুনর্মুদ্রণ করলেন এবং নতুন বহু গ্রন্থের প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। বর্তমানে পাঠমন্দির প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ....৬৬ (ছেষট্টি)।

বিশ্বনাথদা শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের দায়িত্বভার গ্রহণের পরই দু'টি বিশেষ সাংগঠনিক দুর্বলতার দিকে বিশেষ নজর দেন। 'শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্তিকা' শ্রীঅরবিন্দ পথে প্রাচীনতম ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হত। কিন্তু পাঠমন্দিরের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক অক্ষমতার জন্য একসময়ে বছরে চারটি সংখ্যার বদলে দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হতে থাকে। বিশ্বনাথদা সম্পাদকীয় দায়িত্ব নেওয়ার পরে আবার সেটি ত্রৈমাসিকরূপে ফিরে যায় এবং সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে। শ্রীমায়ের রচনাবলী ৯টি খণ্ড প্রকাশের পর স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বনাথদার একান্ত প্রচেষ্টায় শ্রীমায়ের রচনাবলী ১৭ খণ্ড অনুবাদ সম্ভব হয়।

আমরা সকলেই বিশ্বনাথদার অসাধারণ বাগ্মীতার পরিচয় রাখি। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা এবং মনোজ্ঞ বক্তৃতার মাধ্যমে সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণের অনায়াস লাবণ্যে মুগ্ধ হননি এমন বাঙালী শ্রীঅরবিন্দ ভক্ত নেই বললেই চলে। কিন্তু সংগঠনের স্বার্থে তাঁকে লেখনীও ধারণ করতে হয়। পাঠমন্দির প্রকাশিত তাঁর বইগুলো হল —

১) শ্রীঅরবিন্দ বঙ্গপর্ব , কিছু কথা কিছু আশা

২) বক্তা শ্রীঅরবিন্দ

৩) কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের শেষ আবাস

৪) Sri Aurobindo's Last Abode in Kolkata

৫) দুর্গাস্তোত্র প্রসঙ্গে

৬) শ্রীঅরবিন্দ স্মরণিকা

৭) শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাত্রা
৮) শ্রীঅরবিন্দের কারাকাহিনী প্রসঙ্গে
৯) শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত আর্য প্রসঙ্গে
১০) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির (১৯৪১-২০১৬)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির শ্রীঅরবিন্দ-পথে প্রথম প্রকাশ্য কেন্দ্র শুধু নয় বাইরের জগতে এটি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের মুখপাত্র রূপেও আত্মপ্রকাশ করেছিল। বই পাড়ার একটি ভাড়া বাড়িতে এই কেন্দ্র শুরু হয় এবং শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ অনুসারে এর নাম ও ধাম না বদলে আজও একই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি কর্মরত। মা তাঁর পাদুকা ও মুকুট দানের অনন্য আশীর্বাদ এই কেন্দ্রকে দিয়েছেন। কিন্তু ভাড়াবাড়ি বলে শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্স এখানে আনা সম্ভব হয়নি কারণ ভাড়াবাড়িতে এবং বিশেষত মাটির সংযোগবিহীন ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্স দেওয়া আশ্রমের নীতিবিরুদ্ধ ছিল। ফলে ২০০২ সালে বিশ্বনাথদা শ্রীঅরবিন্দের পাদ-পীঠিকা (foot-stool) প্রার্থনা করে নিয়ে আসেন। কিন্তু মূলত তাঁরই চেষ্টায় শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ২০১৬ সালে শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্স পাঠমন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য দিতে রাজি হন।

বিশ্বনাথদার কর্মপদ্ধতির একটি বিশেষ দিক হল তিনি তাঁর পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করবার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের কর্মীদের তৈরী করতেন। এক্ষেত্রেও তরুণদের তিনি কর্মে জড়িয়ে দিয়ে উদ্বুদ্ধ করলেন পাঠমন্দিরের কাজে। আজ তিনি চলে যাবার পরেও পাঠমন্দির এর সুফল পাচ্ছে।

দ্বিজ থেকে যিনি ত্রিজ হয়েছিলেন

সুব্রত সেন
কোলকাতা

ভিতরে ভিতরে কবে তিনি দ্বিজ থেকে ত্রিজ হয়েছিলেন তা আমার জানা নেই। তাঁকে সে প্রশ্ন কোনোদিন করিনি, যদিও করার অবকাশ অনেক ছিল। যাক সে কথা। এখন কিছুটা পিছিয়ে প্রাক্কথন দিয়ে শুরু করা যাক।

আশির দশক, পরিচয় হলো 'মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ' নামক চলচ্চিত্রের পরিচালক, শ্রী দীপক গুপ্তের সাথে, যিনি নিজেও একজন শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী ও ভক্ত বলে জানলাম। তিনি আমাকে প্রস্তাব দিলেন একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করার, যার প্রকাশক তিনি হতে রাজী আছেন সে ক্ষেত্রে। পত্রিকাটির নাম ছিল, 'কালের আহ্বান'।

ঠিক সেই সময় পত্রিকার জন্য আরো নতুন লেখকের সন্ধান করছি। এবং একই সাথে অনেক শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রে প্রায়শই যাচ্ছি শ্রীঅরবিন্দের বিষয়ে আলোচনা করতে। এবং সেই কাজে কয়েকবার শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র চুঁচুড়াতে গিয়েছি। তখন কোনো একটি ভাড়া বাড়িতে কেন্দ্রটি ছিল। চুঁচুড়া কেন্দ্রে যাবার সুবাদে একদিন জানলাম যে এই অঞ্চলের বাসিন্দা কিন্তু তিনি সে সময় বেলডাঙা কলেজের বাংলার অধ্যাপক, শ্রী বিশ্বনাথ রায়, শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে সুবক্তা। কিন্তু জানলাম যে তিনি সে সময়ে কোনো লেখালেখি এই বিষয়ে করেন না। সময়টা সেই আশির দশক। এর পর তিনি একসময় স্থায়ীভাবে কোলকাতার এক কলেজে চলে এলেন অধ্যাপনার কাজে। তারপর কোনো এক দিন তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। সে সময় শ্রীঅরবিন্দ ভবনের (কলকাতা) জুনিয়র 'দীপক গুপ্তের উদ্যোগে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে ৩১ এবং ১লা জানুয়ারী যুব-শিবির দুদিনের জন্য হতো এবং বেশ কিছু বছর আমি এবং বিশ্বনাথ-দা নিয়মিত সেই শিবিরে উপস্থিত থাকতাম, যেখানে বহু যুবক বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অংশগ্রহণ করতো দুদিনের আবাসিক হয়ে। আমিও তাদের সাথে থাকতাম। সেই শুরু

হলো বিশ্বনাথ-দার সাথে একসাথে বহু কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া -- তার মধ্যে উল্লেখ্য আর একটি হলো--শ্রীঅরবিন্দ ভবনের মতো পুরুলিয়া কেন্দ্রেও বাৎসরিক শিবিরে গিয়ে রাত্রি যাপন করে অংশ নেওয়া, সেখানেও বিশ্বনাথ-দা যেতেন। এখন ঐ দু-জায়গায় সেই শিবির আর হয় না। পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ ভবন কলকাতায় তার নিয়মিত শ্রীঅরবিন্দের 'মা' গ্রন্থ অবলম্বনে সাপ্তাহিক ক্লাস শুরু হয়। প্রথম থেকেই আমি লেখালেখি, সম্পাদনা ও বক্তৃতা দেবার বাইরে মূলত কর্মী হয়ে সাংগঠনিক কাজ করার প্রতি সমান্তরালভাবে ইচ্ছুক ছিলাম। এবং তিনিও নিজে একজন সুবক্তা ও গবেষক হয়েও প্রতিষ্ঠান গড়ার সংগঠক ছিলেন। বহু বছর ধরে তিনি ও আমি একাধিক কেন্দ্রে গিয়েছি, থেকেছি একসাথে, নানা প্রসঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা করেছি--- সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ে। তিনি নিজেও বহুবার একান্তে এ প্রসঙ্গে কথা বলতেন। বহুদিন অধিক রাতে তাঁর ফোন আসতো, কোনো না কোনো বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। কোনো না কোনো প্রস্তাব নিয়েও তিনি বহুবার আলোচনা করতেন একান্তে। তাঁর সাথে call spade a spade-এর মতো করে কথা বলতাম নির্দ্বিধায়; কিন্তু কোনোদিন কোনোরকম সম্পর্কের মধ্যে দেওয়াল ওঠেনি আমাদের দুজনের; তার একটা বড় কারণ, তিনি সমালোচনা শুনতেন মনোযোগ দিয়ে; এমনকি কোনো একদিন একটি প্রসঙ্গে আমাকে বলেছেন, 'আমার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল'। বাংলার কেন্দ্রগুলির কাজকর্ম বিষয়ে পর্যালোচনামূলক কথাবার্তা হতো তাঁর সাথে, আমাকে বাংলায় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বলতেন, যার সাথে আমার দৃষ্টিভঙ্গি মিলে যেতে দেখেছি। তিনি একবার কেন্দ্রগুলির ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'সেই কেন্দ্র কোথায়, কোথায় সেই আদর্শ কেন্দ্র'? তিনি বলতেন সারা বাংলায় দু চারটি ছাড়া কোথায় সেই আদর্শ কেন্দ্র? নানা কারণে বাংলায় অধিকাংশ শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রগুলি সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি, যে পর্যায়ে গেলে জনমানসে তার একটা বিপুল প্রভাব থাকার কথা। তার কারণ একাধিক। সে বিষয়ে তাঁর সাথে আমি বিশ্লেষণক্রমে একমত ছিলাম সর্বতোভাবে। তার মধ্যে অন্যতম প্রস্তুতির অভাবগুলি হলো—

- মানসজগতে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে স্বচ্ছ বুদ্ধির স্তরে, তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে লেখা নিয়ে গভীর চর্চা ও মননের পাশাপাশি আধুনিক পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগজনিত উদ্ভাবনী দৃষ্টান্তমূলক ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ভক্ত-কর্মীদের মধ্যে একটা প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেই স্তরের প্রস্তুতি না থাকা,
- শ্রীঅরবিন্দ ও মা যে নতুন এক জীবন শৈলী দিয়েছেন, তার জন্য কেন্দ্রগুলিকে মাধ্যম করে একটা নিয়মিত দৃষ্টান্তমূলক প্রয়োগের প্রাথমিক অনুশীলন-পর্বর জন্য তেমন কোনো কর্মসূচি বা কর্মশালার করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না থাকা, এবং

- সমসাময়িক পরিস্থিতিতে জীবনের বিভিন্ন সমস্যাসংকুল বিষয়ের সামনে শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের শিক্ষার নিরিখে তেমন কোনো দিশা ভিত্তিক বৈচিত্রময় কর্মের সুযোগ না থাকা ইত্যাদি।

তিনিও এ বিষয়ে খুব ভাবতেন এবং ভিতরে ভিতরে একটা কিছু তাগিদ অনুভব করতেন, যা পরে বুঝেছি এবং এর প্রতিকারে কিছু একটা হোক তা চাইতেন। সে প্রসঙ্গে আসছি পরে।

একটা বিষয়ে তিনি আমাদের এই বাংলায় বক্তা ও কর্মীবর্গের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন বলতেই হবে। তিনি নিজেকে সব পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারতেন এবং যুবকদের সাথে তাঁর কোনো 'জেনারেশন গ্যাপ' ছিল না। এমনকি, এই কাজে তার মতো পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বিরল ছিল এখানে। মূলত ছিলেন তিনি একজন সুবক্তা, শ্রীঅরবিন্দ সাহিত্যে তন্নিষ্ঠ পাঠক, গবেষক এবং প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে একজন অভিজ্ঞ সংগঠক। তাকে একাধিকবার বাংলার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বলেছিলাম যে তিনি ওড়িষ্যার প্রপত্তিজীর মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে, গ্রামে গঞ্জে ও শহরতলিতে সংগঠন করার বিষয়ে নিজেকে নিযুক্ত করেন নি। তার উত্তরে তিনি এ বিষয়ে তাঁর অক্ষমতা অকপটে স্বীকার করে বলেছিলেন, 'ওটা আমার কাজের ধারা নয়'। তাকে বলেছিলাম যে, ওড়িষ্যার প্রপত্তিজি হতে পারলেন না। তার উত্তরে সেই একই কথা, 'আমার ওটা হবার নয়'। ঠিক সেই কারণেই তাঁর একটা গ্রহণ যোগ্যতা থাকা সত্বেও এই সমগ্র বাংলাতে, 'প্যান বেঙ্গল' সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নিতে চান নি।

এ বিষয়ে বাংলার কেন্দ্রগুলির প্রায় বক্তব্য ছিল যে তারা সকলেই স্বনির্ভর, 'অটোনোমাস'। তাই বোধহয় 'প্যান বেঙ্গল' স্তরে কেন্দ্রগুলির স্বতন্ত্রতা থাকা সত্বেও একটা সম্মিলিত উদ্যোগ নেবার ক্ষেত্রে একটা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার জন্য সুচিন্তিত ও সংগঠিত ব্যবস্থার বিষয়ে সেই কবে থেকেই কেন্দ্রগুলির মধ্যে আন্তরিকভাবে অনাগ্রহ দেখা গেছে। অথচ ওড়িষ্যার কেন্দ্রগুলিও এখানকার মতো সকলেই 'অটোনোমাস' কিন্তু তারা একইসাথে ঐক্যবদ্ধ একটা 'প্যান ওড়িষ্যা' প্লাটফর্ম গড়ে তুলেছে এবং নানা কর্মকাণ্ডের জন্য আবার নানা 'প্যান ওড়িষ্যা' বিভাগ গড়ে তুলে কাজ করে চলেছে।

কিন্তু শেষের দিকে, ২০০৬ সালে, শ্রীঅরবিন্দের বঙ্গপর্বর শতবর্ষ (দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীঅরবিন্দ নিজের ভূমিকা পালনের জন্য বরোদা থেকে বাংলায় ১৯০৬ সালে চলে এসেছিলেন পাকাপাকি) কেন্দ্র করে তিনি জীবনের শেষের পর্বে বোধহয় বুঝেছিলেন যে ওড়িষ্যার মতো একটা 'প্যান বেঙ্গল' সংগঠন করা খুব জরুরি।

ঐ সময়ে একদিন হঠাৎ আমাকে ফোনে জানালেন যে তিনি একান্তে কিছু সময় নিয়ে জরুরি কথা বলতে চান। এবং এরপর একদিন তাঁর বেহালার ফ্ল্যাটে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। বিষয় ছিল যে বাংলায় শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রগুলির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কোনো 'প্যান বেঙ্গল' কাজ করার ক্ষেত্র তৈরী হয়নি এতোদিনেও, তাই সে কাজ শুরু করা দরকার, এবং সে কাজের জন্য শ্রীমা সত্তরের দশকে ভারতের যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে একটি সংগঠনকে আশীর্বাদপূত করে কাজ করতে বলেছিলেন, এবং যার নাম তিনি দিয়েছিলেন, 'শ্রীঅরবিন্দস্ অ্যাকশন'— তাকে বাংলার এই পরিস্থিতিতে আবার পুনরুজ্জীবিত করে কাজ শুরু করা। এবং সেই প্রেক্ষিতে দীর্ঘ আলোচনার পর সেখানে তিনি বলেছিলেন এই কাজে আমাকে মুখ্য ভূমিকা নেবার জন্য। আমি তার উত্তরে বলেছিলাম যে যেহেতু কতগুলি কাজের সাথে ইতিমধ্যেই যুক্ত তাই একটু ভেবে আমার সিদ্ধান্ত তাঁকে জানাবো। তিনি এরপর বললেন যে আমি যদি এ কাজে রাজি না হই, তবে তাঁর সাথে আমার এই পর্বের আলোচনার কথা কেউ যেন ভবিষ্যতে না জানতে পারেন এবং বিষয়টির ইতি তবে এখানেই যেন হয়।

এর কয়েকদিন পর ভেবে তাঁকে আমার সম্মতির কথা জানাই। যথারীতি তারপর একাধিকবার একান্তে দুজনের মধ্যে এই কাজের ধারা কি হবে এবং তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার বিষয়ে কথা হয়েছে। অবশেষে আমার সাথে আলোচনা করে, আমার সম্মতি নিয়ে তিনি কয়েকটি নাম প্রস্তাব করেন, যারা এই নব পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে আসবেন। আমি এ বিষয়ে আমার সম্মতি দিই।

এরপর যথারীতি একটি ট্রাস্ট গঠিত হয়— 'শ্রীঅরবিন্দস্ অ্যাকশন ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাস্ট'। এবং তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী এই ট্রাস্টের সদস্যদের নিয়ে আমি কাজ করতে থাকি। যথারীতি তিনি ওড়িষ্যার মডেলে নানা বিভাগ খুলতে প্রস্তাব দেন এবং সেইমতো একাধিক বিভাগ তার কাজ শুরু করে এবং প্রতিটি বিভাগে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সেই কাজের পরিচালনা করতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। এবং বিভিন্ন জেলায় সেই কাজের 'নোডাল পয়েন্ট' মূলত সেই অঞ্চলের কিছু ইচ্ছুক কেন্দ্রের মাধ্যমে চলতে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-- পাঠচক্র, প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার পাঠক সংগ্রহ ও তার বন্টন, শিশু শিক্ষার কর্মশালা করা সেইসব অঞ্চলে, ছোট ছোট প্রকাশনা এবং তা বিক্রি করা, কিছু অঞ্চলে জেলা সম্মেলন করা, ইত্যাদি। উল্লেখ্য এই যে, মাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত ১৪ বছর একটানা প্রকাশিত হয়। বহু বিদ্যালয় শিশু শিক্ষার কর্মশালায় যোগদান করতে থাকে। এই বিভাজিত দায়িত্ব বন্টনের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত ট্রাস্ট গ্রহণ করে— আমাকে ব্যতিক্রমীভাবে একই সাথে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক এবং পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এমনকি, পরবর্তী কালে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বও দেওয়া হয়। নিজের বিষয়ে

এতো কথা বলা হলো এই কারণে যে এই দায়িত্ব বণ্টন বিষয়ে শ্রী বিশ্বনাথ রায়ের মতামত সেই সময় গ্রহণ যোগ্য হয় সকলের সম্মতিতেই। উপরোক্ত সব বিভাগের সব কাজেই বিভাগীয় প্রধানরা ট্রাস্টের সদস্যদের সম্পূর্ণ সহমতের ভিত্তিতেই কাজ করতে থাকেন এবং সব বিষয়েই সকলের সম্মতি ছিল, একটি মাত্র বিষয়ে সকলের সম্মতির ব্যতিক্রম ঘটে, কিন্তু সংখ্যাধিক্যের মতের ভিত্তিতেই একটি বিভাগের কাজ পরবর্তী কালে বিশেষ ধারায় চলতে থাকে।

কিন্তু বাংলা সেই বাংলাতেই আছে দেখছি। শ্রীঅরবিন্দের সেই কবেকার কথার সত্যতা আজও একই রকম আছে। বাঙালি কোনো সমষ্টিগত কাজ একসাথে বেশিদিন করতে পারে না, তার আবেগ ক্ষণস্থায়ী, চিন্তার গভীরতা কম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে ভাবে, কথা বেশি বলে, কাজ কম, আয়েসী ও কর্মভীরু। এই পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দেখা যায় বৈকি। ফলে 'শ্রীঅরবিন্দস্ অ্যাকশন' তার কাজ নতুন করে বঙ্গ পর্বে যে শুরু করেছিল তা প্রায় ১৪ বছর চলার পর অবশেষে এখন নির্জীবতায় পর্যবসিত। এই পরিস্থিতি বিশ্বনাথ-দা দেখেছেন, তাঁর চলে যাবার অনেক আগেই। তাঁকে কেন্দ্র করে যে একটা অংশ অনুপ্রাণিত হয়েছিল তাদের মধ্যে এই কাজ করার জন্য সেই পর্যায়ের শক্ত সমর্থ, উদ্দীপিত প্রাণ তিনি নিজেও খুঁজে পান নি। তিনি নিজে ওড়িষ্যার প্রপত্তিজীর মতো এই দিকে গুরুত্ব দিয়ে সময় দিতে পারেন নি, তাঁর বিভিন্ন কেন্দ্রে বক্তৃতা ও লেখালেখির ব্যস্ততার কারণে। এবং তিনি সেই পর্যায়ে সচেষ্টও ছিলেন না, সে কথা তিনি আমাকে খোলাখুলি বলেছেন। তাঁর কাজ ছিল শ্রীঅরবিন্দ মায়ের শিক্ষা বিষয়ে পরিচিতির একটা ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজ। ফলে তাঁর কাছাকাছি যে যুব গোষ্ঠী থাকতো তাদের মধ্যেও এই ধরণের গতিশীল 'প্যান বেঙ্গল' সংগঠনের পক্ষ থেকে কাজ করার জন্য তেমন কোনো আধার দেখতে পান নি। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে সাধারণভাবে তাদের অবগত করেছেন অনেকবার তা দেখেছি; এমনকি তারাও এই সংগঠনের সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় নিয়মিত কিছুদিন উপস্থিত থেকেছে এবং এই সংগঠনের যুব বিভাগের হয়ে কিছু অনুষ্ঠান করেছে কোথাও কোথাও। কিন্তু এই কর্মধারার কাজকে প্রসারিত করে যুবকদের মধ্যে সংগঠন তৈরী করার জন্য নিয়মিত দৃঢ় প্রচেষ্টা, অত্যন্তিকভাবে লেগে থাকার মতো হয়তো তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, প্রবণতা ও ভিত্তি ছিল না, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘকালীন আত্ম-প্রস্তুতি নেবার মতো সম্মতিও হয়তো ছিল না।

এই পরিস্থিতি তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন, কিছুকাল এই সংগঠনের কাজ চলার পর থেকেই। এবং এরকম এক প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছেন, 'অল্প বয়সী তরুণদের সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে একটু সমস্যা এলেই তারা কি রকম বিচলিত ও ব্যস্ত হয়ে যায়, দেখেছো কি'? কি আর করা যাবে।

শেষের দিকে তিনি আমাকে বলতেন এই পরিস্থিতির বিষয়ে, এবং চেষ্টা কিছু করলেও হয়তো তেমন কোনো সাড়া পান নি বলেই তাঁর শেষের দিকে একটা কোথাও নীরব হতাশা দেখেছি আমি।

এতৎসত্বেত্ত বলতে হবে, তাঁর মতো নিষ্ঠা, পরিশ্রম, আন্তরিকতা ও প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া ছিল এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আমাদের এই বলয়ে। এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বলি, আমি নিজেও এক সময়ে 'শ্রীঅরবিন্দস্ অ্যাকশন'-এর এই গুরু দায়িত্ব থেকে সানন্দে অব্যাহতি নিয়েছিলাম সকল সহকর্মীদের বুঝিয়ে, যাতে এমন গুরু দায়িত্বের জন্য অপেক্ষাকৃত যোগ্য নেতৃত্ব এসে হাল ধরেন। কিন্তু তা আর হয়নি, এ পর্যন্ত যা দেখলাম। তবে খাতায় কলমে, পরবর্তীকালে তাঁরই বিশেষ অনুরোধে এই প্রতিষ্ঠানের অছি পরিষদের সদস্য হয়ে আবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছি।

এখানে তাঁর বিষয়ে কাজকে কেন্দ্র করে সরাসরি আমার যে সম্পর্ক ছিল তা বলার চেষ্টা করলাম অত্যন্ত সংক্ষেপেই। আশাকরি তাঁর অন্য অনেক দিক নিয়ে অনেকেই অনেক বিষয় লিখবেন এই স্মারক গ্রন্থে।

তিনি চলে গেছেন, নিজের কাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখে, যার সাক্ষী শ্রীঅরবিন্দ বলয়ের প্রায় সকলেই। তাঁর অপূর্ণ আশা হয়তো আগামীদিনে নতুন প্রজন্ম বাংলায় দেখতে পাবে।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় স্মরণে

অনুরাগ বন্দ্যোপাধ্যায়
কোলকাতা

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়কে এক কথায় বর্ণিত করা যায় না। কোনো বিশেষ বিশেষণেও তাঁকে বিশেষায়িত করা কঠিন। একধারে তিনি ছিলেন সুবক্তা, সুলেখক, তন্ময় গবেষক এবং নিপুণ ব্যবস্থাপক, বরং বলা শ্রেয়, পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ভাব-আন্দোলনের পুরোধা বিশেষ। অপরদিকে তিনি ছিলেন স্নেহময় অভিভাবকের ন্যায় যাঁর প্রেরণা, উৎসাহ ও নানাবিধ সহায়তার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠে বহু শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত কেন্দ্রগুলিতে তিনি কোনো আধিকারিক-পদ গ্রহণ করেননি কিন্তু কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবৃন্দ তাঁকে পেয়েছেন উপদেষ্টা, পৃষ্ঠপোষক ও সর্বোপরি বৃহৎ বটবৃক্ষ তুল্য অগ্রজ রূপে। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলয়ের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশ্বনাথবাবুর অবদান শুধু উল্লেখযোগ্য নয়, অতুলনীয়ও বটে। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, আন্তরিকতার আকর্ষণে এবং শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি এবং তাঁদের জীবন, কর্ম ও সাধনার বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি হয়ে উঠেছিলেন বহু প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ।

একথা সর্বজনবিদিত যে বিশ্বনাথবাবু ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতায় থাকত অতুলনীয় সম্মোহনী শক্তি যার দরুন সংশয়ী ও অবিশ্বাসীও হয়ে উঠত পরম নিষ্ঠাবান শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমা অনুরাগী। তাঁর মনোজ্ঞ বক্তৃতামালার মাধ্যমে কত ব্যক্তি পূর্ণযোগের পথে এসেছেন এবং শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমাকে আপন জীবনের ধ্রুবতারকারূপে গ্রহণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। শহরের অভিজাত প্রেক্ষাগৃহ থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত স্বল্পায়তন বা সদ্য প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের কক্ষ সর্বত্র তিনি ছুটে যেতেন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বাণী ও দর্শনের প্রচার কর্মে। সর্বসাধারণের কাছে তাঁদের বাণী পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত 'সাধনা' সহ

শ্রীঅরবিন্দ-রচিত 'দ্য মাদার', 'দ্য লাইফ ডিভাইন' এবং 'সাবিত্রী'-র উপর বিশ্বনাথবাবুর ক্লাসগুলিতে যোগ দিতে দূর-দূরান্ত থেকে শ্রোতার পদার্পণ ঘটত।

বিশ্বনাথবাবুকে আমরা পেয়েছি গবেষকরূপেও। শ্রীঅরবিন্দের বঙ্গপর্ব নিয়ে তাঁর গবেষণাকর্ম চিরস্মরণীয়। 'ত্রিজ রায়' ছদ্মনামে তিনি পাঠকসমাজ ও শ্রীঅরবিন্দ-ভক্তমন্ডলীকে উপহার দিয়েছেন 'বক্তা শ্রীঅরবিন্দ', 'শ্রীঅরবিন্দের বঙ্গপর্ব কিছু কথা-কিছু আশা', 'শ্রীঅরবিন্দ ও হুগলী', 'কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের শেষ আবাস', 'শ্রীঅরবিন্দ ও চন্দননগর', 'শ্রীঅরবিন্দ ও বারুইপুর অভিভাষণ', 'শ্রীঅরবিন্দের পন্ডিচেরি যাত্রা', 'শ্রীঅরবিন্দের কারাকাহিনী প্রসঙ্গে', 'দুর্গাস্তোত্র প্রসঙ্গে', এবং 'শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত আর্য প্রসঙ্গে' নামক গ্রন্থগুলি যার মূল্য শ্রীঅরবিন্দ-চর্চা ও শ্রীঅরবিন্দ-কেন্দ্রিক গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিসীম। মৌলিক গবেষণা-সহ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার আলোকে গ্রন্থগুলি উদ্ভাসিত।

সুতরাং বলা যায়, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম, তিনটি যোগপথেই বিশ্বনাথবাবু ছিলেন ভাস্বর। এখানেই তাঁর অনন্যতা!

বিশ্বনাথবাবুকে প্রথম দেখি ছাত্রাবস্থায় লক্ষ্মী হাউসে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে। পরবর্তীকালে, শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমাকে নিয়ে গবেষণা করার সুবাদে তাঁর স্নেহ লাভ করেছি। আমাদের প্রতিষ্ঠান ওভারম্যান ফাউন্ডেশন দ্বারা আয়োজিত কিছু অনুষ্ঠানেও তাঁকে পেয়েছি উদ্বোধক ও বক্তারূপে। মনে পড়ে, ওভারম্যান ফাউন্ডেশনের অন্তর্ভুক্ত শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতিমন্দির-এ সংরক্ষিত শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রীমায়ের ব্যবহৃত সামগ্রীগুলি দেখে বিশ্বনাথবাবুর উৎসাহ। স্বগৃহে ফিরে গিয়ে রাতে টেলিফোনে ভূয়সী প্রশংসার পর আমাকে বলেছিলেন 'এক ছাদের তলায় শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের এত জিনিষ এর আগে দেখিনি!' আমার নাম দিয়েছিলেন 'সংগ্রাহক'। কখনো-কখনো তাঁর ফোন পেতাম শ্রীঅরবিন্দ অথবা শ্রীমা-সংক্রান্ত কোনো তথ্যের সত্যতা জানার জন্য। ওঁর প্রাণশক্তি মুগ্ধ করত। বিস্মিত হতাম ওঁর স্মৃতিশক্তি দেখে।

২০২৩-এর গোড়া বিশ্বনাথবাবুর সাথে দেখা হওয়ার সময় খেয়াল করি, উনি আগের চেয়ে বেশ রোগা হয়ে গিয়েছেন। ভেবেছিলাম, ওজন-হ্রাস বয়সজনিত কারণে ঘটেছে। গত এপ্রিল মাসে বিশ্বনাথবাবু একদিনের জন্য উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন একটি সম্মেলনে যোগদান করতে। ওঁর সাথে গিয়েছিলেন ওঁর বিশেষ স্নেহধন্য ও আমার ভ্রাতৃপ্রতিম শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শৌভিকের কাছে শুনেছিলাম, বিশ্বনাথবাবুর শরীর বেশ দুর্বল, হাঁটতে-চলতে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছে। কলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারি পরীক্ষার পর জানা যায়, তিনি ব্লাড-ক্যান্সারে আক্রান্ত। নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন জানতে পেরে নিউ আলিপুর নিবাসী শ্রীমতি রমলা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আমি বিশ্বনাথবাবুর বেহালার বাসভবনে যাই ১৫ই মে, সোমবার, বিকেলবেলায়। দেখলাম শরীর জরাক্রান্ত ও ক্লান্ত হলেও মন তাঁর সতেজ, চিন্তাশক্তি স্পষ্ট। কথাচ্ছলে তিনি জানান, কিভাবে কেন্দ্র সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজ থেকে ক্রমে বক্তা ও লেখকরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেদিনের একটি কথা আজো কানে বাজে। বিশ্বনাথবাবু বলেছিলেন 'ডাক্তার বলছেন আমার শরীর যতটা খারাপ, আমার কিন্তু ততটা খারাপ লাগছে না।' গাত্রোত্থান করার সময় বলেছিলাম, আবার দেখা করতে আসব।

হ্যাঁ, দেখা করতে গিয়েছিলাম ঠিকই মাত্র আটদিন পরেই যখন ফুল-মালায় সজ্জিত হয়ে বিশ্বনাথবাবুর নশ্বর দেহ কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবনে নিয়ে আসা হয়। তার আগের দিন, অর্থাৎ সোমবার ২২শে মে, ২০২৩, রাত্রি ৯-১০ মিনিটে তিনি পাড়ি দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দলোকে। তাঁর পার্থিব দেহখানির সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি বলছেন, তাঁর প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়ঃ

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি
সকল খেলায় করব খেলা এই আমি—
নতুন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

তাঁর দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি হলো : এমন সার্থক জীবন সত্যিই দুর্লভ। মৃত্যু তাঁকে শারীরিকরূপে অনুপস্থিত করেছে মাত্র। কিন্তু যে সুবিশাল কর্মকাণ্ড তিনি রেখে গিয়েছেন, তার দরুন তিনি অমর হয়ে থাকবেন শ্রীঅরবিন্দ-চর্চার জগতে এবং আমাদের হৃদয়ে। কালের স্রোত তাঁর কীর্তির মহিমাকে ম্লান করতে পারবে না, কখনোই না।

['শৃণ্বন্তু' থেকে পুনর্মুদ্রিত]

Biswanath Roy :
A Scholar of Unparalleled Devotion

Dr. V. Ananda Reddy
SACAR, Pondicherry

Biswanath-da, was an unforgettable personality. I had the privilege to share with him many a seminar-platform—be it in Kolkata or Cuttack. He spoke with a thunderous voice that needed no mike; he used a language, Bengali or English that need no poetics. He roared about Sri Aurobindo's personality that needed no authentication: his devotion for his Lord poured through every syllable and adjective. What clarity of thought, what poetic language of power and brilliance! A scholar nonpareil who took The Life Divine across the corridors of universities and famous platforms of erudition in Bengal. It was not dry intellect that spoke in him—it was the voice full of emotion that bowed down at the feet of the Mother and Sri Aurobindo. He was indeed a scholar of unparalleled devotion.

In the realm of Bengali literature, the name of Srijut Biswanath Roy shines brightly, leaving an indelible mark on the intellectual landscape of our times. As a profound scholar and a deep connoisseur of Sri Aurobindo's thought, Roy's life was a sheer example of the transformative power of knowledge and dedication to higher life. His passing leaves a void that can never be filled. His legacy will continue to inspire generations of scholars, and devotees of Sri Aurobindo and the Mother.

Biswanath Roy's academic pursuits were marked by an unwavering passion for Bengali literature, which he studied with great

fervor and dedication. His profound understanding of the subject was evident in his meticulous research and insightful analyses, which shed new light on the works of renowned Bengali authors such as Rabindranath Tagore. However, it was his contact with the philosophy of Sri Aurobindo that truly transformed his life's direction. Roy's fascination with Sri Aurobindo's thought was not merely intellectual; it was a deeply personal and spiritual journey that reflected his own quest for spiritual realisation.

Biswanath-da's writings on Sri Aurobindo's philosophy and poetry are a masterclass in clarity, depth and vision. His ability to distill complex ideas into lucid prose made the Master's teachings accessible to a wider audience, across Bengal earning him a reputation as one of the foremost authorities on the subject.

What sets Biswanath Roy apart from other scholars is his embodiment of the principles he wrote about. His life was an example of the power of spiritual living, marked by simplicity, humility, and a deep sense of compassion. He walked the talk as is said these days, integrating the wisdom of Sri Aurobindo into his daily life, inspiring countless individuals who had the privilege of knowing him closely.

As we recollect this remarkable individual, we remember his contributions to the world of Sri Aurobindo's thought, as depicted in Sri Aurobindo's magnum opus *The Life Divine*. May his life and work continue to inspire future generations of scholars, spiritual seekers, and anyone drawn to the profound vision of Sri Aurobindo.

বিশ্বনাথ রায় স্মরণে

এলিজাবেথ চক্রবর্তী
কলকাতা

নিখুঁত তোমার অনুসরণ
সূর্যালোকিত পথে!
কর্মজীবন পূর্ণ তোমার
পূর্ণ-যোগের সাথে।
ধন্য তোমার জনম নেওয়া
পূর্ণ তুমি দ্বিজ
একই অঙ্গে তিনটি জনম
তাই তো হলে ত্রিজ!
আজকে তুমি মায়ের কাছে
মায়ের বাহু-পাশে
আসবে আবার মায়ের কাজে
সহজ-হাসি হেসে!

আমাদের সবার প্রিয় বিশ্বনাথদা

সমরেশ চট্টোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, যিনি আমার ও অনেকের কাছে বিশ্বনাথবাবু এবং আরো বহুজনের কাছে বিশ্বনাথদা। ২০২৩ সালের ২২ মে তাঁর দেহাবসানের পরে আমরা অনেকে মনে করি তিনি সর্বদা আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান। শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমা বলয়ে তিনি সর্বদা আমাদের কাজের সঙ্গী ছিলেন। উত্তরপাড়া দু'বার শ্রীঅরবিন্দের পদধূলিতে ধন্য। প্রথমবার ১৯০৮ সালের ৫ই এপ্রিল বিপিনচন্দ্র পালের কারামুক্তি উপলক্ষ্যে এবং দ্বিতীয়বার ১৯০৯ সালের ৩০ মে তাঁর নিজের কারামুক্তির পর।

১৯৭২ সালে সমর বসুর সম্পাদনায় উত্তরপাড়ায় শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী সমিতি সারা বছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। ১৯৭৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী কলকাতা শ্রীঅরবিন্দ ভবনে সংস্থাপিত হবার লক্ষ্যে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহস্মারক (Relics) এখানে আসে। সেদিন উত্তরপাড়া উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বনাথবাবুর সেই প্রথম এখানে আসা। আমি তখন একজন স্বেচ্ছাসেবক মাত্র, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। এরপর, উত্তরপাড়ার লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করে শ্রীঅরবিন্দ-চর্চা বাড়তে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের জন্য উত্তরপাড়া শ্রীঅরবিন্দ পরিষদ শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতিবিজড়িত এই লাইব্রেরী-ভবনটিকে খুবই বেদনার সঙ্গে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার আগে ১৯৯৯ সালের ৩০ মে সারাদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেখানে মূল বক্তা ছিলেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর ভাষণ উপস্থিত ভক্তদের হৃদয় ভরিয়ে যেন সম্মোহিত করে রাখে কিছুক্ষণ। কোন সমস্যাই সমস্যা নয় যদি হৃদয়ে শ্রীঅরবিন্দ বিরাজমান থাকেন। পাশেই মন্দিরবাটী ঘাটে পরিষদের বর্তমান সভাপতি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি 'সরসী কুঞ্জ'-এর একতলার তিনটি ঘর টেলিফোন সমেত পেয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হল। বিশ্বনাথবাবু প্রতিমাসে একবার

এসে ক্লাস করতে লাগলেন। সবায়ের মত আমিও তাঁকে বিশ্বনাথবাবু বলা শুরু করি। তিনি আমাকে সমরেশদা বলে ডাকেন, আমি বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও। আমার নাম ধরে ডাকার অনুরোধ হেসে উড়িয়ে দেন। বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর হিসাবে তিনি আমাকে স্নেহটা বোধহয় একটু বেশিই করতেন। ২০০৭ সালে একদিন সন্ধ্যাবেলার এক অনুষ্ঠানের পর চুপি চুপি আমাকে বলেন, ‘‘সমরেশদা, উত্তরপাড়ার বাইরের শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রগুলির জিজ্ঞাসা, আর দু’বছর পরে শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপাড়া অভিভাষণের শতবার্ষিকীর জন্য পরিষদ কি প্রস্তুতি নিচ্ছে? এখনই তো কাজ শুরু করা দরকার, কাজে নেমে পড়ুন।’’ তাঁর এই কথাগুলি বিদ্যুৎ চমকের মত আমাকে স্পর্শ করল। সেদিন সভাশেষে এই কথাগুলি সকলকে বলতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ‘শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপাড়া অভিভাষণ শতবার্ষিকী কমিটি’ গঠন করে দ্রুত কাজ শুরু হল। এই উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিষদের সংযোগ বাড়ল। ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ পরিষদ বর্তমান বাড়িটির মালিকানা পায়। জমিটি বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতার ছিল। যেদিন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী শ্রীঅরবিন্দের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন সেদিন বিশ্বনাথবাবু খুবই আনন্দিত হন। তিনিই উদ্যোগী হয়ে কথা বলে পণ্ডিচেরী থেকে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহস্মারক (Relics) উত্তরপাড়ায় আনার ব্যবস্থা করেন এবং নিজেও পরিষদের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীদেহস্মারক নিয়ে আসেন এবং নিজ হাতে সৌধে সংস্থাপন করেন। সৌধের পাশে তিনি একটি বকুলচারা রোপণ করেন ঐদিন, যা আজ এক মহীরুহ হয়ে শ্রীঅরবিন্দ-স্মারক সৌধকে ছায়া দান করছে। ২০০৯ সালের ৩০ মে, শ্রীঅরবিন্দের ‘উত্তরপাড়া অভিভাষণে’র শতবার্ষিক দিবসেই তাঁর দিব্য দেহস্মারক সৌধে সংস্থাপিত হয়। এই দিনটিতে শ্রীঅরবিন্দ সদনেরও উদ্বোধন হল। এরপর হুগলী কেন্দ্রে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহস্মারক সংস্থাপনের রজত জয়ন্তী বর্ষে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে সকলে মিলে যাওয়া হয়। এই যাত্রায় তিনি সঙ্গী থাকায় পুরোনো দিনের অনেক অজানা কথা জানার সৌভাগ্য হয়। এর কয়েক বছর বাদে পরিষদে স্থায়ীভাবে শ্রীমায়ের পাদুকা সংরক্ষণের আবেদন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অনুমোদন পায়। বিশ্বনাথবাবু স্বহস্তে শ্রীমায়ের ঘরে এই পাদুকা স্থাপন করেন। মোটকথা শ্রীঅরবিন্দ পরিষদে তিনি এভাবেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন। ১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ যখন উত্তরপাড়ায় আসেন, উত্তরপাড়া স্টেশন থেকে সাধারণ গ্রন্থাগারে আসার পথে পূর্বব্যবস্থামত অমরেন্দ্রনাথের জ্ঞাতিকাকা সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বসে জলযোগ করেন ও বিশ্রাম নেন। তাঁর তখনকার ব্যবহৃত চেয়ারটি এতদিন ঐ বাড়িতে সংরক্ষিত ছিল। তাঁরা সেটি পরিষদকে সংরক্ষণের জন্য দিতে চাইলে সেটিকে নিয়ে আসার সময় কর্মীদের সঙ্গে বিশ্বনাথবাবুও একজন যুবকের উৎসাহ নিয়ে সেই বাড়ি থেকে চেয়ারটি নিয়ে এসে সমবেত ধ্যানের শেষে শ্রীঅরবিন্দের ঘরে প্রতিষ্ঠা করেন।

মাসের প্রথম সপ্তাহের রবিবারটিতে তিনি সকাল ৯টার মধ্যে পরিষদে এসে বহু ভক্তসমাগমে তাঁর শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে নিয়ে চর্চা শুরু করেন। ঘন্টাখানেক ধরে উপস্থিত ভক্তেরা আনন্দের সঙ্গে তা হৃদয়ঙ্গম করেন। তাঁদের মধ্যে আমিও একজন। আমরা অপেক্ষা করি পরের মাসের প্রথম রবিবারের জন্য একটা আনন্দের রেশ নিয়ে। আমি একসময় হঠাৎ অসুস্থ্ হয়ে পড়ি। বিশ্বনাথবাবুর ক্লাসে যাওয়া সম্ভব হয় না। অথচ পরিষদের পশ্চিমদিকেই আমার বাস। বিশ্বনাথবাবু একদিন আমাকে দেখতে আসায় আমি তাঁকে অনুরোধ করি, ‘আমার বাঁচার ইচ্ছা চলে গেছে, আপনি আমাকে তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।’ তিনি আমাকে শুধু বললেন, ‘আমরা আমাদের সব সমস্যা শ্রীমাকে জানাই। আপনিও তাঁকে জানান, ধরে থাকুন।’ তাঁর কথা পালন করে আমি রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে গেলাম কিছুদিন পর। প্রভাতের ফোনে তাঁর চলে যাবার খবর পেয়ে খুবই মর্মাহত হলাম। তাঁকে নিয়ে শববাহী যানটি তাঁর প্রিয় উত্তরপাড়া লাইব্রেরী মাঠে এলে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালাম।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মিতা চক্রবর্তী
কোলকাতা

শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমায়ের শ্রীচরণ বন্দনা করে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি তাঁদের একান্ত ভক্ত এবং আমাদের অতি প্রিয় বিশ্বনাথ রায়ের উদ্দেশ্যে। বিশ্বনাথদাকে আমি যেভাবে দেখেছি তারই কিছু বিবরণ দিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে প্রতিবেদন শুরু করি।

বিশ্বনাথদা ছিলেন সুবক্তা। তাঁর বক্তব্যে পাণ্ডিত্য দেখানোর প্রয়াস ছিল না, ছিল মর্মভেদী দৃষ্টিভঙ্গি যা দিয়ে তিনি শ্রোতার অন্তরে অবলীলাক্রমে প্রবেশ করতে পারতেন। সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি, স্মৃতির সরণি বেয়ে উদ্ধৃতি দেওয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্তব্য শেষ করা ছিল তাঁর বিশেষত্ব। ফলে শ্রোতারা নিবিষ্ট মনে তাঁর বক্তব্য শুনে ধন্য হতেন। এই কারণে তিনি অচিরেই সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

তাঁর 'সাবিত্রী' 'লাইফ ডিভাইন' থেকে শুরু করে অতি সাধারণভাবে শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের উপর বিভিন্ন ক্লাস যাঁরা করেছেন তাঁরা সর্বদাই চেষ্টা করতেন কোনভাবেই যেন তাঁর ক্লাস করা নষ্ট না হয়। অতি প্রাঞ্জলভাবে তিনি শ্রী অরবিন্দের পূর্ণযোগের কথা এবং মায়ের শরণ নেওয়ার প্রসঙ্গ এমনভাবে উত্থাপন করতেন যে মনে হত 'যোগ সাধনা' কত সহজ। এখানেই বক্তার অসাধারণ কৃতিত্ব এবং এখানেই বিশ্বনাথদার অসাধারণত্ব। কত নারী-পুরুষ যে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। লক্ষ্মী হাউস, পাঠমন্দির, কলকাতা ভবন থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, পণ্ডিচেরী এবং অসংখ্য কেন্দ্রে তাঁর সাবলীল ভাষণকে সকল স্তরের মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন আন্তরিকভাবে। আমাদের রেলের অফিসে প্রতি বৃহস্পতিবার টিফিনের সময় প্রায় ঘন্টাখানেক তিনি যে বক্তব্য রাখতেন তা শুনতে সহকর্মীদের আগ্রহ ছিল প্রবল। শ্রদ্ধেয়া অণিমাদির উদ্যোগেই বিশ্বনাথদার এই ক্লাস

শুরু হয় এবং যার ব্যাপ্তি ঘটে বহুদূর। শ্রী অরবিন্দের 'মা' বইয়ের উপর বিশ্বনাথদার ক্লাস যাঁরা করেছেন তাঁরা কখনও তাঁকে ভুলতে পারবেন না, আর কখনও ভুলবেন না শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের করুণার কথা।

মা, শ্রী অরবিন্দ বিশ্বনাথদার জীবনযাত্রাকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে তাঁদের কাজ ছাড়া তিনি অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না, এমনকি, মেয়ে-জামাই বিদেশে থাকলেও এবং তাদের শত অনুরোধেও তাদের কাছে যাবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ছিলেন। আমার সৌভাগ্য যে দু'বার তাঁর পদস্পর্শ লাভ করেছে আমাদের বাড়ি। প্রথমবার আমার খোলসাপুর বেহালা রেলওয়ে অফিসার্স কোয়ার্টারে ১৯৯৭ সালে অনিমাদির উদ্যোগে বিশ্বনাথদা এসেছিলেন। দ্বিতীয়বার ঢাকুরিয়ায় আমার ছেলের ফ্ল্যাটে ২০১৮ সালে এসে অসাধারণ বক্তব্য রেখেছিলেন। মনে পড়ে সেদিন আমার আপ্যায়নে খুশি হয়ে বলেছিলেন এ যে একেবারে বিয়েবাড়ির অনুরূপ ব্যবস্থা। আসলে এই ব্যবস্থার মূলে ছিল বিশ্বনাথদার প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। প্রসঙ্গক্রমে বলি, ১৪ই আগস্ট, ১৯৯৪ সালে আমার ছেলের বিয়েতে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এবং কথায় কথায় জানিয়েছিলাম একটা সমস্যার বিষয়। বলেছিলাম আমার ছেলে ও হবু বৌমাকে বিয়ের পর কর্মোপলক্ষে পৃথক জায়গায় থাকতে হবে। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন 'আজ থেকেই মায়ের কাছে প্রার্থনা করুন যেন ওরা দু'জন একজায়গায় থাকতে পারে।' শ্রীমা-শ্রী অরবিন্দের কাছে অকপটে প্রার্থনা করাটাও তাঁর কাছে শিখেছি। এই প্রসঙ্গে ১৩/০৭/২০১৫ তে, সাবিত্রী'র একটি ক্লাসে তিনি Book I– Canto IV, 'The Secret Knowledge', Page 47', নিম্নোক্ত অংশটির যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

"In moments when the inner lamps are lit
And the life's cherished guests are left outside,
Our spirit sits alone and speaks to its gulfs."

বিশ্বনাথদার উদাত্ত কন্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ হৃদয়ের প্রসারতা বৃদ্ধির সহায়ক ছিল। ২০২০ সালে ফেব্রুয়ারি দর্শনের পর পণ্ডিচেরী থেকে কলকাতা ফেরার সময় উড়িষ্যার এক মহিলা কথাপ্রসঙ্গে বিশ্বনাথদার মন্ত্রোচ্চারণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। বহুবার ঐ মন্ত্র বিশ্বনাথদার কন্ঠ হতে নির্গত হওয়ায় বহুজনই প্রায় মুখস্ত করে ফেলেছেন:

ওঁ নমঃ মাত্রে জগণ্মাত্রে ভগবত্যৈ নমো নমঃ।
মহাশক্ত্যৈ মহাব্যক্ত্যৈ মহর্মূর্ত্যৈ নমো নমঃ।।

বিশ্বনাথদা ফটোর মাধ্যমে স্মৃতি সংরক্ষণ করতে পছন্দ করতেন, বোঝার একবার বড় সুযোগ হয়েছিল। সরস্বতীর প্রচেষ্টায় ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে পাঠমন্দিরে

রেলিক্স আনার সময় আমারও পণ্ডিচেরী যাবার সুযোগ হয়েছিল। সেই সময় আমি অনেক ছবি তুলেছিলাম। পরবর্তীকালে বিশ্বনাথদা আমাকে বলেছিলেন, দেহাবশেষ হাতে তাঁর কোনো ছবি আমার কাছে আছে কিনা। আমি তাঁকে সেই ছবি দিয়েছিলাম।

বিশ্বনাথদা এই পার্থিব জগতে এসেছিলেন ১৬ই এপ্রিল, ১৯৪১ সালে। আমাদের ছেড়ে বিদায় নিলেন ২২শে মে, ২০২৩ সালে। তাঁর মত মাতৃসেবক দুর্লভ। তিনি চলে যাবার পর আমার বারে বারে মনে হয়েছে তাঁর জীবনী লেখা থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁর কাছ থেকে বহু ব্যাপারে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিকতার জগতে বিচরণের ক্ষেত্রে, তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারত। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে চেয়েছি একটি পুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমে। এটি হবে স্মরণে-মননে তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করার একান্ত প্রয়াস।

বিশ্বনাথদার 'সাবিত্রী' ক্লাস করেছিলাম ৪ঠা জানুয়ারি, ২০২০, এটাই আমার শেষ ক্লাস করা। ইচ্ছে থাকলেও ওঁর সব ক্লাস করা সম্ভবপর হ'ত না বিভিন্ন কারণে। ঐ দিনই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও কথা বলা। রসিকতা করে বিশ্বনাথদা আমাকে 'মিতা চক্রবর্তী রেলওয়ে' বলে অভিহিত করতেন। আজও তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কানে যেন বাজে।

যাঁদের সহায়তায় আজ শ্রীমায়ের করুণা ও পাদপদ্মের সন্ধান পেয়েছি তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, পরম শ্রদ্ধেয় আমার বা আমাদের বিশ্বনাথদা, তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। মাতৃভক্ত আরও অনেকের কাছ থেকে প্রভূত সহায়তা পেয়েছি। এঁদের সকলের কথা মাথায় রেখেই যেন আত্মবিশ্বাস, উদ্যম ও ভালবাসা হৃদয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হতে পারি, এই কামনা। পরিশেষে মাতৃমন্ত্রের উল্লেখ করে আমার প্রতিবেদনের ইতি টানি :

> " O Lord, I pray to thee, guide my footsteps enlighten my mind, that at every moment and in all things I may do exactly what Thou wantest me to do."
>
> —The Mother
> CWM 15,P-213

In remembrance of Prof. Biswanath Ray

Suman Sikdar
Sakher bazar,Kolkata

As I write today, it has been more than two years since Professor Biswanath Ray left us for his heavenly abode. He passed away on 22nd May 2023 at 09:10 P.M. Though no longer with us physically, he remains immortal in our hearts through his work and teachings.

Prof. Biswanath Ray served as a President of Sri Aurobindo Pathamandir, College Street, Kolkata, for several years. He was attached to almost all the Sri Aurobindo Centres across West Bengal state and also in Odisha. Sir devoted his life to studying, practicing and spreading the teachings of Sri Aurobindo and the Mother. He was a prolific and sought-after speaker on Aurobindonian thoughts and philosophy. Throughout his life, he delivered thousands of lectures and talks on Sri Aurobindo and the Mother. Both beginners in Integral Yoga as well as experienced Sadhaks and experts admired these talks.

Prof. Biswanath Ray was a Professor of Bengali language, he retired from Dinabandhu Andrews College. He was among the finest teachers and a brilliant researcher and author, writing under the pseudonym Trija Ray. His writings were in Bengali language. Some of his written Bengali books are Baktah Sri Aurobindo, Sri Aurobindo-er Karakahini Prasange, Sri Aurobindo: Bangaparba Kichu Katha Kichu Asha, Sri Aurobindo Sampadito Arya Prasange, Durga Stotra Prasange, Sri Aurobindo O Chandernagore, Kolkataye Sri Aurobindo-er Sesh Abash, Sri Aurobindo-er Pondicherry Yatra,

Sri Aurobindo Smaranika, Swagata Sri Aurobindo etc.

First time I saw Prof. Biswanath Ray at a seminar in Sri Aurobindo Bhavan, Shakespeare Sarani; it was somewhere in the month of July, 2012. What I first noticed is that he looked physically strong. His forehead was broad and smooth, bald head with some white hair remaining around the sides and back and a roundish face, complete with a white mustache. He was wearing a white dhoti and kurta. The moment I heard him speak, felt an attraction to listen more and more. His words had both logic as well as strength and spirit. It left an impression on my mental and vital being.

My real acquaintance with Prof. Biswanath Ray began through the Savitri classes. I was a regular attendee at his weekly Savitri Class held every Sunday evening from 07:00 p.m. to 08:00 p.m. at the Sakherbazar Centre in Behala, Kolkata. Each session would begin with a 10-minute meditation accompanied by Mother's music. Prof. Ray rarely used the Savitri book during the class only referring to it briefly for 4 to 5 minutes. Instead, he would quieten our minds and prepare the whole being to receive Sri Aurobindo's words. He typically selected 6 to 10 lines from a canto and would explain them in great detail. In the final 7 to 8 minutes, he would conclude the session by reciting Sri Aurobindo's Gayatri Mantra in three languages Sanskrit, English and Bengali: "Let us meditate on the most auspicious form of Savitri..."

While teaching and reciting from Savitri, a certain glow seemed to radiate from his physical presence. I often felt as if the Divine itself were speaking through him. I had the rare privilege of experiencing the Divine listening. As a guide, he would take us to a journey into higher realms of mind. His primary medium of communication was Bengali language, beautifully interwoven with English terms that enriched his explanations. His pronunciation was always crystal-clear and loud enough for even the last person in the audience to hear him clearly.

After each class, I could seldom recall everything he had said, but I always felt an inner joy. His words guided me deep within myself and opened me to receptivity. Being a regular student of his classes, I learned several aspects of Integral Yoga and gradually realized it was one of the best things that had happened to me. For

almost eight years, until March 2023, I remained a student at his Savitri class at the Sakherbazar Centre.

During the pandemic period, which extended for about 15 months, Sir continued conducting the Savitri classes through online Google Meet sessions.

Prof. Biswanath Ray always wore a white dhoti and kurta, simple sandals and carried a plain cotton bag. One could easily identify him as a teacher. He was remarkably punctual and disciplined never late, never absent. His ability to finish his talks precisely within the allotted time was truly admirable. Whenever he spoke on a topic, his words moved in perfect harmony with the central theme. The introduction, body and conclusion of his lecture were always meticulously crafted.

Presented here is a stanza from Savitri, recited and beautifully explained in the class..

Yet is it joy to live and to create / And joy to love and labour though all fails / And joy to seek though all we find deceives / And all on which we lean betrays our trust; / Yet something in its depths was worth the pain, / A passionate memory haunts with ecstasy's fire. / Even grief has joy hidden beneath its roots: / For nothing is truly vain the One has made: / In our defeated hearts God's strength survives / And victory's star still lights our desperate road; / Our death is made a passage to new worlds.

(Reference: Page 194, Book II: The Book of the Traveller of the Worlds, Canto VI: The Kingdoms and Godheads of the Greater Life)

This stanza expresses that even amid suffering, failure and loss, there is a profound joy and purpose in our existence. Sri Aurobindo says that it is a joy to live, to create, to love and to labour-even when everything seems to fail or deceive us because beneath the pain lies something eternally valuable. Every human experience, even grief, hides a joy in its root that lies beneath. Whatever God has created is valuable, nothing is truly vain. When the heart feels defeated, God's strength takes our side, guiding us onward. Furthermore, Death is not an end but a passage to new worlds.

Prof. Biswanath Ray not only impacted my life, but also touched the lives of my family and many others 1 know. Sir remains immortal in our hearts.

বিশ্বনাথদা স্মরণে

নমিতা দত্ত
কল্যাণী

বিশ্বনাথদার স্মরণে কিছু লিখতে বসে শ্রীমার 'ধ্যান ও প্রার্থনা' থেকে নভেম্বর ৯, ১৯১৪ সালের প্রার্থনাটি স্মরণে এল, এখানে সেই বাণীটি উল্লেখ করছি এই কারণে যে আমাদের আস্পৃহা কোন বিষয়ে হবে সেটি এখানে উল্লেখিত হয়েছে : "ভগবান, আমাদের আস্পৃহা হল পরিপূর্ণ চেতনালাভ।...

"সমস্ত আধারটি সংহত হয়ে উঠেছে শক্ত করে বাঁধা একটি তোড়ার মত — রকমারি ফুল দিয়ে তৈরী তা, অথচ সকলের মধ্যে রয়েছে নিঁখুত সামঞ্জস্য। যে-হাত ফুলগুলি সাজিয়েছে, যে-সুতোয় তোড়াটি বাঁধা হয়েছে তা হল সঙ্কল্পশক্তি। সে-হাত এখন প্রসারিত এই সুরভিত অর্ঘ্যটি তোমাকে সমর্পণ করবার জন্যে—তোমার দিকে প্রসারিত — শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই তার।"

বিশ্বনাথদা যখন তাঁর ভাষণে মা ও শ্রীঅরবিন্দের কথা বলতেন তখন তা শুনে আমার মনে হত তিনি যেন ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীনভাবে পরিপূর্ণ চেতনা লাভের জন্য আমার সুদৃঢ় আস্পৃহালাভের পথটি সুগম করে দিলেন।

উপনিষদ্ বলেন "বাগ্ বৈ ব্রহ্ম" , অর্থাৎ বাক্-ই ব্রহ্ম , এবং এই প্রশান্তি বাক্ এর শক্তি অসাধারণ তীব্র স্পন্দনযুক্ত যা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রবেশ করে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে অগ্নিশিখা সদা প্রজ্বলিত থাকে তাকে স্বর্ণাভ প্রোজ্জ্বল প্রভায় শতগুণে দীপ্তিমান করে তোলে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে,

"মা-ই গন্তব্যস্থান, তাঁর মধ্যে সবই আছে, তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়। তাঁর চেতনায় বাস করলে আর সব আপনিই ফুটে যায়।"

বহু পরিচিত শ্রীঅরবিন্দের এই বাণীটি যখন বিশ্বনাথদার ভাষণে উচ্চারিত হতে শুনেছি তখন মনে হত এই দিব্যবাণীর যে গভীর ব্যঞ্জনা তা যেন অন্তর্মুখীন চিত্তকে

মনকে মায়ের অনুধ্যানে নিবিড়ভাবে সুবিন্যস্ত করে নিস্তব্ধ করে দেবার শক্তি রাখে।

বিশ্বনাথদা এমন এক কর্মযোগী যাঁর সম্বন্ধে আমি কতটুকুই জানি, কি ই বা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি তাঁকে যিনি আমৃত্যু শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার বাণী, কর্মধারা ও ভাবসম্পদের প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। আমার নিজের এই দৈন্যের উপর হঠাৎ একঝলক মায়ের করুণার আলোকরশ্মি এসে পড়ল বিশ্বনাথদার কিছু উপদেশ ও নির্দেশনা বিষয়ে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম।

বেশ কয়েক বছর আগে কল্যাণীর শ্রীঅরবিন্দ ভবন এক জটিল ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, দ্বন্দ-সংঘাতে শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছিল। সেই সময় আমি কলকাতার পাঠমন্দিরে বিশ্বনাথদার নির্দেশেই প্রতিমাসের শেষ শনিবার শ্রীঅরবিন্দের গীতা নিবন্ধের ক্লাস নিতে যেতাম। তাইতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাই আমাদের কেন্দ্রের সমস্যায় আমার কি করণীয় তা জানতে চেয়েছিলাম কারণ আমি তখন প্রতিদিনই বিপদের মুখোমুখি হচ্ছিলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি মাত্র দুটি বাক্য বলেন - তিনি বলেছিলেন যে, বাইরে থেকে থানা, পুলিশ, আইন আদালত যাই করা হোক না কেন তাতে যে কাজ হবে তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ হবে অন্তরে মায়ের কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনায়। আর বলেছিলেন যে, সমস্যার ভয়ে হঠকারিতা করে ভবনের সঙ্গে সম্বন্ধ যেন ত্যাগ না করি। তাঁর এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছিল। ভগবতী জননীর অসীম করুণায় আজ কল্যাণীর শ্রীঅরবিন্দ ভবন নবরূপে গঠিত হয়েছে এবং পুরনো ভবনের বাইরের গঠন যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি পুরনো কার্যক্রমেরও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ করি, কল্যাণীর কেন্দ্র ছাড়াও অন্য আরও কয়েকটি কেন্দ্রের বিষয়ে যেগুলির সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম, তাদের ক্ষেত্রেও তাঁর মূল্যবান নির্দেশ গ্রহণ করে যথাযথ সুফল পাওয়া গিয়েছিল।

পরিশেষে, শ্রীমায়ের একটি বাণী স্মরণ করি , কিসে সবচেয়ে সুখ সে প্রসঙ্গে মা বলেছেন , "দিব্যের প্রকৃত সেবক হওয়াই হল পরম সুখ।" আমি চোখের সামনে পরমসুখী দিব্যের প্রকৃত সেবক রূপে যাঁকে দেখেছি , তিনি হলেন আমাদের বিশ্বনাথদা। বিনম্র শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পরম কৃতজ্ঞতায় তাঁকে স্মরণ করি আর তাঁর প্রেরণাময়ী বাণীর অশ্রুত ধ্বনিতরঙ্গ যেন নিয়ত আমার অন্তরে ধ্বনিত হয়ে এগিয়ে চলার সঠিকপথ নির্দেশ করে এইটুকুই প্রার্থনা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীলেখা মজুমদার,
লক্ষ্মী হাউস, কোলকাতা

স্মৃতিই জানিয়ে দেয় কোনোকিছুই হারায় না, মনের মণিকোঠায় অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

তোমার কীর্তির চেয়ে
তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায়
কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।

তাঁর কর্মশক্তির প্রকাশ ছিল পর্বতনির্গত ধাবমান গঙ্গার মত প্রচণ্ড, জীবন ছিল শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের চরণে সমর্পিত। কর্মই জীবন, জীবনই কর্ম। তিনি শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের কাজে আত্মনিয়োগ করে গেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ গবেষক বিশ্বনাথদা ছিলেন সহজ, সরল, স্পষ্টবক্তা, উপরে কঠোর ভিতরে কোমল হৃদয়ের মানুষ। অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। ত্রিজ রায় নামে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করে অনেক বই প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন পাঠমন্দিরের সভাপতি ও দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান।

লক্ষ্মী হাউসে ‘রেলিক্স’ আসার সময় থেকে জয়াদির সঙ্গে পরিচয়। সৃজনশীল প্রায় সব কাজেই জয়াদির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন বিশ্বনাথদা। জয়াদির প্রতিটি কাজে অন্যতম সহযোগী ছিলেন তিনি। কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের স্পর্শধন্য জায়গাগুলিতে ফলক লাগানোর সময় অন্যতম সহযোগী ছিলেন তিনি, ফলকের লেখা

জয়াদির অনুরোধে ছিল তাঁরই। বাংলাদেশে শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিতে ফলক বসানোর ব্যাপারেও তাঁর গভীর উৎসাহ ছিল। সিলেট ও খুলনায় তাঁর যাবার খুব উৎসাহ ছিল কিন্তু শারীরিক কারণে সমর্থ হননি। না গেলেও বাংলাদেশে কিভাবে কি হল তার খুঁটিনাটি সব খবর নিতেন।

আলিপুর কোর্টে বোমা মামলার কাগজপত্র উদ্ধারের কাজেও তিনি ছিলেন জয়াদির সহযোগী। গ্যালারি লা মের-এর প্রতিষ্ঠার কাজেও তিনি বিশেষভাবে সহায়তা করেন কারণ এই কাজে তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ ছিল। লক্ষ্মী হাউসে একসময় বিশ্বনাথদা কয়েক মাস ছিলেন ও সেই সময় জয়াদির অনুরোধে আমাদের স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে সপ্তাহে দু'দিন করে বাংলা পড়াতেন। সেই সময় ধারাবাহিক 'বসুধারা' প্রকাশিত হত; তার উপদেষ্টাও ছিলেন তিনি। সেই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের উপর আলোচনার ক্লাস তিনি প্রতি সপ্তাহে নিতেন।

বিশ্বনাথদা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। একবার জয়াদির জন্মদিনে 'জয়াদি'র বিষয়ে বলার জন্য অনুরোধ করলে প্রথমে বলেন সময় পাব কিনা জানিনা, কিন্তু পরে রাজী হন, মূল্যবান বক্তব্যও রাখেন। তাঁর বাগ্মীতা ছিল অসাধারণ। তিনি নিজেই বলতেন দ্যুমানভাই তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'লেকচারার'।

'নিশিকান্ত কবিতা সমগ্র' প্রকাশের আগে প্রস্তাবনা লেখার জন্য অনুরোধ করলে প্রথমে বলেন আমার সময় হবে না কিন্তু পরে রাজি হন ও বলেন যখনই দরকার ফোন করতে ও রাতে ফোন করলেও অসুবিধা নেই কারণ, অনেক রাত অবধি তিনি পড়াশোনা করেন। শেষ দিকে লক্ষ্মী হাউসে মাসে একবার করে আসতেন ও 'দিব্যজীবন' থেকে পড়াতেন। একপাতা বোঝাতেই এক ঘন্টা কোথা দিয়ে যে চলে যেত বুঝতে পারতাম না।

অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার খবর শুনে দেখতে যাই। সবার সঙ্গে দেখা করতেন না, বৌদি গিয়ে বলেন 'লক্ষ্মী হাউস' থেকে শ্রীলেখা এসেছে, তিনি দেখা করার অনুমতি দেন। গিয়ে প্রণাম করে বসলাম। পা খুব ফোলা। বললেন খেতে ইচ্ছে করে না, ফলের রস ছাড়া। পনেরো মিনিট মত ছিলাম, নানা কথা বলার পর আসার সময় বলেন শরীর একটু সুস্থ হলে লক্ষ্মী হাউসে কবে যাব জানিয়ে দেব, তখন অনুষ্ঠানসূচীতে লিখে দেবেন। সে দিন আর এল না। তিনি এলেন না, কিন্তু গাড়িতে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ এল।

জগৎমঞ্চের রহস্যময় যবনিকার অন্তরালে চলে গেলেন। শ্রীমা- শ্রীঅরবিন্দের চরণে চিরতরে আশ্রয় নিলেন। কাজের মধ্যেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আমাদের বিশ্বনাথদা চিরজীবী।

বিশ্বনাথ রায় স্মরণে

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,কোলকাতা

সাল ১৯৯৭, আমার ছোটবেলার বন্ধু তমোজিত আমায় দুটো বই দিল , 'কে এই মা' ও 'শ্রীঅরবিন্দ জীবন ও যোগ'। এর আগে আর পাঁচটা মানুষের মতন আমি জানতাম শ্রীঅরবিন্দ একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, আর শ্রীমার পরিচয় আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এই দুটি বইয়ের মাধ্যমে আমার অন্তরের এক সুপ্ত অংশ অনাবৃত হল এবং ওনাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলাম। তারপর সেই বন্ধুই একদিন, সম্ভবত কোন বৃহস্পতিবার, আমায় নিয়ে যায় এক অজানা স্থানে একজনের বক্তৃতা শোনার জন্য। কলেজস্ট্রীটে অবস্থিত শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের তিনতলায় ঘরোয়া অনাড়ম্বর পরিবেশে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় 'সাধনা' বিষয়ে ক্লাস করছিলেন। একটি ধারাবাহিক ক্লাস যা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত অভ্যস্ত ক্লাসের যে ধারা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেটি ছিল আত্মলাভের সাধনার ক্লাস, যাতে তথাকথিত পাশ-ফেলের বা নির্ধারিত সময়ে কোর্স সম্পূর্ণ করার যে তাগিদ ছাত্রাবস্থায় আমরা দেখে এসেছি, তা নয়। A. S. Dalal সম্পাদিত ও সংকলিত বই 'The Psychic Being' থেকে কয়েকটি লাইন , বড়জোর একটি অনুচ্ছেদ নিয়ে মাসের পর মাস আলোচনা হত। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের কথা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায়োগিক স্তরে কিভাবে প্রতিফলিত করা যায় তা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় উদাহরণ সহযোগে উপস্থাপন করতেন। তত্ত্বকথা, পাণ্ডিত্যের প্রতিফলন অথবা তাঁদের কথা আমাদের বাস্তব চেতনার ধরাছোঁয়ার বাইরে, এমন কোনদিন মনে হত না। আমার মতন যুবসম্প্রদায়ের আরও অনেক তরুণ-তরুণী তখন ওনার ক্লাসের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবনের পথ শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে আলোকিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যেই সৃষ্টি হল 'শ্রীঅরবিন্দ ইয়ং গ্রুপ' এবং শুরু হল সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে এই গ্রুপের

সিটিং পাঠমন্দির হলো। যুবসম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবন যাপনে যে সমস্যার সম্মুখীন আমরা হই তার সমাধান শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকে নিয়মিত পাঠ ও আলোচনা হয়ে চলেছে সপ্তাহের ব্যস্ত দিনগুলোর মধ্যে একটি নির্ধারিত সময়ে পাঠমন্দিরে। এই যুগান্তকারী উদ্যোগ বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলায় বাস্তবায়িত হয়ে আজও তার ধারা বজায় রেখেছে। এই বিষয়ের কাণ্ডারী হিসাবে আমরা একবাক্যে স্বীকার করি একটাই নাম, অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়। আমাদের কলেজ জীবনের শেষে প্রদীপ শিখা হিসাবে জীবনে এল পাঠমন্দির, আর শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও শিক্ষা আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে নিয়ে এলেন বিশ্বনাথদা। বর্ণনার মাধ্যম হিসাবে উনি বাংলার বিভিন্ন লেখকের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহার করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ওনার ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের কথা , "সব দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই"; "নয় নয় এ মধুর খেলা" "তবু যা ভাঙাচোরা, ঘরেতে আছে পোরা"; "আমাকে যে জাগতে হবে, কি জানি সে আসবে কবে"; "কবে বাহির হইবে জগতে মম জীবন ধন্য জানি"; এমনই অজস্র কবিতা, গানের মাধ্যমে উনি শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের লেখার মর্মার্থ বোঝাতেন আমাদের। চরম হতাশায় জীবন-যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে এমন বহু দিন গেছে যখন ওনার বক্তৃতা মৃতসঞ্জীবনীর মতন কাজ করেছে। এতটাই আকর্ষিত হলাম ওনার মুখে তাঁদের কথা শোনার জন্য বুধবার কলকাতার শ্রী অরবিন্দ ভবনে যাওয়া শুরু করি। দোতলায় বিশাল বারান্দায় বিনা মাইকে শ্রী অরবিন্দের 'সাবিত্রী' ক্লাস বছরের পর বছর করেছি। সবচেয়ে বড় যে বিষয় আমাদের আকৃষ্ট করেছিল তা হল নিজের সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা, বিষয়ের মাত্রাজ্ঞান, নিজের এক্তিয়ার সম্বন্ধে পরিষ্কার বিবেচনা। কোনদিন পাঠমন্দিরে বা অন্যত্র কারও প্রণাম গ্রহণ করতেন না, বলতেন ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদনের একমাত্র স্থান শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের চরণ। আর উনি শুধু সেই কাজই করেছেন যা ওনাকে দেওয়া হয়েছে। বহু ধারাবাহিক ক্লাসের মধ্যে শ্রী অরবিন্দের 'The Mother' এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। উনি বলতেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনজীবনের সারাৎসার এই বইটিতে ব্যক্ত করেছেন এবং বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করতেন বইটির শেষ বাক্যটি যা তাঁর সাধনার মূল চাবিকাঠি , "The Mother's power and not any human endeavour and tapasya can alone rend the lid and tear the covering and shape the vessel and bring down into this world of obscurity and falsehood and death and suffering Truth and Light and Life divine and the immortal's Ananda."

ওনার সাংগঠনিক নিপুণতার সাক্ষ্যপ্রমাণ আমরা পেয়েছি পাঠমন্দিরের বহু কাজের মধ্যে। এর মধ্যে অন্যতম শ্রীঅরবিন্দের 'Relic' স্থাপন ২০১৬ সালে। হুগলী শ্রীঅরবিন্দ ভবনের সঙ্গে ওনার নাড়ির টান ছিল এবং বহরমপুর, শান্তিনিকেতন, এছাড়াও বহু

শ্রী অরবিন্দ কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যজুড়ে যা অবস্থিত তারা সবাই কোন না কোন সময়ে তাঁর সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় পেয়েছে। কত শিক্ষা যে আমরা নিয়েছি ওনার জীবনের ঘটনাবলী থেকে তা লিখে ব্যক্ত করা দুরূহ। ওনার কথা শুনে আমার মতন কয়েকজন এই আদর্শে এতটাই অনুপ্রাণিত হই যে ঠিক করি শিক্ষাগত জীবনের পরবর্তী জীবনের বাকি সময় উৎসর্গ করব শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের কাজে। শ্রীঅরবিন্দের 'All Life is Yoga' বাণীটির যথার্থ বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন আমাদের এই মহৎ আদর্শের ভিত্তি কতটা দৃঢ় তা পরীক্ষা করার জন্য আমাদের বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখা প্রয়োজন। ওনার পরামর্শে আমরা কর্মসূত্রে বাইরের জগতে যুক্ত হয়েছি, আর বুঝতে পারি পাঠমন্দির বা অন্য শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রের আর আমাদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের কী পার্থক্য! জীবনের সকল অবস্থার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আস্বাদনের মারফৎ শ্রীঅরবিন্দের যোগ করাই হল আমাদের আসল পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাহস, উৎসাহ প্রদানকারী শিক্ষকই জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। বিশ্বনাথদাকে আমাদের নশ্বর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে বহুদিন আগেই স্বীকার করেছি। বহু স্মৃতি আসে ভেসে আবার মিলিয়ে যায়। তারা একদিন চলেও যাবে আমাদের সঙ্গে কিন্তু রেখে যাবে তার নির্যাস যা পাথেয় করে আমার মতন বহু মানুষ এই পথ অতিক্রম করবে। ওনার জীবনে কখনও দুঃখের, হতাশার প্রকাশ আমরা দেখিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যত শক্তি ছিল শরীর ও মনে তার শেষ বিন্দু পর্যন্ত ব্যয় করেছেন শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের কথা, তাঁদের আদর্শ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। সেই অমৃতবাণী সমান কথা পরশপাথরের মতন সহস্র মানুষের হৃদয়ে আনন্দ-আশ্বাসের ছোঁয়া রেখে গেছে। ওনার বহু ক্লাসে শ্রী অরবিন্দের যে কালজয়ী বাণী যা উনি নিজের জীবন দিয়ে আমাদের হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছেন সেটি স্মরণের মারফৎ এই লেখার পরিসমাপ্তি টানি : It is not a hope but certitude that complete transformation of nature will take place.

বিশ্বনাথদার স্মৃতিতে

সুব্রত গায়েন
পন্ডিচেরী

শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি ক্যানিং সেন্টারে আমরা একঝাঁক ছোট-বড় মিলে প্রায় জনা ত্রিশেক একত্র হয়েছি। আমাদের সম্পাদিকা শ্রীমতি নমিতা সেন একজন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, স্নেহশীল শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী মহিলা। আমাদের ডেকে বললেন, বিশ্বনাথদা আসবেন। উনি মা- শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে খুব ভালো বলেন। এই প্রথম বিশ্বনাথদা নামটির সঙ্গে পরিচয় হোলো।

তখন দুপুর; বেঁটেখাটো, সু-স্বাস্থ্যবান, ঝকঝকে, গৌরবর্ণের এক ভদ্রলোক, পরনে ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, উজ্জ্বল চোখ, গেট খুলে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির ভিতরে সারি দেওয়া ফুলগাছ দেখতে দেখতে আমাদের কাছে চলে এলেন। নমিতাদি বললেন, 'নমস্কার বিশ্বনাথদা, আসুন।' আমরা বিশ্বনাথদার পিছন পিছন শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির মধ্যে চলে এলাম। আমাদের ক্যানিং সোসাইটির মেডিটেশন হল-এ বিশ্বনাথদার মা-শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য প্রথম শুনলাম। আমার কিশোর মন ভরে উঠল। মনে হলো বিশ্বনাথদা আমার একান্ত আপনজন।

তারপর হুগলী ভবনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের Relics এসে পৌঁছলো কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবন, তাঁরই জন্মস্থানে। বিশ্বনাথদার ডাকে শ্রীঅরবিন্দ ভবন থেকে হুগলী শ্রীঅরবিন্দ ভবন শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্সের সঙ্গী ছিলাম। এই সময় বিশ্বনাথদা ভিন্ন রূপে দেখা দিলেন। তাঁর সারাজীবনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের দেহাবশেষ হুগলী ভবনে প্রতিষ্ঠার যে সমারোহ দেখেছি তা অতিমানবিক বলা যেতে পারে। হয়তো ঐ সময়ে বিশ্বের যিনি নাথ তিনি স্বয়ং বিশ্বনাথদার উপর ভর করেছিলেন। ঐ সমারোহের বর্ণনা হয়তো হুগলী ভবনের কোনো পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে। কলকাতা ভবন থেকে হুগলী ভবন পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্স আগমনের যাত্রাপথে অনেক

জায়গায় থামতে হয়েছিল। অগণিত শ্রীঅরবিন্দপ্রেমী মানুষ শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্সে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। যেখানেই এই রেলিক্স থেমেছে সেখানেই খাওয়া, বিশ্রাম এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথদা যেভাবে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন সেগুলি ভিন্নমাত্রার।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা থেকে উঠে আসা আধ্যাত্মিক প্রবাহ কিভাবে শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি দিব্য অবতরণের যোগপথ আমাদের সামনে যেভাবে রেখে গেছেন সেই বিষয়টি প্রত্যেক অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথদা তাঁর রাজকীয় গভীর কণ্ঠস্বরে উপস্থাপন করেছেন। জনসভায় উপস্থিত প্রত্যেকে সম্পূর্ণ মৌনভাবে মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন। বিশ্বনাথদা যখন জনসভায় বলতে উঠতেন মনে হতো তিনি যেন আমাদের থেকে অনেক দূরের মানুষ; আমাদেরকে শ্রীঅরবিন্দের কথা শুনিয়ে চলেছেন। পরবর্তীকালে বিশ্বনাথদার অনেক বক্তব্য শুনেছি, কিন্তু, ঐ সময়ে বিশ্বনাথদার মধ্যে যে কর্মশক্তির প্রকাশ ঘটেছিল সেটাকে অসাধারণ গোত্রে রাখা যেতে পারে। সেই সময়ে বিশ্বনাথদা নিজের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করে সকল কর্মভার নিখুঁতভাবে সম্পাদন করেছিলেন। Relics কোথায় যাবে? কতক্ষণ থামবে? Relics-এর আগে এবং পরে কতজন থাকবে? কে ডানদিকে, কে বাঁদিকে? Relics যে গাড়িতে চলেছে তার সাথে কে থাকবে? Relics-এর সবচেয়ে কাছে কতজন বসবে? , প্রত্যেকের নাম ধরে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ বিশ্বনাথদা নিজেই দিয়েছিলেন। অগণিত জনস্রোতের মাঝখানে শ্রীঅরবিন্দের Relics চলেছে। প্রত্যেকের অবস্থান ও পর্যায় বিশ্বনাথদার প্রত্যক্ষ পরিচালনায় চলেছিল।

বৃষ্টিমুখর এক দুপুরবেলায় বিশ্বনাথদার বাড়ির কলিংবেল বাজালাম। দাদা দরজা খুলে বললেন। 'ভিতরে এসে বস।' আমি বসে পড়লাম। উনি বললেন, 'কি ব্যাপার বল?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি মাকে পেয়েছেন?' বিশ্বনাথদা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে রইলেন, তারপর বললেন, 'মা-কে পেয়েছি কি না জানিনা! তবে মা-কে জানার আগে আমি যে মানুষ ছিলাম, আর এখন আমি যে মানুষ , এ দুটো মানুষ আলাদা।"

বিশ্বনাথদা শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে শ্রীঅরবিন্দের 'মা' গ্রন্থকে কেন্দ্র করে প্রতি বৃহস্পতিবার প্রায় তিন বছর শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ব্যাখ্যা করেছেন। একদিন আলোচনার শেষে পাঠমন্দিরের হলঘরের সামনে চেয়ারে বসে আছেন, আমি পাশে এসে বসলাম। বিশ্বনাথদা বললেন, "তোর কাছায় আগুন লেগেছে। মাকে বলে তোর বাড়িতে পাঠচক্র শুরু কর। মাসে একদিন আমি তোর বাড়িতে পাঠচক্র করে আসব।" প্রথম দিনের পাঠচক্রের কথা একটু বিশেষ। আমার পরিচিত এবং বন্ধুদের পাঠচক্রের দিনক্ষণ জানিয়েছিলাম। বিশ্বনাথদা পাঠচক্র শুরু হওয়ার প্রায় ১ ঘন্টা ২০ মিনিট

আগে এলেন। এসে সব ঘর, বাথরুম দেখে নিয়ে ঠাকুরঘরে পৌঁছে গেলেন। আমাদের ঠাকুরঘরে শ্রীঅরবিন্দ-মা-এর কোন ছবি ছিল না। বিশ্বনাথদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কে পূজা করে?' আমি বললাম, 'এটা মায়ের ঠাকুরঘর, আমার ঠাকুরঘর , বড় হলঘর।' আমাদের হলঘরে প্রায় চল্লিশজন ভালভাবেই বসতে পারে। এখনও ঐ ঘরে মা- শ্রীঅরবিন্দের বড় দুটো ছবি রাখা আছে। ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রায় ৫০ জন পাঠচক্র শুনতে এসেছিলেন। প্রায় ১ ঘন্টা বিশ্বনাথদা ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা ও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করে থামলেন। শ্রোতাদের মাঝখান থেকে আমারই এক বন্ধু সমীরদা বলে উঠলো, ''এই সাধনায় আপনার অভিজ্ঞতা বলুন।'' বিশ্বনাথদা শ্রীঅরবিন্দের কথা শুরু করতেই সমীরদা বিশ্বনাথদাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, ''শ্রীঅরবিন্দের কথা বই থেকে পড়ে নেব, আপনার অভিজ্ঞতা বলুন।'' সমীরদা কোন এদিক-ওদিক কথা শুনতেই চায় না, কেবল শ্রীঅরবিন্দ পথে বিশ্বনাথদার অভিজ্ঞতা শুনতে চায়। আলোচনাটা বেশ কিছুটা তর্কের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। শেষে বিশ্বনাথদাকে বলতে শুনলাম, ''আপনাকে এ আলোচনায় আর আসতে হবে না।'' প্রথম দিনের পাঠচক্র এইভাবেই শেষ হল। সবাই গম্ভীর, আমি অপ্রস্তুত। ২ দিন পর বিশ্বনাথদার সাথে দেখা হল। উনি বললেন, ''এটা মায়ের পরীক্ষা; আমাদের আরও প্রস্তুত হতে হবে।'' এই পাঠচক্র প্রায় ৫ বছর চলেছে। বিশ্বনাথদা বহু শ্রম স্বীকার করে এই পাঠচক্র চালিয়ে গেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের 'মা' ও 'সাবিত্রী' কাব্যগ্রন্থকে কেন্দ্র করে বিশ্বনাথদা প্রায় চার দশক ধরে শ্রীঅরবিন্দ ভবনে শ্রীঅরবিন্দের কথা শুনিয়ে গেছেন। আমিও কিছুকাল মুগ্ধ শ্রোতা ছিলাম। শেষের দিকে কিছু বছর ক্লাসের পর বেহালা পর্যন্ত বিশ্বনাথদার সঙ্গলাভ করতাম। সেদিন ছিল বিজয়া দশমী। বিশ্বনাথদার 'সাবিত্রী' ক্লাস হয়ে গেছে। আমি শ্রীঅরবিন্দ ভবনের মধ্যে ৮ ফুট দীর্ঘ শ্রীঅরবিন্দের মূর্তির সামনে বিশ্বনাথদার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি বিশ্বনাথদা প্রণাম নিতে চাননা। কিন্তু আমার স্ত্রীকে দেখেছি বিশ্বনাথদাকে প্রণাম করতে। সেই ভরসাতেই ভেবেছি আজ বিজয়া দশমী, বিশ্বনাথদাকে প্রণাম করব। বিশ্বনাথদা আমার কাছাকাছি আসতেই আমি প্রণামের জন্য মাথা নোয়ালাম। বিশ্বনাথদা একপ্রকার আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ শুরু করে দিলেন। বিজয়া দশমী বলে কথা, আমিও ছাড়ার পাত্র নই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আমি প্রণামের আশা ছেড়ে দিলাম। বিশ্বনাথদা বুঝিয়ে বলেছিলেন, ''প্রণাম গ্রহণের ক্ষমতা তাঁদেরই আছে যাঁরা প্রত্যেক প্রণাম মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

শ্রীঅরবিন্দ ভবন থেকে বিশ্বনাথদা বাড়ি ফিরতেন মেট্রো ট্রেনে। রবীন্দ্র সদন থেকে ট্রেনে উঠে প্রায় ২/১টা স্টপেজ পরে Senior Citizen Seat -এ জায়গা পাওয়ার সাথে সাথে চোখ বুঁজে স্থির হয়ে বসে থাকতেন। শুধু মৃদু মৃদু ঠোঁট দুটোতে

কিছু একটা অস্পষ্ট উচ্চারণ হতে থাকতো। টালিগঞ্জে আসার একটা স্টেশন আগে আমি বলতাম, ‘‘দাদা, পরের স্টেশন টালিগঞ্জ।’’ উনি সজাগ হয়ে উঠতেন। বিশ্বনাথদাকে ঐ সময় মনে হত উনি একজন একদৃষ্ট-তন্নিষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ পথিক। উনি সারাজীবন বিভিন্ন শাখায় পড়াশুনো করতেন। কিন্তু সমস্ত বিষয়কে শ্রীঅরবিন্দের আলোতে বুঝতে চাইতেন।

বিশ্বনাথদা বলতেন, ‘‘শ্রীঅরবিন্দ আমাদের কাছে ‘Hope of Man’ , মানবজাতির উচ্চতম আশার প্রতিনিধি।’’ একদিন শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে বিশ্বনাথদাকে বলতে শুনলাম , ‘‘এ পথে এসে কি সাধনা হয়েছে জানিনা, কি পেয়েছি বলতে পারবো না, তবে এটুকু সান্ত্বনা নিয়ে চলে যাব যে শ্রীঅরবিন্দের আহ্বানে সাড়া দিতে পেরেছি।’’

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বিশ্বনাথদাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি হাত ধরে অসংখ্য মানুষকে শ্রীঅরবিন্দের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছেন। আজ তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেবলই মনে হয় এমন শ্রীঅরবিন্দপ্রেমী মহাত্মা আমাদের জীবনে এসেছিলেন বলেই জীবন মূল্যহীন হয়নি।

বিশ্বনাথ জ্যেঠু : রয়েছো মননে

চন্দ্রিমা চ্যাটার্জী,
কোন্নগর

আজ যাঁকে লেখায় স্মরণ করতে বসেছি, কখনো ভাবিনি যে একদিন তিনি কেবলমাত্র স্মরণের বিষয় হয়ে যাবেন আর আমি সেই আনন্দময় দিনগুলির স্মৃতিচারণ করব। তিনি অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়। অগণিত মানুষকে যে আনন্দবাণী উনি বিলিয়ে গেছেন, তা হল শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বাণী। তাঁর সাবলীল বক্তৃতা অন্তরকে স্পর্শ করত। বাংলা ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের কথা সহজভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা তাঁর কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল বলে আমার ধারণা। হয়ত বাকিদের মতই আমারও ওনার প্রতি আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিল এইটিই। উত্তরপাড়া কেন্দ্রে উনি প্রতিমাসে একটি রবিবার আসতেন শ্রীঅরবিন্দের 'মা' গ্রন্থটি পড়াতে। এই গ্রন্থটি পড়াতে গিয়ে ওনার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির খানিকটা বহিঃপ্রকাশ যে ঘটত তা বলাই বাহুল্য, কারণ, তা না হলে এমন হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যা বিরল, যা অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করতে সক্ষম। এই ক্লাসটি করে একরাশ আনন্দ আর একবুক অক্সিজেন নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। অপরদিকে, ওনাকে আমার মাস্টারমশাই বললেও খুব ভুল বলা হবে না। পড়ানোর এমন সহজ ভঙ্গী বিষয়কে হৃদয়ে গেঁথে দিত।

এরপর আমার সুযোগ হয়েছিল ২০১৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের দলের সাথে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-দেহাংশ (Relics) নিয়ে একসাথে পণ্ডিচেরী থেকে কলকাতা আসার। এই কাজেও তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আর ফলত বেশ কিছুটা সময় ওনার সাথে ট্রেনে কাটানোর সুযোগ হয়েছিল। আর বিশ্বনাথ জ্যেঠুকে পাওয়া মানেই হল শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে কেন্দ্র করে নানা গল্পের স্রোতে অবগাহন। মা জীবনে যখন সুযোগ এনে দেন তখন দায়িত্বও উনিই নির্দিষ্ট করে রাখেন, একথা তখন হয়তো বুঝিনি।

এরপর এলো আমার প্রত্যক্ষভাবে শ্রীঅরবিন্দের পথে কাজে যোগ দেবার পালা। যদিও তার সূচনা আগেই হয়ে গিয়েছিল উত্তরপাড়া কেন্দ্রের হাত ধরে। প্রত্যক্ষভাবে আমার নিজের জায়গায় কাজের সূত্রপাত ঘটে কোন্নগর বইমেলাকে কেন্দ্র করে, প্রতিবছর এই বইমেলায় শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির ও উত্তরপাড়া শ্রীঅরবিন্দ পরিষদের যৌথ পরিচালনায় একটি বইয়ের স্টল থাকে। তৎকালীন কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষ এই বইমেলায় বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশ্বনাথ জ্যেঠুকে নিয়ে আসত। আর বিশ্বনাথ জ্যেঠুর চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার পর প্রায় চল্লিশটি 'কারাকাহিনী' বই নিমেষে বিক্রি হয়ে গেল — এ অভিজ্ঞতা কয়েকবারের। যে বিষয়টি আমায় অবাক করত তা হল শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা'র প্রতি ওনার ভালোবাসা, যা প্রকাশ পেত ওনার কথায় অথচ অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ ছিল নিজের আবেগের উপর।

২০১৭-র ৪ঠা জুলাই আমাদের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ পাঠচক্রের শুভ সূচনা হয় ওনার হাতেই। এই কাজে আমি প্রধান সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলাম বক্তা এবং কর্মী শ্রী বিশ্বনাথ রায়কে। আর এই কাজকে কেন্দ্র করেই ওনার সাথে আমার সংযোগও বৃদ্ধি পায়। ওনার নির্দেশেই পাঠচক্র শুরুর অনুমতি চেয়ে মাকে আশ্রমে চিঠি লিখলাম আর যথাসময়ে মার আশীর্বাদও এসে পৌঁছায়। প্রতিবছর রোদ-ঝড়-জল উপেক্ষা করে ট্রেনে বাসে করে ঠিক এই জুলাই মাসের একটি রবিবার বক্তা হিসাবে আমাদের এই ছোট পাঠচক্রে এসে উপস্থিত হতেন। আমার কাছে যেটা বড় প্রাপ্তি তা হল বড় কোন কেন্দ্রে ঠিক যতটা উৎসাহের সাথে যেতেন এই ছোট্ট পাঠচক্রকেও সমান গুরুত্বের সাথে সময় দিতেন। আর কোন্নগরবাসী দিন গুণতো এই জুলাই মাসটির অপেক্ষায়। পাঠচক্রের একবৎসর পূর্তিতে আমায় বললেন , তোমার কাজে আমি খুব খুশি হয়েছি। জ্যেঠুর মত মানুষের থেকে এহেন উক্তি আমার জীবনের বড় প্রাপ্তি।

যে 'মা' (The Mother) বই-এর ক্লাস দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ পথে আমার পথচলা একসময় শুরু হয়, পরবর্তীকালে অতিমারীর সময় সেই 'মা' বইয়ের অনলাইন ক্লাসটি পরিচালনার দায়িত্ব পেল আমাদের শ্রীঅরবিন্দ পাঠচক্র, কোন্নগর। টানা দুই বৎসরের বেশি সময় ধরে এই ক্লাসটি অনলাইনে চলে। বিশ্বনাথ জ্যেঠুর কথানুসারে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল এই ক্লাসটি। এ ছিল মা-এর এক অপার্থিব করুণা। আর তার সাথে ছিল বক্তা বিশ্বনাথ রায়ের সহযোগিতা। উনি সবসময় নিজেকে বলতেন একজন কর্মী। তবে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, বক্তা বিশ্বনাথ রায়, গবেষক বিশ্বনাথ রায়, কর্মী বিশ্বনাথ রায়, শ্রীঅরবিন্দ পথে চলতে চলতে কবে যে আমার কাছে বিশ্বনাথ জ্যেঠুতে পরিণত হলেন তার কোন দিন-ক্ষণ-তারিখের হিসেব আমার কাছে নেই। কখন যে পিতা-পুত্রীর স্নেহের বন্ধনে মা আমাদের আবদ্ধ করেছেন তা বোধহয় দুজনের কেউই টের পাইনি। জ্যেঠুকে একবার বলতে শুনেছি যে আমাদের এই পথে বিশেষ কিছু সম্পর্কে 'মা'

আমাদের আবদ্ধ করেন। আমার ধারণা মাতৃলোকে উনি মহা আনন্দে আছেন। যথা সময়ে নতুন কাজের দায়িত্ব দিয়ে মা জ্যেঠুকে আমাদের মাঝে আবারও পাঠাবেন। তবে সেইদিন হয়ত অন্য কোন নামে, অন্য রূপে আমরা জ্যেঠুকে পাব। কবির গানের কথায় ,

"নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নূতন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি"

তাই জ্যেঠুর চলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দুঃখপ্রকাশ অপেক্ষা ওনার দেখান পথে যদি আমরা তরুণেরা চলতে পারি, তাহলে সেইটিই হবে ওনার প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

স্মৃতির তরণী বেয়ে

ত্রিদিব রঞ্জন সরকার
হুগলী চুঁচুড়া

সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা বৃহত্তর সমাজে নগণ্য বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু ঐ সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিশেষ কোন মানুষ যখন তাঁর সুউন্নত কাজের মাধ্যমে অসাধারণত্বে উন্নীত হন তখন তিনি অবলীলাক্রমে যেন হয়ে ওঠেন উল্লেখযোগ্য আদর্শ মানুষ।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় এমনই একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। আপাত দৃষ্টিতে যিনি অতি সাধারণ, কিন্তু তাঁর সুদীর্ঘ মহান কর্মধারা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে অসাধারণত্বে। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর যাত্রাপথে একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে এবং ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তাঁকে প্রাথমিক পর্যায়ে বিশিষ্ট বলে মনে না হলেও ক্রমে ক্রমে অধ্যাত্ম পথে তাঁর নিঃস্বার্থ বিচরণ আমাকে বুঝিয়েছে তিনি আর পাঁচজনের থেকে স্বতন্ত্র। চুঁচুড়ার একটি শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রে (শম্ভুনাথ শীলের 'মাতৃসেবক' কেন্দ্র) তাঁর সঙ্গে ১৯৭৩ সালের এক সন্ধ্যায় আমার প্রথম পরিচয়। তিনি তখন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং সপ্তাহান্তে হুগলীর বাড়িতে আসেন (শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষে, ১৯৭২ সালে, হুগলীর মোগলপুরা লেনে একটি পুরোনো বাড়ি কেনেন)। যেহেতু আমার ও তাঁর বাড়ির ব্যবধান বেশি ছিল না, তাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও ক্রমেই বাড়তে থাকে। চুঁচুড়ারই অপর একটি কেন্দ্রে (দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের 'দি নিউ রে' কেন্দ্র) আমাদের মাঝে মাঝে যাতায়াতের ফলে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে। এমনও অনেকদিন হয়েছে যে আমরা একই সাইকেলে দু'জন যাওয়া-আসা করেছি। উক্ত দুটি কেন্দ্রে যাওয়ার ফলে আরও অনেকের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপিত হয়। কথাপ্রসঙ্গে একদিন বিশ্বনাথদা প্রস্তাব দিলেন আমরা নিজেরা যদি একটি কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারি তবে তা সকলের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখা যাবে (আসলে পূর্বোক্ত কেন্দ্র দুটি ছিল মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক)।

স্বাভাবিক কারণেই তাঁর প্রস্তাব অনেকের কাছেই যথেষ্ট প্রাধান্য পায়।

১৯৭৮ সালের ১২ই নভেম্বর (রবিবার) সকাল ১০ টায় (শ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষে) তাঁর বাড়িতে তাঁরই ব্যবস্থাপনায় আমরা ২১ জন সমবেত হয়ে 'প্রস্তুতি সমিতি' গঠন করি। এই সমিতি লিখিতভাবে প্রস্তাব নেয় হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভা এলাকার মধ্যে 'শ্রীঅরবিন্দ ভবন' গড়ে তোলা হবে। এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবে সকলে সই করে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে পাঠানো হয় শ্রীমায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মায়ের আশীর্বাদ চলে এলে সকলের হৃদয়ে যেন দুর্বার শক্তি নেমে আসে। এই প্রস্তুতি সমিতির আহ্বায়কের দায়িত্ব নেন স্বয়ং বিশ্বনাথদা।

দেখতে দেখতে তাঁর দূরদর্শিতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতাবলে কয়েক বছরের মধ্যে খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ 'হুগলী চুঁচুড়া শ্রীঅরবিন্দ ভবন' বাস্তবায়িত হয় ৮ই অগস্ট, ১৯৮৮ সালে। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে আরও দু'টি শাখা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। একটি 'শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষাকেন্দ্র' (বিশ্বনাথদা তাঁর বাড়ি ভবনকে 'দানপত্র' লিখে দিয়ে দেন) এবং অন্যটি 'শ্রীঅরবিন্দ চরণতীর্থ' (যেখানে ১৯০৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পড়েছিল প্রভু শ্রীঅরবিন্দের পদরজ)। সম্পূর্ণ শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে প্রভূত উত্থান-পতনের মাধ্যমে 'হুগলী চুঁচুড়া শ্রীঅরবিন্দ ভবন' তিনটি কেন্দ্র সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। দিব্যের অনন্ত করুণা ব্যতীত এতবড় ঘটনা কখনই সম্ভব হ'ত না, একথা সত্য হলেও, বিশ্বনাথদার ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ পরিচালনাকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাতেই হয়। বহুজনের বহু অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেও বলতে হয় বিশ্বনাথ রায় ছিলেন প্রধান সেনাপতি।

শুধু কেন্দ্র গড়ে তোলাই নয়, সেই কেন্দ্রগুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য একের পর এক কর্মধারার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। রাজকীয় মর্যাদায় সুদূর পণ্ডিচেরী থেকে আনা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-দেহাংশ এবং সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা হুগলী ভবনে সংস্থাপিত হয়েছে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ সালে। পরম মর্যাদায় শ্রীমায়ের পদস্পর্শ ধন্য পাদুকা-যুগল নবনির্মিত দোতলার ঘরে রক্ষিত হয়েছে ২৪শে এপ্রিল, ১৯৯১-এ। নিতান্ত ব্যতিক্রমীভাবে শ্রীমায়ের পবিত্র দেহাবশেষ হুগলী ভবনের প্রায় শীর্ষে সংরক্ষিত হয়েছে ২০শে নভেম্বর, ২০০৪ সালে। ২৯শে মার্চ, ২০১৫, শ্রীঅরবিন্দের আবক্ষ মর্মর মূর্তির প্রতিষ্ঠা হুগলী ভবনকে দিয়েছে অসামান্য পূর্ণতা। বছরের পর বছর শুধু হুগলী ভবনের প্রধান কেন্দ্রেই নয়, শাখা কেন্দ্রগুলিতেও বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান (সাংস্কৃতিক, আলোচনা সভা, কর্মী সম্মেলন, যুব সম্মেলন, পাঠচক্র, প্রভৃতি) সার্থক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব ব্যতীত নিয়মিত ছোটদের চিত্রাঙ্কন শিক্ষা, সঙ্গীত শিক্ষা, সংস্কৃত ও ইতিহাস চর্চা, যোগব্যায়াম-ক্যারাটে-জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষাদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি বিদগ্ধ পণ্ডিত, সাধক ও বিভিন্ন বিষয়ে

গুণীজনদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগও ভবনের কর্মীরা বহুবার পেয়ে ধন্য হয়েছেন। এই সমস্ত কর্মধারার মূলেও অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদ্যোগ অবশ্যই স্বীকার্য।

বহু বছর মায়ের কাজে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার সৌভাগ্যে খুব কাছ থেকে তাঁকে জানার সুযোগ হয়েছে। 'হুগলী চুঁচুড়া শ্রীঅরবিন্দ ভবন'-এর নিজস্ব বাড়ি নির্মাণের পিছনে বিশ্বনাথদার উদ্যম ছিল প্রশ্নাতীত। কতদিন যে এই কর্মীর সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে একখণ্ড জমির সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরেছেন তার ইয়ত্বা নেই। ক্লান্তি বা হতাশায় তিনি সংকল্প থেকে বিচ্যুত হননি এবং আমাকেও হ'তে দেননি। বহু ব্যর্থ অনুসন্ধানের পরে শেষপর্যন্ত যে ভূ-খণ্ডটি পাওয়া গেল, চলিত কথায় তাকে বলে 'একেবারে নাকের ডগায়'। না হ'লে ঐ প্রাপ্ত জমিটি (খাটাল করে রাখা) এই কর্মীর বাড়ির একেবারে প্রায় সামনেই বহুদিন ধরেই পড়েছিল, অথচ কারুর দৃষ্টিই সেদিকে কখনও পড়েনি। আসলে সবই মায়ের খেলা। 'আদ্যা অদ্বিতীয়া পরাশক্তি' দিব্য-জননী যখন দেখলেন আমাদের ভবন গড়ে তোলার আস্পৃহায় কোন খাদ নেই, তখনই তিনি অবহেলিত জমিটি চিহ্নিত করে দিলেন , যা মহাকালের বুকে অক্ষত হয়ে থাকবে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের দিব্য-তনু ধারণ করে। এ কি অলৌকিক নয়? পরবর্তী পর্যায়ে বহু প্রচেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করে জমি রেজিস্ট্রি হয় ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৭ সালে। রেজিস্ট্রির আগে এই কর্মীকেই সুযোগ দেওয়া হয় ১০০ টাকা নিজের থেকে দিয়ে সেটলার (Settler) হিসেবে শ্রীঅরবিন্দ ভবন নির্মাণের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে। এই সমস্ত পরিকল্পনাই শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথদার, যাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

কর্মসূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার মতবিরোধ হলেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংকীর্ণতা দিব্য-কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রকে কখনই করেনি কলঙ্কিত। আমাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রভূত সুযোগ দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি, বিশ্বনাথদা বিভিন্ন কেন্দ্রে ভাষণ দেওয়া ও সেখানকার পরিচালনা ব্যবস্থায় পরামর্শ দেওয়ার কারণে বহু ভক্ত ও অনুরাগীর প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। ফলে হুগলী ভবন গড়ে তোলার জন্যে ঐ মানুষেরা বিশ্বনাথদার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁদের সাধ্যমত আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। ঐ অর্থ পরে (চেকে বা নগদে) এই কর্মীর হাতেই জমা পড়েছে। কোন্ ব্যাঙ্কে কোন্ উদ্দেশ্যে কতটা টাকা রাখা প্রয়োজন বলে জানিয়ে দিয়ে বাকি টাকা পাওনাদারদের পাওনা মেটানোর জন্য সব দায়িত্ব আমার উপরই ছেড়ে দেন। কখনও জানতে চাইতেন না টাকা ঠিকমত ব্যয় হচ্ছে কিনা। ভবনের লকারে বেশি টাকা না রেখে আমার কাছেই তা রেখে দিতে বলতেন। দু'একজন আমার সততা নিয়ে তাঁর কান ভারী করতে এলে তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিতেন, "ত্রিদিবকে আমি যতটা বিশ্বাস করি নিজেকেও ততটা করি না।" শ্রীমায়ের অনন্ত করুণায় আমি কখনও তাঁর বিশ্বাসের অমর্যাদা করিনি। আসলে আমাদের

পরস্পরের প্রতি ছিল অগাধ বিশ্বাস, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ।

প্রসঙ্গান্তরে একটি বিষয় উল্লেখ করি। স্থায়ীভাবে কলকাতা যাবার পরে বিশ্বনাথদার সঙ্গে ভবন সংক্রান্ত ব্যাপারে মাঝে মাঝে ফোনে আমার কথা হ'ত। একবার হুগলী ভবনের কোন সংকটজনক পরিস্থিতিতে তাঁর মতামত জানতে চাইলে আমাকে হতবাক করে দিয়ে বললেন, "আপনার সঙ্গে তো মায়ের সহজ সম্পর্ক রয়েছে।" তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য হ'ল মায়ের কাছেই যেন জেনে নিই সমস্যা সমাধানের উপায়। বস্তুতপক্ষে নিজের স্থূল দৃষ্টি ও স্বল্প বুদ্ধিতে মায়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, বলা ভাল, সে সৌভাগ্য থেকে আজও বঞ্চিত বলে মনে করি। তাহলে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন ওঠে, হয় বিশ্বনাথদা তাঁর দূরদৃষ্টিতে আমার ও মায়ের নিকট সম্বন্ধের বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন, নতুবা নিছক মজা করার জন্য সেকথা বলেছিলেন। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর অভিমত জানতে চাইলে তিনি আমার সঙ্গে এতটা রসিকতা করতে পারেন বলে বিশ্বাস করি না। এই ঘটনাটা আপাতক্ষুদ্র হলেও আমার কাছে চির রহস্যময়ই রয়ে গেল। শ্রীমায়ের সঙ্গে আমার 'সহজ সম্পর্ক' সত্যিই আছে কিনা জানিনা; তবে নিঃসন্দেহে মায়ের সঙ্গে বিশ্বনাথদার সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর (এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস)।

হুগলীর ট্রাস্টবডি গঠনের সময় ৫ জন ট্রাস্টির মধ্যে পরম শ্রদ্ধেয় হিমাংশুদাকে (হিমাংশু নিয়োগী) সভাপতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়। হুগলী শ্রীঅরবিন্দ ভবনের শৈশবে হিমাংশুদার মত বিরাট ব্যক্তিত্বকে একেবারে মাথায় বসিয়ে বিশ্বনাথদা ভবনের ভিতকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। আর ৪ জন ট্রাস্টির মধ্যে বয়স্কদের (তুলনামূলকভাবে বয়স্ক) ৩ জনকে সাধারণ ট্রাস্টির পদে বৃত করে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী এই কর্মীকে 'ম্যানেজিং ট্রাস্টি' মনোনীত করেন (কর্মীর একান্ত আপত্তি সত্ত্বেও)। যে পদে বিশ্বনাথদা অধিষ্ঠিত হ'লে সকলেই অনেক বেশি আনন্দিত হতেন, তা অবহেলায় পরিত্যাগ করে আমার মতো নিতান্ত এক অনভিজ্ঞকে সেখানে নিযুক্ত করেন। তবে আমায় কথা দিয়ে বলেছিলেন, "আমি সব সময় পাশে থাকব।" সেকথা তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। ট্রাস্টবডি রেজিস্ট্রি হয় ২৯শে মার্চ, ১৯৮২ সালে। সুদীর্ঘ এতগুলি বছরে (২০২৫ সাল পর্যন্ত) ট্রাস্টবডির বহু পরিবর্তন ঘটলেও বিশ্বনাথদার মনোনীত 'সেই আমি' আজও ম্যানেজিং ট্রাস্টিরূপে বর্তমান। হয়তো তাঁর দূরদৃষ্টিই এইসব করিয়েছিল, যেখানে মায়ের সম্মতি অবশ্যই ছিল। বারে বারে দেখেছি 'শ্রীমায়ের আশীর্বাদ' ছাড়া তিনি কোন কাজ করতেন না।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস। প্রতি বছরের মত এই বছরেও (১৯০৯ সালে চুঁচুড়ায় শ্রীঅরবিন্দের শুভ পদার্পণ উপলক্ষে) ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই সেপ্টেম্বর হুগলী ভবনের বাৎসরিক অনুষ্ঠান। অন্যান্য বছরের মত ৩রা রাতেই বিশ্বনাথদা ভবনে

এসেছেন। ৪ঠা ও ৫ই রবীন্দ্রভবন ও হুগলী ভবনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন এবং বহুজনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু ৫ই সেপ্টেম্বর প্রায় মধ্যরাতে অসহ্য যন্ত্রণায় বিশ্বনাথদা যখন কাতর হয়ে পড়েন তখন ওখানে উপস্থিত কর্মীরা উপায়ান্তর না দেখে তাঁকে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করেন। হাসপাতালে যাবার আগে তাঁর নির্দেশ ছিল পরের দিনের অনুষ্ঠানে যাঁরা আসবেন তাঁদের কাছে যেন কোনভাবে প্রকাশ না পায় যে তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেছেন। অথচ পরের দিনের, অর্থাৎ ৬ই সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠান মূলতঃ প্রভু শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহাবশেষ সংস্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিনে আসার কথা বহু ভক্ত ও অনুরাগীর বিভিন্ন স্থান থেকে এবং তাঁদের অনেকেই বিশ্বনাথদার সাহচর্যে আসতে চাইবেন। তাছাড়া, মধ্যাহ্নের আহারের পর প্রতিবারের মত বিশ্বনাথ রায়ের আবেগমথিত ভাষণ শোনার জন্যে সকলেই উদ্গ্রীব হয়ে থাকবেন। এমত কঠিন পরিস্থিতি কিভাবে সামলানো যাবে সে কথা চিন্তা করে ভবনের পরিচালক কর্মীরা রীতিমত বিহ্বল হয়ে পড়েন। সকাল ১০টা থেকে নির্ধারিত সূচী অনুসারে ৬ তারিখে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ক্রমে মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণের সময় এসে যায়। কর্মীরা প্রমাদ গুণতে থাকেন আহারের পরবর্তী পর্যায়ে কি হবে! এই সময় আকস্মিকভাবে উষ্কখুষ্ক অবস্থায় স্বয়ং বিশ্বনাথদাকে দু'একজন ভবন কর্মীর সঙ্গে ভবনে প্রবেশ করতে দেখে এই প্রতিবেদক অন্যান্যদের মত স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। সমস্ত শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় ভবনে এসেছেন। সারারাত যে মানুষ নিদ্রাহীন হয়ে স্যালাইন, ইঞ্জেকশন, ওষুধের উপর নির্ভর করে তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন, সেই মানুষ ভবনে উপস্থিত হয়েছেন দায়িত্ব পালনের (বক্তৃতা দেবার) জন্যে। অসাধারণ তাঁর মনের জোর ও কর্তব্যবোধ। একথা সত্য যে মায়ের উপর প্রবল আস্থা ব্যতীত এমন কাজ করা কারুর পক্ষেই হয়তো সম্ভব নয়। সেদিন বাক্‌রুদ্ধ এই কর্মীর মনে হয়েছিল শ্রীমায়ের একান্ত কৃপাধন্য বলেই অবিশ্বাস্যভাবে এতবড় অসুস্থতার মধ্যেও তিনি ভবনে আসতে পেরেছেন। স্বয়ং শ্রীমায়েরই প্রতিভূ-রূপী এই মানুষটিকে সেদিনই প্রথম তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করে থাকতে পারিনি। এ নিছক আবেগ ছিল না, ছিল মাতৃভক্ত এক সেবকের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসারই নিদর্শন। আশ্চর্যের বিষয়, নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্বনাথদা যখন অবলীলাক্রমে তাঁর স্বকীয়ভাবে বক্তৃতা করে গেলেন তখন কার সাধ্য বলে যে তিনি কি ভয়ংকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন গত রাত থেকে!

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় হুগলী ভবন ছাড়া আরও অনেক কেন্দ্রের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। শুধু বক্তৃতা করা নয়, সাংগঠনিক পরামর্শদাতা রূপে তিনি বহুজনের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। প্রকৃত অর্থেই

বহু গুণের আধার ছিলেন। তাঁর মত সুবক্তা খুব কম পাওয়া যায় , যিনি সর্বস্তরের শ্রোতার অন্তর অক্লেশে স্পর্শ করতে পারতেন। 'ত্রিজ রায়' ছদ্মনামে তাঁর অসংখ্য লেখা শ্রীঅরবিন্দ পরিমণ্ডলে বিশেষভাবে সমাদৃত। গবেষক হিসেবে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা অনেকেই জানেন। তাঁর বিচক্ষণতা, সহমর্মিতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও নিরলস পরিশ্রম করার মানসিকতা তাঁকে সকলের প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল।

যা অনেকের কাছেই অজানা , তিনি ছিলেন নাট্যকার ও অভিনেতা। তাঁর প্রয়াণের মাত্র কিছুদিন আগে হুগলী ভবনের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২০২৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবাত্মক জীবনের উপর রচিত তাঁর নাটক 'যে পথে চরণচিহ্ন তাঁর' (নামের কিছু পরিবর্তন হয়েছে) মঞ্চস্থ করতে তিনি উদ্যোগী হ'ন কিছু কর্মীর অনুরোধে। যথেষ্ট অসুস্থতার মধ্যেও তিনি নাটকটির যথাসাধ্য পরিমার্জনা করেন স্বহস্তে। শুধু তাই নয়, তাঁর ইচ্ছা ছিল নাটকের অন্যতম মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করার। কিন্তু অকাল প্রয়াণের (২২শে মে, ২০২৩) কারণে তা আর বাস্তবায়িত হয়ে উঠলো না। তবে নাটকটি মঞ্চস্থ করার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহের কারণে হুগলী ভবনের কর্মীরা গভীর শ্রদ্ধাবোধ থেকে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের নির্ধারিত দিনেই (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৩) রবীন্দ্রভবনে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এই কর্মীর উপর দায়িত্ব বর্তায় বিশ্বনাথদা যে চরিত্রটিতে রূপদান করতে আগ্রহী ছিলেন সেটি করার। অলক্ষে তিনি নাটকটি দেখেছেন কিনা জানা নেই, কিন্তু কর্মীরা খুশি হয়েছি এই কারণে যে, 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা' করে তাঁকে আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছি। কিন্তু বেদনার কথা এই যে, তাঁর অভিনয় দেখার অথবা বলা যায় অভিনেতা হিসেবে তাঁকে দেখার দুর্লভ সুযোগ থেকে সকলে চিরতরে বঞ্চিত হলাম।

শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক বিশ্বনাথদা বেশ কিছুদিন হ'ল আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও সকলের মানসলোকে তিনি দেদীপ্যমান তাঁর নিরলস দিব্যকর্মের সুবাদে। তাই এই মহান কর্মীকে জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা, অমেয় ভালবাসা ও অশেষ প্রণাম।

A Mad Child of The Mother

Belarani Satpathy,
Matrusadhana Kendra, Rajgangpur

Mother's work was the only vow he had taken in his life. Every activity of his life he had taken as a service to the Mother. As written in "The Mother" by Sri Aurobindo "...surrender of oneself and all one is and has and every plane of the consciousness and every movement to the Divine and the Shakti"........., our beloved, Revered Biswanath da Prof. Biswanath Ray followed this word by word in his life.

As a pleasant reminiscence, my first meet with Bishwanathda goes back to 1986 during January 24,25and26, when the State Level Women's Study Circle Conference was held at Rajgangpur. To help in this Mother's work in Odisha, it was his first arrival to Odisha and on that day, a subtle bridge was established, between Odisha and West Bengal. Over a period of time, this bridge became more and more concrete and strong and helped in tremendous progress in Mother's work in both the states in a well co-ordinated manner with mutual help from both sides. In the same year (1986) Dr. Vijayinee Mahapatra (Vijayinee Apa) and Dr. Shyama Kanungo (Shyama Apa) had also been to Rajgangpur and they invited Biswanathda to join the April conference on 4th, 5th, 6th and 7th of April for State Level Sri Aurobindo Study Circle Meet at Matru Bhavan, Cuttack. And thus began the connection of Biswanath Dada with Odisha. He joined the women's study circle conference at Rajgangpur and the State Level Sri Aurobindo Study Circle Meet at Matru Bhavan, Cuttack. After that he continuously came to

different districts of Odisha for Mother's work. He continued his service joining various Annual conferences, Relics installation annual days in different Study circle centres and in other activities as a service to the Mother travelling all over Odisha. It became a convention to welcome Dada to Rajgangpur on 18th April every year to observe the Relics Installation Annual Day and also on September 29th to observe the Annual Day of Women Study Circle (Matru Sadhana Kendra Rajgangpur).

It is quite rare to observe every act of an individual as a service to the Mother with full Surrender, Sincerity and Love. We cannot compare anybody else as a better person to discuss 'The Mother', by Sri Aurobindo as was done by Dada.

He was an extraordinary person. Despite being a professor and being such an intelligent person his life was very simple and his personality was very warm, soothing to everybody. After completing his duty in the college, he would board the train at night to reach Rajgangpur in the morning, he would then complete his daily chores as soon as possible and join the morning session. He would also join the evening session and then again board the train to reach Kolkata for the next day college. He would always travel in the sleeper class and whenever asked he would say, "Why should I travel in AC compartments, Mother is giving me money not for unnecessary expenditures. I'm not coming to enjoy luxury, I'm coming here to do Mother's work. The money is for Mother's work". We could see the Indian culture and the bengalee attire on him always. He would always put on a Dhoti and Kurta in the most elegant manner, and during winter we could see him wrapped with a shawl.

I would meet Dada all over Odisha for many of the Mother's work and whenever he saw me, he would say, "Oh, Rajgangpur!", then he would ask about everybody. "How are you and how is everybody at Rajgangpur? He'll ask about Jagabandhu Mousa, Sushila Mausi. As Rajgangpur was his first venue and also an entry door for him to join the service of the Mother in Odisha he remembered Rajgangpur till he breathed his last.

On one such occasion during the morning session conducted in one of the programme at Rajgangpur, he told me, " Bela, We will discuss the fourth chapter of The Mother, which is on money but

why have you chosen this topic?" I said, "Dada, money has become much powerful now-a-days and it has kept everybody under its control not only in the family, but in the whole world. Every one is running after money and it is not helping us to come together to collaborate with each other, rather we all are getting separated from each other". Then he said, "If we want to have a proper discussion, it would take much time, at least 7 days. Anyway, how can I discuss it in 2 hours? Anyway as you have surrendered the program at the Mother's feet so I would discuss about this, calling the Mother, remembering her."

If I continue to remember and narrate all the incidents it would be a magazine by itself. I would just recall a few incidents of his collaboration in Mother's work. Once I said to him, "Dada, I've not visited the Alipore jail.I wish to visit at least once". He said, "Maa ke antor diye daak, nischoy darshan hobe (Call the Mother with all your heart, you would be able to visit someday)". He asked me to remind him one or two months before the Lord's birthday. Dada talked to the people who are looking after the Lord's birthplace at Kolkata Bhavan and he personally made all the arrangements. So I could visit Alipore jail. It is for him, I could visit many places in West Bengal and collaborated with many people in Mother's work. His wife, (whom we call Boudi), had also visited many places in Odisha taking pleasure in doing Mother's service at Odisha. During the COVID pandemic, when it was the time to celebrate the Annual Day of the Women's study circle (Matru Sadhana Kendra) at Rajgangpur, on 29th September we decided that we would observe the auspicious day anyhow, few would remain in the Ashram and the rest of the program would be online. The programme would also include recitation of Savitri from 6 o'clock to 7 o'ciock after that, we would connect over phone for online programme.

We contacted many persons who had already been to Rajgangpur for Mother's work. All were very eager to read Savitri and they were given the page number they were to read. A few of them joined from Sri Aurobindo Ashram Pondicherry too, We contacted Doctor Alok Pandey and Nirmal Sahu and many more who joined happily and read the epic Savitri. Dada was more than happy to know this entire thing and joined the recitation of Savitri waking up

from 4 o’ clock in the morning.

He said, “Bela, during Corona, you were the first one from Odisha to contact me to do Mother’s service. I will recite Savitri. And I would love to have a discussion over phone on any of the topics.”

During the Dusserah we contacted dada and requested him to discuss on ‘The Mother’. He agreed and told us ‘’From Panchami to Bijoya Dashami We would read those chapters and would link with you for online discussion.’’

And he was much happy. He would call and ask me what we will discuss all the days from Panchmi to Bijoya Dashami. He had given away his whole life for Mother’s service. In 2023, I called him to request to join on 18th of April, to observe the 50th Anniversary of Sri Aurobindo Study Circle Rajgangpur. He was very happy and gave his consent. And asked on which topic he would discuss. We knew that he was not healthy. But he would not visit the doctor because he was afraid the doctor may not allow him to travel.

In the month of April 2023 he called me and said, “I’m going to Cuttack on sixth and seventh during the April conference, and I would come to Rajgangpur on 18th April after returning from Cuttack”. After returning from Cuttack he suffered from fever and he was very weak, I called him on 16th April on his birthday. Everybody, in Pathamandir, asked him not to travel to Rajgangpur, but he said ‘I have promised Bela to join in this Mother’s work. I would definitely go’. On 18th April 2023 we went to the railway station to receive Dada, he was not able to walk properly and was too feeble. Looking at his condition. I asked, “Dada, did Boudi allow you to come here in this condition?”He said, “I would not listen to anybody when it comes to do the Mother’s work”. The person who travelled with him from Kolkata as his escort told me that he had not slept the whole night on train, he would lie down or sit, but could not sleep and he was not eating anything.

He had not visited Rajgangpur for many years. So when he saw the guest house he was much happy.

He asked for breakfast and we served him with Idly, which he ate happily. Later on, I got to know from Boudi that he loved Idly

very much. He said he would take some rest and would join the conference after Anadi Bhai's discussion. During that time, his haemoglobin percentage was 3 to 4 still the way he spoke everybody remember. When he had visited the April conference in Cuttack, he had asked Kapil bhai," If I'm coming to Rajgangpur on 18th of April will you help me board the train". It was his vow to come to Rajgangpur. It was Rajgangpur where he started his work, his service for The Mother. After his discussion on that day, he said, "I started the Mother's work in Odisha at Rajgangpur and it is Rajgangpur where my work gets over." We had never thought that he would leave us in a few days time. On 19th of April, he called me to inform that he reached Kolkata and asked me to continue the Mother's work and asked always to start the work in the decided time. After returning from Rajgangpur, he continued his work both online and offline. And moving to different places of West Bengal too. His inspirations and his sensitivity helped to set up many centers in different districts of West Bengal and Mother's work continues. He was a mad child of the Mother who could not live without Mother's work. He had taken the vow for the Mother's work all through his life.

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে বিশ্বনাথদা

দিলীপ কুমার চ্যাটার্জী,
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা

১৯৯৪ সালে বিশ্বনাথদা পাঠমন্দিরের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হন। হিমাংশুদার সনির্বন্ধ প্রচেষ্টায় তিনি অবশেষে পাঠমন্দিরের সেক্রেটারি হতে রাজি হন। তাঁর নীতিই ছিল কোন পোর্টফোলিও না নেওয়া। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের গুরুত্ব এবং হিমাংশুদাকে ফেরাতে না পেরে তিনি শেষ পর্যন্ত এই পদ গ্রহণে রাজী হন।

প্রথমদিকে আশ্রমে Offering দিতে হিমাংশুদা সহ অন্য কর্মকর্তারা যেতেন। ১৯৯৮ সালে বিশ্বনাথদা আমাকে বলেন, 'এখন থেকে তুমি February মাসে আশ্রমে মায়ের Offering নিয়ে যাবে। তখন থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত চলেছিল।

মা- শ্রীঅরবিন্দের উপরে অগাধ ভক্তি ছিল। কোন বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় কোন বই দেখে দিতেন না এবং সময়-জ্ঞানও প্রখর ছিল। ৪৫ মিনিট বা এক ঘন্টার বক্তৃতা ঘড়ি না দেখেই শেষ করতেন।

বাংলায় তো বটেই, উড়িষ্যাতেও স্থানীয় লোকেদের উৎসাহ দিয়ে মা- শ্রীঅরবিন্দের সেন্টার গড়ে তোলায় সহযোগিতা করেছেন। তা যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তার দিকেও নজর রাখতেন।

প্রথম দিকে আশ্রমে একটা নিয়ম ছিল, কোন সেন্টারে মাটির উপরে ছাড়া সমাধি বেদী করা যাবে না, যার জন্য Relics দেওয়া হত না। বিশ্বনাথদা শেষ পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের Foot-stool অনেক কথাবার্তা বলে আশ্রম থেকে পাঠমন্দিরে নিয়ে এসেছিলেন। যা এখনও পাঠমন্দিরে Glass case, এর মধ্যে সুন্দরভাবে রক্ষিত আছে। হাওড়া স্টেশন থেকে মোটরে করে নিয়ে আসা হয়। প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছিল। পাঠমন্দিরে স্থাপনের দিনও প্রচুর লোক হয়েছিল।

বিশ্বনাথদা নিজে তো পাঠমন্দিরে বক্তৃতা দিতেন, তা ছাড়াও বেশ কয়েকজন

বক্তাকে সাপ্তাহিক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন, যা বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত চালু ছিল।

২০১৬ সালে আশ্রম কর্তৃপক্ষ পাঠমন্দিরে Relics আনার অনুমতি দেয়। Relics আনার জন্য পাঠমন্দিরের বেশ কয়েকজন সদস্য বিশ্বনাথদার সাথে আশ্রমে গিয়েছিলেন। ১৪ই আগস্ট, ২০১৬ সালে Relics পাঠমন্দিরে আনা হয়। পাঠমন্দিরে আশ্রমের দিলীপ দত্ত, ভবনের বিশ্বজিত গাঙ্গুলী, বিশ্বনাথদা এবং আমাদের কয়েকজনের উপস্থিতিতে Relics সমাধিতে স্থাপন করা হয়।

বিশ্বনাথদার সময় পাঠমন্দিরের বাড়ি একতলা থেকে তিনতলা, ছাদ ও বাইরেটা দু'বার সারানো হয়েছে। আশ্রমের বাড়িগুলি যে রঙ করা সেইরকম করা হয়েছে।

পাঠমন্দিরে নিজস্ব জলের সংযোগ ছিল না, কফি হাউসের জলের লাইন থেকে নিতে হ'ত। মাঝে মাঝে ওরা কল বন্ধ করে দিত, তাতে ভীষণ অসুবিধা হ'ত। সেইসময় পৌরসভাকে জানিয়ে পাঠমন্দিরের সামনের রাস্তার নীচের লাইন থেকে মেশিন বসিয়ে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নীচতলার একদিকের দেওয়াল ভেঙে মেশিন বসান হয়েছিল।

ঐ সময়ই Book Sales Counter, Miscellaneous Counter গুলি নতুন করে সাজানো হয়। এই Counter দুটির উপরে, বাথরুম, রান্নাঘরের উপরে এবং নীচে বাইরের দরজার উপরে মাচা করা হয়েছিল। হলঘরের ভিতরে বেশ কিছু আলমারী, র‍্যাক, পড়ার টেবিল এবং চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হলঘরের ভিতরের মেঝেতে মার্বেল পাথর বসানো হয়েছিল।

এত সব কিছু করা সম্ভব হয়েছে মা- শ্রীঅরবিন্দের অশেষ কৃপায় এবং বিশ্বনাথদার আন্তরিক অনুপ্রেরণায়।

শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের বাণীবাহক বিশ্বনাথদা

সন্দীপ মজুমদার
শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র, উত্তর কলকাতা

শ্রীঅরবিন্দ পরিমণ্ডলে এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানেও অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় একজন বাগ্মী হিসেবে বহু মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন।

আমার এবং ভাই মলয়ের সাথে বিশ্বনাথদা'র পরিচয় ১৯৮৫ সালে। তিনি তখন শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীর ক্লাস করতেন। প্রথম দিনের ক্লাসেই আমরা মুগ্ধ। বিশ্বনাথদা'র বক্তৃতা খুব সহজেই হৃদয়কে স্পর্শ করলো। খুব অল্প সময়ে বিশ্বনাথদা'র সাথে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা চলতে থাকলো। সেই সময় তিনি আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে একটি ক্লাস করেছিলেন। সেই থেকেই আমাদের বাড়িতে তিনি আসতেন।

১৯৮৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ ভবনে বিশ্বনাথদা শ্রীঅরবিন্দের 'The Mother' গ্রন্থের উপর ক্লাস নিতে শুরু করলেন। দীর্ঘ ৫ বছর এই ক্লাস তিনি করেছিলেন। এমন অনবদ্য ক্লাস এর আগে আমরা শুনিনি। এইসময় থেকেই বিশ্বনাথদা'র বক্তৃতা আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়।

এই একাত্মতা বাড়লো আরো যখন হুগলীর জগুদাসপাড়ায় Relics আসার আয়োজন শুরু হল। তিনি আমাদের যেভাবে বলেছেন, সেইভাবে আমরা ওনার সাথে কাজ করেছি। হুগলীতে Relics প্রতিষ্ঠা একটা ঐতিহাসিক স্মরণীয় বিষয় কারণ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কেন্দ্রগুলি এই মহৎ কর্মে জড়িত ছিল। Relics নিয়ে যে দীর্ঘ Procession তা চিরস্মরণীয়।

১৯৯০ সালের ৪ঠা এপ্রিল বিশ্বনাথদা শ্রীঅরবিন্দ ভবনে শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' মহাকাব্য নিয়ে ক্লাস শুরু করেন। আমরা যারা ক্লাস করতাম তারা জানি, এমন প্রাঞ্জল ক্লাস এর আগে শুনিনি। বিশ্বনাথদা যেখানে বক্তৃতা করতে যেতেন আমরাও সেখানে যেতাম।

বিশ্বনাথদা নিয়মিতভাবে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, শ্রীঅরবিন্দ ভবন, শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অব কালচার, শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলীতে ক্লাস নিতেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব কেন্দ্রে এবং উড়িষ্যার বহু কেন্দ্রে তিনি বক্তৃতা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরীতে বহু বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন।

তিনি শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের সম্পাদক ছিলেন। এইসময় পাঠমন্দিরের পরিবেশগত পরিবর্তন খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশেষতঃ বিস্তৃত কাজের মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য দুটি বই প্রকাশনা করেন — 'হে চিরদিনের' এবং 'হে সবিতৃবাণী'। তিনি নিজেও অনেকগুলি বই লেখেন ত্রিজ রায় পরিচয়ে।

আমাদের শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র, উত্তর কলকাতা প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৯৩ সালের ২রা মে। বিশ্বনাথদা'র থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা এই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিশ্বনাথদা এবং জয়াদির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ সাধনায় বিশ্বনাথদা একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় অগ্রণী সাধক। তিনি বক্তা, লেখক, সংগঠক, গবেষক , পশ্চিমবঙ্গের অনেক কেন্দ্রের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীঅরবিন্দ-মায়ের লেখার বিস্তৃত ক্ষেত্রে তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অবগাহন করে পূর্ণযোগ সাধনার লক্ষ্য এবং উপায়কে আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বিশ্বনাথদা হলেন শ্রীঅরবিন্দ-মায়ের সাধনার Living Demonstration.

বিশ্বনাথদা সম্পর্কে মায়ের লেখা থেকে বলা যায় :

"এক তীব্র আস্পৃহা,
নিখুঁত মনসংযোগ,
এক নিরবচ্ছিন্ন উৎসর্গ।"

আমাদের বিশ্বনাথদা

গৌতম দে
হাবরা

শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে যে নামটির সাথে কম-বেশি সকলেই পরিচিত , সে নামটি হল আমাদের প্রিয় বিশ্বনাথদা (অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়)। বাংলার প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রেই তিনি গিয়েছেন এবং হাবরা কেন্দ্রের সাথে বিশ্বনাথদার ছিল এক গভীর সম্পর্ক। বিশ্বনাথদার সম্পর্কে লিখতে গেলে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়টি সামনে চলে আসবে এবং সেই কারণে প্রথমেই পাঠকদের কাছে মার্জনা চাইছি।

বিশ্বনাথদার সাথে কবে থেকে আমাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তার সঠিক সময়কাল মনে নেই। তবে আমার সেজদা'র (উত্তম দে) সাথে তাঁর প্রথম আলাপ হয় কলকাতা শ্রীঅরবিন্দ ভবনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শীতকালীন আবাসিক ক্যাম্পের কোন একদিন। সম্ভবতঃ সময়টি ছিল ১৯৮৪-৮৫ সাল। উত্তমের লেখা পোস্ট কার্ডের একটি চিঠি পেয়ে বিশ্বনাথদা হাবরাতে আসার সম্মতি দেন। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথির কোন এক সরস্বতী পুজোর দিনে বিশ্বনাথদা প্রথম হাবরা শ্রীঅরবিন্দ কর্মী সংঘ (মাতৃ মন্দির)-এ আসেন এবং সেখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পথ হেঁটে আমাদের বাড়িতে আসেন। ঐদিন মাতৃমন্দিরের গর্ভগৃহে দাদা প্রথম তাঁর বক্তব্য রাখলেন। এক নব বন্ধনে যুক্ত হলেন এই কেন্দ্রের সাথে।

আমার তখন বয়স অল্প। আমাদের বাড়ির খোলা বারান্দার টিনের চালের নীচে আমাকে সঙ্গে নিয়ে দাদা রাত্রিযাপন করেছেন। এমন একজন অসাধারণ ব্যক্তির এরকম অতি সাধারণভাবে মিশে যাওয়া , কেবলমাত্র দাদার পক্ষেই সম্ভব। যে কোন পরিবেশেই দাদা মানিয়ে নিতে পারতেন , এটাই ছিল তাঁর বিশেষ বিশেষত্ব।

ধীরে ধীরে দাদার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে উঠলো। দৈনন্দিন চলার পথে অনেক কিছুই দাদার সাথে আলোচনা করতাম। দাদা মূল্যবান পরামর্শ

দিতেন। যখন আমার বড় শ্রীমানের হাতে-খড়ির সময় এলো, দাদাকে জানালাম। দাদা সম্মতি দিলেন। ২০০৭ সালের ২৩শে এপ্রিল দাদা আমাদের বাড়ি চলে এলেন এবং রাতে থাকলেন। পরের দিন, অর্থাৎ ২৪শে এপ্রিল (পণ্ডিচেরীতে শ্রীমায়ের স্থায়ীভাবে আগমনের দিন , দর্শন দিবস) সকালে হাতে-খড়ি পর্ব মিটে যাওয়ার পর দাদা মাতৃমন্দিরের অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। শুধু হাতে-খড়িই নয়, বাপ্পু এবং দীপ্পু (আমাদের ছোট শ্রীমান) কোন্ স্কুলে ভর্তি হবে , ইত্যাদি সব ব্যাপারেই দাদার সাথে আলোচনা করতাম।

হাবরা মাতৃমন্দিরের সাথে বিশ্বনাথদার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে , বিশেষ করে ১৯৯৬ সালে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহ-চিহ্ন নিয়ে আসাকে কেন্দ্র করে। ১৯৯৬ সালের ২রা আগস্ট দমদম বিমানবন্দর থেকে পূর্ব-নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহ-চিহ্ন সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরে পৌঁছালো। সর্বসাধারণের জন্য ৩রা আগস্ট, ১৯৯৬ তারিখ পর্যন্ত মাতৃমন্দিরের দোতলায় ধ্যানকক্ষে বিভিন্ন ফুলের সমারোহে Relics রাখা ছিল। বিশ্বনাথদার উদ্যোগেই শ্রদ্ধেয় হিমাংশু নিয়োগী মহাশয় ৪ঠা আগস্ট, ১৯৯৬ বিকেল ৪টার সময় পরম প্রভুর দিব্য দেহ-চিহ্ন প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর থেকে প্রতিবছর ৪ আগস্ট বিশ্বনাথদা মাতৃমন্দিরে আসতেন। বিকেল ৪টা থেকে ৪.১৫টা পর্যন্ত ধ্যানে অংশগ্রহণের পর তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখতেন। শুধুমাত্র কোভিডের কারণে ২০২০ সালে দাদার আসা হয়নি। এখানে বলে রাখা দরকার যে, কেবলমাত্র ৪ঠা আগস্টই নয়, মাতৃমন্দিরের অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানেই দাদা এসেছেন। বিশ্বনাথদার পরামর্শ মতই মাতৃমন্দিরের দোতলার ব্যালকনিতে শ্রীঅরবিন্দের মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। দোতলার ঘরেই শ্রীমায়ের পাদুকা বিভাগের উদ্বোধন করেন দাদা নিজেই। সর্বশেষ আমাদের অতিথি ভবন ''আশ্রয়''-এর দোতলায় নলিনী কান্ত গুপ্ত স্মৃতিকক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করেন আমাদের বিশ্বনাথদা। হাবরা শ্রীঅরবিন্দ কর্মী সংঘের পরিচালনায় শিশু বিদ্যালয় চালু করার সময় দাদার পরিষ্কার নির্দেশ ছিল আমরা যেন class-IV , এর ওপরে স্কুল নিয়ে না ভাবি। আসলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দিকেই ছিল দাদার সচেতন দৃষ্টি। যখনই ফোনে কথা হত সংঘের যেমন খোঁজ নিতেন, তেমনই জানতে চাইতেন সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা।

হাবরা-প্রফুল্লনগর মাতৃমন্দিরের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল প্রকাশনা বিভাগ (Publication Department)। সংঘের পক্ষ থেকে বই প্রকাশনার ব্যাপারেও তাঁর উৎসাহের অভাব ছিল না। বহু বই নিজেই বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। আশ্রম প্রকাশনা বিভাগের বই Life in Sri Aurobindo Ashram (Narayan Prasad) ছাপানোর দায়িত্ব যখন আশ্রম থেকে হাবরা সেন্টারকে দেওয়া হল , এই খবর শুনে বিশ্বনাথদা হাবরা কেন্দ্রের ম্যানেজিং ট্রাস্টি গোবিন্দলাল চক্রবর্তী মহাশয়কে উৎসাহ

দিয়ে বলেছিলেন যে , এই সুযোগ আমরা যেন নষ্ট না করি। আমাদের বার্ষিক সংখ্যা 'নূতন জগৎ' পত্রিকার বেশ প্রশংসা করতেন তিনি। সংঘের কর্মীদের সবসময় উৎসাহ দিতেন।

বিশ্বনাথদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে কিছু বলতেই হয়। যে কোন অনুষ্ঠানে দাদার উপস্থিতি ছিল এক অন্যরকম প্রেরণা। তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। দাদার বক্তব্যের ধরন বরাবরই ছিল অন্যরকম এবং সকলের কাছেই ছিল গ্রহণযোগ্য। তাঁর কণ্ঠস্বর, প্রতিটি শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণ আজও কানে বাজে। মা-শ্রীঅরবিন্দের কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্যই শ্রীমা দাদাকে এই পৃথিবীতে এনেছেন , এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সুললিত ছন্দময় আলোচনায় থাকত যেন মায়ের উপস্থিতি। এমন একজন সাধক মানুষের চলে যাওয়াটা শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে যে অপূরণীয় ক্ষতি তাতে কোন সংশয় নেই।

আজ বারবার মনে পড়ে দাদা হাবরা মাতৃমন্দিরের অনুষ্ঠানে যখনই এসেছেন অধিকাংশ সময়ই আমাদের বাড়িতে দাদার জন্য আয়োজন হত। এমনকি, দাদার জন্য বিছানার চাদর ইত্যাদি সারা বছর আলাদা করে রাখা থাকত। আসলে দাদা চাইতেন একটু বিশ্রাম নিতে। অনেকবার দাদার সাথে বৌদিও এসেছেন আমাদের বাড়িতে। এমনকি, দাদার মা-ও এসেছেন আমাদের বাড়িতে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও জিজ্ঞাসা করতে ভুলতেন না যে আমরা সকলে কেমন আছি, আমাদের মা কেমন আছেন। হোয়াটস্ অ্যাপে পাঠানো হাবরা মাতৃমন্দিরের পরম প্রভুর ছবি দেখে বলতেন , 'রোজই তোদের পাঠানো সমাধির ছবি দেখছি। আর মনে হচ্ছে যেন ওখানেই উপস্থিত আছি।'

প্রতি বছর আমাদের বাড়ির শ্রীমা জয়ন্তী উপলক্ষে দাদা আসার চেষ্টা করতেন এবং পরপর বেশ কয়েক বছর এসেছেনও। ২০২৩ সালের ২৬ মার্চ দাদা আসতে পারেননি আমাদের 'দে' বাড়ির অনুষ্ঠানে, অন্য জায়গায় কর্মসূচী থাকার জন্য। কখনই ভাবিনি ঐ বছরে কলকাতার শিশির মঞ্চের অনুষ্ঠানে দাদার সাথে শেষ দেখা হবে। প্রথমে দেখলাম দাদাকে ধরে মঞ্চে তোলা হল। পরে অবশ্য নিজেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মঞ্চে উঠে এলেন। সময়ের ফাঁকে আমাকে বললেন, "'নূতন জগৎ' পত্রিকার জন্য একটা লেখা দিতে হবে। তুই আমাকে একবার মনে করিয়ে দিস।" এটাই ছিল আমার প্রতি দাদার শেষ নির্দেশ। লেখা অধরাই রয়ে গেল। শিশির মঞ্চের বাইরে আমরা একসাথে বেশ কয়েকজন মিলে একটা গ্রুপ ছবি তুললাম।

স্থূল দেহে দাদা আর নেই ঠিকই, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে দাদা সর্বদাই বিরাজমান। দাদা শেষের দিকে সংঘের আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি নজর দেওয়ার কথা বারবার বলেছেন। সেন্টারগুলি যেন আর্থিক দিক থেকে সুরক্ষিত থাকে , এই বিষয়ে খুব ভাবতেন।

আর্থিক সুরক্ষার বিষয়ে সুপরামর্শ দিতেন। দাদা মাতৃলোকে চলে গেছেন মায়ের ইচ্ছায় এবং মায়ের ইচ্ছাতেই তিনি আবার ফিরে এসে মায়ের কাজে অংশগ্রহণ করবেন , এটাই আমাদের বিশ্বাস। যে বাণীটি দাদা প্রায় প্রতিটি বক্তৃতার শেষের দিকে উচ্চারণ করতেন সেই বাণী দিয়েই দাদার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য শেষ করব ,

"কতদূর এসেছি, আর কতদূর এইসব প্রশ্নেতে বিশেষ কোন লাভ নাই। মাকে কাণ্ডারী করে স্রোতে এগিয়ে চল, তিনি তোমাকে গন্তব্যস্থানে পঁহুছিয়ে দিবেন।"

\- শ্রীঅরবিন্দ

(শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি পত্র, ৩য় সংস্করণ,২০২২)

শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথদার স্মৃতিচারণ

সমীর কুমার দাস
মালদা

মালদা শ্রীঅরবিন্দ সেন্টার স্থাপন করার পরিকল্পনার শুরু থেকে (১৯৯১) স্থাপন করা (১৯৯২), এবং তাকে বিকশিত করা, দীর্ঘ প্রায় ২৮ বছর যুক্ত ছিলেন বিশ্বনাথ দা। (সঙ্গে যাঁদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রী অশোক রায় শিলিগুড়ি, বর্তমানে পন্ডিচেরি আশ্রমে, শ্রীসুধীর দেওয়ান, আশ্রমিক, শ্রী সন্তোষ নাথ, শ্রীশৈলেন জোয়ারদার, শ্রী দিলীপ রায়, শ্রী সলিল দাস)। শেষবারের মতো তিনি এখানে আসেন দিব্যাংশ সংস্থাপনের ২৫ বছর উদ্‌যাপন হিসাবে (১৭ই জানুয়ারি ২০১৯)। শ্রীঅরবিন্দের 'মা' সম্পর্কে লেখাগুলি তিনি আত্মস্থ করেছিলেন তা এখন আমরা খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারি। তিনি সেই লেখার সহজ অংশ বারে বারে উল্লেখ করতেন : 'মা-ই গন্তব্যস্থান, তাঁর মধ্যে সবই আছে — তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায় তাঁর চেতনার মধ্যে বাস করলে আর সব আপনিই ফুটে যায়।, আর 'মা ভগবতীর করুণা ও অভয়ের মধ্যে তুমি যখন, তখন কি আছে এমন যা তোমাকে স্পর্শ করতে পারে আর কাকেই বা তুমি ভয় করবে?...' এবং 'কোন মানবীয় প্রয়াস বা তপস্যা নয়, এক মায়েরই শক্তি আবরণখানি ছিন্ন করতে পারে, আধারকে গড়ে তুলতে পারে, এই তমিস্রার মিথ্যার মৃত্যুর বেদনার জগতে নামিয়ে আনতে পারে সত্যজ্যোতি,দিব্যজীবন, অমরের আনন্দ।'... এই মূল্যবান কথাগুলি স্মৃতি থেকে মুছে যায় না। তিনি কখনো দীর্ঘ-বক্তব্য রাখতেন না। তার সময় নির্দিষ্ট ছিল এবং অন্তরঙ্গ আলোচনা এবং পাঠচক্রের উপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন।

আমার পথ-প্রদর্শক বিশ্বনাথ রায়

গার্গী গুপ্ত
ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ড

আমায় বিশ্বনাথ রায় স্মরণিকায় কিছু লিখতে বলা হয়েছে, ভেবেই পাচ্ছিনা আমার আধ্যাত্মিক গুরু, আমার মেন্টর, আমার চলার পথের দিক নির্দেশকারী, আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসার মানুষটি সম্পর্কে আমি কি লিখবো। যাই হোক আমি বাবার সঙ্গে পাঠমন্দিরে গিয়ে সর্বপ্রথম তাঁর বক্তৃতা শুনি, আমি অভিভূত হয়ে যাই, তখন থেকেই মনে মনে তাঁকে গুরু হিসাবে মানি। আমার তখন ২৪-২৫ বছর বয়স। আজো জীবন সায়াহ্নে এসে উনি প্রয়াত হয়ে যাওয়ার পরেও উনিই আমার জীবন পথের নির্দেশক। বিশ্বনাথদার মাধ্যমে আমি শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমাকে চিনতে পেরেছি, জানতে পেরেছি, অনুধাবন করতে পেরেছি। আত্মস্থ করতে পেরেছি। আমাদের ইনটিগ্রাল অ্যাসোসিয়েশনের অনিমাদি বিশ্বনাথ দার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। আমৃত্যু তাঁর সঙ্গে এই শ্রদ্ধাবনত যোগাযোগ রুদ্ধ হয়নি। তারপরে ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ড, বিশ্বনাথদা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেন এই দৃষ্টিহীন কল্যাণকারী সংস্থার সঙ্গে। আর বেড়ে গেলো আমার সঙ্গে আরো যোগাযোগ। অনেকদিন ধরে আমরা ভাবছিলাম ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমরা একটি শ্রীঅরবিন্দ চর্চা কেন্দ্র, একটি শ্রীঅরবিন্দ পাঠচক্র গড়ে তুলবো। এই উদ্দেশ্যেই তৈরি হোলো ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালের উল্টোদিকে অরবিন্দ কথাশ্রম। উনি এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এছাড়াও ওনার ভাবাদর্শেই নির্মিত এই আশ্রম। মাসে অন্তত একটা পাঠচক্রে তিনি উপস্থিত থাকতেনই, বলতেন, আমাদের উৎসাহ দিতেন। একদিনের ঘটনা উল্লেখ করছি, তাঁর পিঠে একটি কার্বাঙ্কল হয়েছিল, তার থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছিল, কিন্তু দেহের ব্যথা, রক্তপাত তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে বা ব্যথাতুর করতে পারেনি, তিনি পাঠ করেই চলেছিলেন, পাঠচক্র চলছিল একইভাবে। এটা আমার স্বচক্ষে দেখা। আজ

তিনি পৃথিবীতে শরীরী ভাবে অবস্থান করছেন না। কিন্তু তিনি আসলে কোথাও যাননি। আমার সঙ্গে তিনি একইভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন। আজো যখন সংসারের নানা জটিলতায়, কর্মক্ষেত্রের নানা সমস্যায়, সামান্য অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি তখন তার ইউ-টিউবের বক্তব্য আমায় উদ্বুদ্ধ করে, তাঁর কন্ঠস্বর তাঁর ভাবাদর্শ, তাঁর ভাষণ আমায় আবার অনুপ্রাণিত করে, আমি আবার নতুন উদ্যমে কর্মে প্রবৃত্ত হই, বলতে পারেন আমি আবার নতুন করে অবসাদ-মুক্ত হয়ে বেঁচে উঠি।

আমাদের বিশ্বনাথদা

শান্তনু সাহা
পণ্ডিচেরী

শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কোলকাতাতে প্রথম কবে গিয়েছিলাম ঠিক মনে না পড়লেও সম্ভবত 1982 সালে কোন এক আলোচনা সভায় গিয়েছিলাম। আমাদের বাটানগরের পাঠচক্রের নিত্যদা (নিত্য রায়) সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানেই প্রথম দেখি হিমাংশু নিয়োগীকে। তারপর 1985 সালে বাবা মায়ের সঙ্গে দক্ষিণ ভারত ভ্রমনের অংশ হিসাবে মাত্র দুই দিনের পণ্ডিচেরী। পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে সেখানে গিয়ে আগেই পৌঁছেছেন শ্রীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত , যিনি শ্রীমায়ের ডাকে চট্টগ্রাম থেকে এসে আশ্রমে যোগদান করেছিলেন এবং নলিনীদার সেক্রেটারী হিসাবেও কাজ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণদা আমাকে আশ্রম দর্শনের সুযোগ করে দেন। সেই প্রথম বিজয়া দশমীর দিনে সমাধিতে প্রণাম ও শ্রীঅরবিন্দের কক্ষ দর্শন। ফিরে আসি বাংলায়। ইস্কুলের পাঠ চুকিয়ে কলেজ জীবন শুরু হয়। শ্রীঅরবিন্দ ভবনে যাতায়াত আর হ্যাঁ ছোট ছোট বইপত্র পড়ার অমোঘ আকর্ষণ বাড়তে থাকে। তিন/চার বছর পরে পরে কোন বন্ধু বান্ধবকে সঙ্গী করে পণ্ডিচেরী যাতায়াত চলতে থাকে। নতুন কর্মজীবন, আবার কর্মসূত্রে বাংলার বাইরে বেশ কিছু বছর কাটানো, এমনটাই চলছিল। তখনও জানিনা বিশ্বনাথ রায় কে। ২০০০ সালে প্রায় হুজুক করে 1st January আশ্রমে আসি দর্শনে, সাথে দুই বন্ধুকে নিয়ে। কলকাতা ফিরে একদিন ভবনে গেছি। পিছনে বাগানের দিকের বারান্দায় দেখি বিশ্বনাথদা পায়চারি করছেন, তার পরেই ওনার class. কি মনে হল যাই একটু পরিচয় করি। কাছে গিয়ে নিজের নাম বলে পরিচয় করতেই তাকিয়ে রইলেন। মনে হয় তিনি class এর বিষয়ে মনঃসংযোগ করছিলেন। যাই হোক আমি হেসে ফিরে গিয়ে কয়েক পা যেতেই আবার ডাকলেন এই শোন কি যেন নাম বললে তোমার? আমি আবার

ফিরে এসে বললাম; ব্যাস ওই পর্যন্ত। এরপর জানুয়ারী শেষের কলকাতা পুস্তক মেলা । 'পাঠমন্দিরের' stall-এ ঢুকে দেখি বিশ্বনাথদা বসে পিছনের দিকের একটা চেয়ারে, কাছে গিয়ে শিলিগুড়ি সেন্টারে উনি গিয়েছিলেন জানতাম, সেটার ব্যাপারে কিছু বলতেই উঠে দাঁড়ালেন। আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে দুই হাত ধরে এমন কিছু কথা বললেন যেটা আমাকে অবাক করে দিল শুধু নয়, ওনার সাথে যেন আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করে দিল। সেইসাথে আমি যেন শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমায়ের কাজে নতুন করে নিজেকে উপলব্ধি করলাম।

আগেই বলেছি বাটানগর পাঠচক্র অনেক দিনের। নিত্য রায়, যাঁর কথা আগেই বলেছি ষাট এর দশকের শুরুতে খুলনা থেকে পালিয়ে এসে শ্রীমায়ের কাছে পৌঁছে যান শ্রীঅনিল রায়ের মাধ্যমে। যদিও ১৮ দিন প্রণাম ও দর্শনের পর শ্রীমা তাঁকে ফিরিয়ে দেন। কপর্দকশূন্য বিনা টিকিটে। নিত্যদার এই আশ্রম যাওয়া ও ফিরে আসার কাহিনী সিনেমার গল্পের মত। এই প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। এই পাঠচক্রে একসময় বাটা কোম্পানীর অনেক কর্মী যোগদান করতেন। এমনকি টিফিনের free hours এ ধ্যান হোত। কেউ কেউ আশ্রমে চিঠি লিখে আশীর্বাদ আনাতেন, প্রণামী পাঠাতেন। বাটার কর্মী মহলের অন্যতম ছিলেন শ্রীপুলক রায়চৌধুরী (শৃন্বন্তু)

স্তিমিত হয়ে আসা এই পাঠচক্র নতুন করে শুরু হয় ২০০৫ সালের ১লা জানুয়ারি। এই নব উদ্দীপনা, প্রেরণার উৎস ছিলেন বিশ্বনাথদা। নানা বয়সের আগ্রহী মানুষের সাগ্রহ যোগদানে প্রতিটি অধিবেশন জীবন্ত হয়ে উঠত। সাধারণত দুই মাস অন্তর একটি ছুটির দিনে বিশ্বনাথদা আসতেন । এই সময় প্রথম দিকে আমাদের ঠাকুমা (বিশ্বনাথদার মাতৃদেবী) কে পেয়েছি নিয়মিত।

কিছুদিন পর আমাদের এলাকার এক স্বনামধন্য চিকিৎসক, যিনি পুস্তকপ্রেমী, নিজের উদ্যোগে একটি আঞ্চলিক 'বই মেলা' করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এলাকার অনেক বিদ্যানুরাগী মানুষের সমর্থন ছিল এতে। আমি এই খবর জানতে পেরে একদিন রাতে বিশ্বনাথদাকে আমাদের যোগদানের ইচ্ছা জানাই। ভুলতে পারার নয়, তাঁর সেই সমর্থন ও সক্রিয় যোগদান। মেলার শেষ দিনে প্রকাশ্য আলোচনা সভায় তাঁর সেই উদ্দীপনাময় ভাষণ সবাইকে মুগ্ধ করে দিল। বহু মানুষ এগিয়ে এসে পরিচয় করলেন। এক ডাক্তারবাবু বিশ্বনাথদা ট্রেনে ফিরবেন শুনে, আমাদের প্রতি কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করে ড্রাইভারসহ নিজের গাড়ী দিয়ে দিলেন। এরপর থেকে উনি একা নন, আরো কেউ এভাবে সাহায্য করেছেন।

একবার ১৫ আগস্ট বিকেলের দিকে দুটি জায়গায় ভাষণের আমন্ত্রণ এল। বাটানগরের একটি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্লাবে এবং বজবজের বিবেকানন্দ পরিষদে।

বাটানগরের অনুষ্ঠানে বহু উৎসাহী মানুষ এসেছিলেন, কর্মকর্তাদের কেউ বললেন তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বাইরে শ্রীঅরবিন্দের বিষয়ে বেশী কিছু জানেন না। ভাষণ শেষে তাঁদের মুগ্ধতা শুধু আবেগ ছিল না, ছিল যেন শ্রীমায়ের দিব্য করুণার ছোঁয়া। বিশ্বনাথদার চুম্বক ব্যক্তিত্ব, আন্তরিক ব্যবহার সেই সময় অন্ততঃ ১২, ১৫ জন সদ্য তরুণ, যুবক, যুবতীকে টেনে আনে পাঠচক্রে। যেন তরুণ যুবক ছাত্ররাই হয়ে ওঠে প্রধান অংশগ্রহণকারী, মধ্যমণি। শ্রীমায়ের আলোয় আলোকিত বিশ্বনাথদা।

বিশ্বনাথদা সাথে করে অনেক কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন , ওড়িশার কটক, ডালিজোড়া, রৌরকেল্লা, রাজগাংপুর, কত জায়গায়। আর জামসেদপুর, বাকুঁড়া, তমলুক আরো কত কেন্দ্রে। সব জায়গাতেই বিশেষতঃ ওড়িশার কেন্দ্রে মানুষ উদ্বেল হয়ে উঠত তাঁর মুগ্ধ করে রাখা ভাব ও ভাষায়, মায়ের বাণী জীবন্ত হয়ে উঠত। তরুণ ও যুবকদের ভীষণ ভালোবাসতেন বিশ্বনাথদা। বয়সের দুরত্বের আপাতঃ আড়াল দূর করে যুবকরা অনুভব করত তিনি eternally young। আমাদের কেন্দ্রের এমন অনেক তরুণের তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক পরম আশ্রয়। নিজেদের কোন সংকটে/বিপদে পরামর্শ পেতে প্রথম ফোন কল্ তাকেই করতাম। প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে বা সভাতে তিনিই প্রথম আমাকে বলতে পাঠান। স্কুল জীবনে অনেক Debate– Quiz এ নিয়মিত অংশ নিলেও এই বলা তো তা নয়! এই রকম একটু ইতস্ততঃ করাতে তিনি একদিন যে নির্দেশিকা দিয়েছিলেন, তাতেই পরিস্কার হয়ে গেল সবকিছু। এটা ‘মায়ের কাজ’। আত্মগরিমা বা বক্তৃতায় বাহবা নেওয়া নয়। যেটুকু উপলব্ধি সেটুকুই বলা ভালো; কিছু বাড়িয়ে বা তথ্য বিকৃত করে নয়, কিছু না জানা থাকলে (হতেই পারে) স্বীকার করে নেওয়া। এমন কত কথা মনে পড়ে। একবার এক প্রকাশ্য সভায় অতি বামপন্থী জনৈক ব্যক্তির প্রশ্ন কি অদ্ভুত দক্ষতায় যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন। পরে সেই ব্যক্তি এসে ক্ষমা চেয়ে নিজের দৃষ্টি/বোধকে প্রসারিত করার প্রয়োজনকে স্বীকার করেন। আমাদের পাঠচক্রের সেদিনের উৎসাহী যুবক-যুবতী আজ সবাই প্রতিষ্ঠিত তাদের পেশাগত জীবনে। কেউ কেউ বাংলার বাইরে। মেয়েরা সংসার জীবনে অনেক দূরে। সেখানেই তাঁরা কোন কেন্দ্র দেখলে যাতায়াত করেন, নিজেদের জীবনে পালন করেন, যতটা সম্ভব। এদের সবার কাছে বিশ্বনাথদা ‘আত্মার আত্মীয়’ হয়ে রইবেন; এমনটাই ছিল স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন।

বিশ্বনাথদা স্বয়ং হয়ে উঠেছিলেন এক প্রতিষ্ঠান - ‘Living embodiment’ । এই বাংলায় আমাদের প্রজন্মের কাছে এক উদাহরণ জীবনে ও কর্মে। তাঁর ভাষণে তাই এই গভীর প্রত্যয় মিশে থাকত। আমাদের অনুপ্রাণিত করত। শ্রীমায়ের একটি বাণীর কথা মনে পড়ছে : Some give their soul to the Divine, some their life, some offer their work, some their money. A few consecrate all of

themselves and all they have – soul, life, work, wealth; these are the true children of God...1941-48 (CWM1,page X)

নিজের জীবন দিয়ে শ্রীমায়ের এই বাণীকেই মূর্ত করে গেলেন বিশ্বনাথদা; আমাদের জীবনে, মননে তিনি এক চিরউজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। তাঁর জীবনে একদিকে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমা অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ।

এই দুই জ্যোতিষ্কের আলোর মেলবন্ধন পেতাম বিশ্বনাথদার ভাষণে। যা বলতেন সেটা হয়ে উঠত গভীর প্রতীতির প্রকাশ। শব্দ চয়ন ও ভাবের মেলবন্ধনে হয়ে উঠত হৃদয়গ্রাহী। সময়জ্ঞান ও স্থান-কাল-পাত্র বোধ ছিল তাঁর অপর বৈশিষ্ট্য। কখনো মাত্রা ছাড়াতে দেখিনি। আজকের এই দুঃসহ সময়ে তাঁর এই ব্যক্তিজীবনের উদাহরণ আমদের কাছে এক আদর্শ বৈকি! ভালবাসতেন এই পৃথিবীকে। মধুময় পৃথিবীর ধূলি মধুরসে ক্ষয় নাহি তার...সেই নতুন পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবেন দিব্য কর্মে।

‘শেষ নাহি যে
শেষ কথা কে বলবে?’

পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় স্মরণে

তপন প্রামাণিক
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, দিল্লী শাখা

মুর্শিদাবাদ বেলডাঙা স্কুলের এগারো ক্লাসের ছাত্র হিসেবে অনেকের সঙ্গে দক্ষিণ ভারত বেড়াতে গিয়ে প্রথম পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাই। তখন শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমার শুধু জানা ছিল তিনি একদা বিপ্লবী ছিলেন, পরে যোগী হয়ে ওঠেন। আর শ্রীমায়ের সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। স্কুলের পাঠ শেষ করে বেলডাঙা কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরে ওখানের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আমাদের ক্লাস নিতেন। অনেকের মত আমারও তাঁর পড়ানো বেশ ভাল লাগত। একদিন কিছু ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে তিনি কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন, সেই সময় ঘটনাচক্রে আমি সেখানে ছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীঅরবিন্দের কথা ওঠায় আমি স্যারকে বলি যে আমি পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়েছি। তিনি জানতে চাইলেন আমি কোথায় থাকি। আমি বেলডাঙার পাশের গ্রাম বেনাদহের কথা বলি। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলেন কলেজের পাশেই ভাড়া বাড়িতে তিনি থাকেন এবং আমাকে সন্ধ্যা সাতটায় তাঁর কাছে যেতে বলেন। আমি ভাবলাম, স্যারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটা সুযোগ যখন পেয়েছি তখন ছাড়ি কেন! সম্মতি জানালাম। সেদিন সাতটা বাজার আগেই সেখানে হাজির হই। ঘরে ঢুকেই দেখি শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের সুন্দর ছবি। কিছু কথার পর তাঁর কাছে উভয়ের সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি স্বল্প কথায় একটু বলেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর কাছে আসতে বলেন; আর এও বলেন অন্য বন্ধুরা আসতে চাইলে যেন নিয়ে আসি। এইভাবে স্যারের বাড়িতে শুধু আমি নয়, অন্য বন্ধুরাও যোগ দিল পাঠচক্রে। স্যার শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের বই থেকে পাঠ করতেন এবং আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। স্যার পণ্ডিচেরী থেকে ধূপ, বই নিয়ে আসতেন, আর রাণাঘাট থেকে আনতেন মশলা। আমরাই ওইসব কিনে নিতাম।

মাঝে মাঝে প্রণতি বৌদি ও পরমা আসত। পরমা আমায় 'বন্ধু কাকু' বলে সম্বোধন করত।

কলেজের পাঠ সাঙ্গ হওয়ায় স্যারকে বললাম আমি পণ্ডিচেরী থাকতে চাই। তিনি প্রস্তাব দিলেন দিল্লী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যেতে চাইলে তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন। দিল্লী আশ্রমের সর্বময়ী কর্ত্রী তারাদি (শ্রীমতি তারা জোহর) আমাকে যাবার অনুমতি দিলে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হই। ওখানে পৌঁছনোর কয়েকদিন পরেই নৈনিতালের 'বননিবাস' আশ্রমে যাই তিন মাস ক্যাম্প করব বলে (প্রতি বছরই ওখানে ক্যাম্প হয়ে থাকে)। ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত হয় নানা ধরণের কাজ, যেমন , শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমা প্রসঙ্গে বক্তৃতা, রক-ক্লাইম্বিং (ট্রেকিং), শরীর চর্চা, ধ্যান, যোগাসন প্রভৃতি। দিল্লী ফিরে আসার পর স্যারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

পরমা পণ্ডিচেরী আশ্রম বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে বৌদিও ওখানে থেকে গেলেন। স্যার বেলডাঙার পাট গুটিয়ে চলে এলেন কলকাতার একটি কলেজে। হুগলীতে একটি পুরানো বাড়ি কিনে বাবা-মায়ের সঙ্গে থেকে সেখান থেকেই কলকাতায় যাতায়াত শুরু করেন (যদিও এর আগে থেকেই হুগলী থেকে নৈহাটি হয়ে বেলডাঙা কলেজে বেশ কিছুদিন গেছেন)। প্রসঙ্গক্রমে বলি, আমি স্যারের অনুপ্রেরণায় ১৯৮০ সালের মে মাসে দিল্লী আশ্রমে গিয়ে মহান কর্মী তারাদির সংস্পর্শে আসি এবং আজও (প্রায় ৪৫ বছর) তাঁরই সাহচর্যে আছি, হারিয়েছি শুধু আমার প্রিয় স্যারকে।

হুগলীর প্রাণকেন্দ্র চুঁচুড়ায় দু'টি ব্যক্তিকেন্দ্রিক শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র ছিল। অধ্যাপক রায় হুগলীতে বসবাসকালে ওই দু'টি কেন্দ্রে মাঝে মাঝে যাওয়ার ফলে অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর অনুপ্রেরণায় প্রথমে খাতা-কলমে গড়ে ওঠে 'শ্রীঅরবিন্দ ভবন'। ক্রমে বহুজনের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতায় 'শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া' বাস্তবায়িত হয়। ১৯৮৯ শুভবর্ষে মহাসমারোহে সেপ্টেম্বর মাসে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রভু শ্রীঅরবিন্দের দেহাবশেষ আসে ঐ কেন্দ্রে। এই উপলক্ষে বেশ কয়েকদিন নানা ধরণের অনুষ্ঠান হয়। স্যারের আহ্বানে আমি হুগলীতে আসি ও কয়েকদিন মহানন্দে কাটাই। ২০০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দের চুঁচুড়ায় পদার্পণের শতবার্ষিকীতে ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই সেপ্টেম্বরে খুব বড় করে নানা অনুষ্ঠান হয় হুগলী ভবনের সন্নিকট অঞ্চলে। শতবার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানে স্যারের আহ্বানে দিল্লী আশ্রম থেকে তারাদি হুগলী ভবনে আসেন এবং তিন রাত এখানে ছিলেন। তারাদির সঙ্গে স্যারের কথামত আমিও আসি ও প্রভূত আনন্দ পাই।

যখনই আমি কলকাতায় আসতাম স্যারের সঙ্গে দেখা হ'ত। তাঁর সঙ্গে দলনঘাটা, উত্তরপাড়া ও অন্যান্য কেন্দ্রে গিয়েছি। হুগলীর বাড়ি তিনি হুগলী ভবনকে দান করায় সেখানে গড়ে ওঠে 'শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষাকেন্দ্র'। বেহালায় ফ্ল্যাট কিনে এরপর তিনি

কলকাতাতেই থাকতে আরম্ভ করেন। উড়িষ্যার বিভিন্ন কেন্দ্রে তিনি বক্তৃতা করার সুবাদে সেখানকার ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি খুব কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। মালদহে রেলিক্স যাওয়ার সময় সুধীর দেওয়ানের অনুরোধে সেখানে যাওয়ার সময় স্যারকে কাছে পেয়েছি। মালদহে প্রভুর দেহাবশেষ যাবার সময় স্যারের ইচ্ছায় বেলডাঙা পরিক্রমা করায় আমরা খুবই আনন্দ পেয়েছি। স্যারের খুব ইচ্ছে ছিল বেলডাঙায়, যেখানে একদা ছোট একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, সেটিকে পুনরায় সক্রিয় করে তোলার। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি উপযুক্ত কর্মীর অভাবে।

আমি দিল্লীতে থাকার সময় স্যার দু'বার দিল্লী এসেছিলেন। প্রথমবার নিজের কাজে ও দ্বিতীয়বার তারাদির আহ্বানে 'মধুবন' যাওয়ার জন্য। ঐ সময় বৌদিও সঙ্গে এসেছিলেন। দিল্লী হয়ে ফেরার সময় তাঁরা হৃষিকেশ ও হরিদ্বার ঘুরে কলকাতা ফেরেন। মধুবনে শ্রীঅরবিন্দের পূত দেহাবশেষ সংস্থাপনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন ও দু'চার দিন সেখানে ছিলেন।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। কারণ, তাঁর জন্যেই আমি শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমায়ের কাছে আসতে পেরেছি। ওঁর সাহচর্য না পেলে আজ আমি কোথায় হারিয়ে যেতাম জানিনা। দুঃখ হয়, তাঁর মত মানুষকে হঠাৎই হারিয়ে ফেললাম। মা- শ্রীঅরবিন্দের কাছে একান্ত প্রার্থনা তাঁরা যেন ঐ মহান মানুষটিকে অনন্ত শান্তি প্রদান করেন। উনি যেখানেই থাকুন, আমরা কখনই তাঁকে কোনদিন বিস্মৃত হবো না। তাঁকে জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা ও অসংখ্য প্রণাম।

(অনুলিখন ত্রিদিবরঞ্জন সরকার, হুগলী)

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়– এক আলোকবর্তিকা

আশিস কুমার বসু
চুঁচুড়া

স্মরণ মনন যাপন শিক্ষা ও সাধনার অন্যতম কঠোর ও উৎকৃষ্ট ধারা। এই ধারা-প্রবাহে স্নাত হয়েছিলেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়- হুগলি চুঁচুড়া শ্রীঅরবিন্দ ভবনের প্রাণ-পুরুষ। এই সাধন পথ বেয়েই অধ্যাপক রায়ের পথ চলা। এই চলার পথে তিনি সংগ্রহ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ক অজস্র অনালোকিত তথ্য ও ভাষ্য। এভাবেই অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় একজন গবেষক থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন এক মহান সাধকে। বলা বাহুল্য এই পথ শ্রীঅরবিন্দ নির্দেশিত এক আলোকিত সাধনধারা। এই ধারা'র এক উজ্জ্বল নিদর্শন অধ্যাপক রায়ের সমৃদ্ধ পুষ্পশোভিত শ্রীঅরবিন্দ গবেষণা কার্য ও জীবনদর্শন।

অধ্যাপক রায়ের এই জীবনদর্শন অনেককেই স্পর্শ ও প্রভাবিত করেছে সুমহান ভারতীয় জীবনস্রোতে অবগাহনে, শ্রীঅরবিন্দ চর্চায় তাঁর একাগ্রতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা জ্ঞানচর্চায় একটি আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য মাত্রা যোগ করেছে। এযেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের সাধনধারা'র এক সমুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। এখানেই অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ের মহাজীবনের পরম সার্থকতা।

শ্রীঅরবিন্দের চর্চায় অনেক তরুণ ও যুবকদের আকর্ষিত করেছে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ের প্রজ্ঞামথিত শ্রীঅরবিন্দ-ভাষ্য। তাঁর বাচনভঙ্গি এক রূপকথার জাদুকাঠি। এর স্পর্শে আন্দোলিত হয়েছে অসংখ্য ব্যক্তির অন্তরের জ্ঞানালোক। এই দুরূহ ও লৌহকঠিন জ্ঞানচর্চার পথকে সুরম্য করে তুলেছে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ের পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা। এজন্যই তিনি সকলের নমস্য ও তাঁর শ্রীঅরবিন্দ চর্চা চিরন্তন আবেদনমুখর পথদ্রষ্টা।

বিশ্বনাথদা প্রসঙ্গে

পার্থসারথি বসু
কলকাতা

এমন একজন সম্পর্কে লেখার অনুরোধ এসেছে, যাঁর সঙ্গে আমার সেই অর্থে বিশেষ একটা যোগাযোগ ছিল না। আলাপটা বরং আমার চেয়ে বেশি ছিল আমার মায়ের সঙ্গে , স্বর্গতা চিত্রা বসু। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন সদ্য সদ্য নিউ আলিপুর শক্তি সেন্টারের কাজে কিছুটা জড়িয়েছি। সে সময়ে বিশ্বনাথদাকে দেখেছি নিউ আলিপুর শক্তি সেন্টারে একটা ক্লাস নিতেন (সেটা সাপ্তাহিক না দ্বি-সাপ্তাহিক আজ আর মনে নেই)। সে ব্যাপারেও মূল যোগাযোগটা আমার মায়ের সঙ্গেই ছিল। কোন ক্লাস-টাসে আমি আগেও খুব একটা থাকতাম না, এখনও থাকি না। শ্রীঅরবিন্দ শক্তি সেন্টারে কোন কারণে বিশ্বনাথদা ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। ২০১১ সালে একবার আমার মাকে বললাম বিশ্বনাথদাকে একবার শক্তি সেন্টারে আনা হোক, বরফটা গলে কিনা দেখি। আমার মা বললেন, বেশ তো, তুমি চেষ্টা কর, তুমিই উদ্যোগটা নাও। ফোন করলাম একদিন। বললেন, অমুক দিন আমার বেহালার ফ্ল্যাটে এস। সেইমত গেলাম একদিন ওঁর 'মঙ্গলম পার্ক'এর ফ্ল্যাটে। এক কথায় নিউ আলিপুর শক্তি সেন্টারে আসতে রাজি হলেন। তারপর নানা কথা শুরু হল। ওঁর লেখা (ত্রিজ রায় ছদ্মনামে) কয়েকটা বই দিলেন। আমার নিজের তখন আরো অল্প বয়স। শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে অল্পবয়সীদের সংখ্যা চোখে পড়ার মত কম। বেশিরভাগই পক্ককেশ। আমার কেন জানিনা বরাবরই মনে হত এর জন্য পক্ককেশরা অনেকটা দায়ী। কথাবার্তা চলতে চলতে মনে হল এই সুযোগ! একটা বাউন্সার দিয়ে দেখি কেমন খেলেন! বললাম, এখানে শ্রীঅরবিন্দ বলয়ের অবস্থা তো এইরকম , যাঁরা ব্যাট করছেন, ওভারের মধ্যে চারটে বলেই তো স্লিপে ক্যাচ উঠছে, ক্যাচ ধরে ফেললে তারপরে কে ব্যাট নিয়ে

নামবে খুঁজে পাওয়া যাবে কি? বাউন্সার তো হাত থেকে বেরিয়ে গেল! ভাবছি, এই রে! এবার বোধহয় রেগে উঠে কিছু বলবেন। বিশ্বনাথদা দেখলাম চুপ করে রইলেন, তারপর কয়েক সেকেণ্ড পর একটা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। পরে ওঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর মনে হয়েছিল, উনি প্রবীণ মানুষ, কথাটা ওঁকে ঐভাবে না বললেও হ'ত। সেবার শক্তি সেন্টারে এসেছিলেন এবং বক্তৃতার ভূমিকায় বলেছিলেন, দীর্ঘদিন নিউ আলিপুর শক্তি সেন্টারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল, পার্থ গিয়ে আমায় নিয়ে এসেছে।

শ্রীঅরবিন্দ শক্তি সেন্টার নিউ আলিপুরে ২০১৪ সালে একটি কোর্স হয়েছিল , Introduction to Sri Aurobindo Studies. উদ্যোগ নিয়েছিল অনুজ-প্রতীম অনুরাগ (ওভারম্যান ফাউণ্ডেশনের অনুরাগ বন্দ্যোপাধ্যায়)। লাইফ ডিভাইনের ওপর একটি বক্তৃতা ওঁকে করতে অনুরোধ করেছিলাম কোর্সের অঙ্গ হিসেবে। এবারেও রাজি হয়েছিলেন এবং এসেছিলেন। যে ক'বার নিউ আলিপুর শ্রীঅরবিন্দ শক্তি সেন্টার ও অন্যান্য জায়গায় ওঁর বক্তৃতা চলাকালীন উপস্থিত থেকেছি, ওঁর সময়জ্ঞান দেখেছি। যতটাই সময় দেওয়া থাকত, ঠিক ততটা সময়ের মধ্যেই সেইদিনের বিষয়ের বক্তব্য গুছিয়ে শেষ করতেন। অনুরাগ ও ঘনিষ্ঠ দু'একজনকে মজা করে বলতাম, বিশ্বনাথদাকে কুড়ি ওভার খেলতে দিলেও খেলবেন, পঞ্চাশ ওভার খেলতে দিলেও খেলবেন, ষাট ওভার খেলতে দিলেও খেলবেন। ঠিক কুড়ি, পঞ্চাশ আর ষাট ওভারের মত করেই। আবার সুপ্রিয়দা হলেন টেস্ট খেলার লোক, লিমিটেড ওভার খেলতে দিলে চলবে না, যতক্ষণ না আউট হবেন, ব্যাট করতে দিতে হবে। আজ দুজনেই আমাদের মধ্যে নেই।

যেদিন বিশ্বনাথদার শরীর যায়, কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবনে দেহ আনা হয়েছিল পরদিন সকালে। শ্রীঅরবিন্দ শক্তি সেন্টারের পক্ষ থেকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছিলাম। ওঁর ফুলে ঢাকা শরীরটা নিয়ে বডি ক্যারেজ শ্রীঅরবিন্দ ভবনের ফটক দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়েছিল। একটা জায়গা ফাঁকা। মানুষটা আর নেই।

জন্মান্তর

মৈত্রেয়ী মুখার্জী
বেলঘড়িয়া

মাস্টারমশাই যে কি ছিলেন, তা বলে বোঝানো যায় না। যাঁর হাত ধরে মা-শ্রীঅরবিন্দকে জেনেছি, চিনেছি, তিনি হলেন এই মাস্টারমশাই, বিশ্বনাথ রায় ওরফে ত্রিজ রায়। অসাধারণ পাণ্ডিত্য যাঁর অনন্য পরিচয়। জীবন যখন প্রায় দিশেহারা হয়ে গেছিল, তখন তিনি দিশা দেখিয়েছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার, আমি ওনাকে প্রথমে চোখে দেখিনি, কিন্তু জ্ঞানবাণী F.M. চ্যানেলে একটি অনুষ্ঠানে শ্রীঅরবিন্দ ভাষ্যকার হিসাবে তিনি আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ওনার বক্তব্যগুলি আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতো। অদ্ভুত ব্যাপার, ঐ সময়েই বেহালা বইমেলায় আশ্রমের স্টলে পাঠচক্রের সন্ধান পাই। চলে গেলাম এক অদ্ভুত আকর্ষণে। ২৩শে ডিসেম্বর, ২০০৮। ক্লাস হল, ক্লাসের শেষে ওনাকে প্রণাম করলাম। সে এক অদ্ভুত প্রণাম, লোহা যেমন চুম্বককে আকর্ষণ করে, আমিও তখন যেন মন্ত্রমুগ্ধ। সেইদিন ছিল আমার জন্মদিন। পরে জানলাম, জন্মদিন শ্রীঅরবিন্দ পথে একটি বিশেষ দিন। আমি ঐদিনই নিজের অজান্তে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করে নিলাম। যদিও এই পথে কোন বহির্দীক্ষা নেই এবং কোন গুরুকরণও নেই। কিন্তু সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে ওঁনাকে শ্রদ্ধা জানালাম। তারপর শুরু হল পাগলের মত ক্লাস করা, ওঁনার 'মা' গ্রন্থের ক্লাস, শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীর ক্লাস, সাবিত্রীর ক্লাস, পুরো গোগ্রাসে গিলতে থাকতাম। প্রথম প্রেমে পড়লে যে অভিজ্ঞতা হয়, এক অদ্ভুত ভালোলাগা, ভালোবাসা তৈরি হয় দয়িতের প্রতি, ঠিক তেমনই এ এক অদ্ভুত নেশা। মাতালকে যেমন বলে দিতে হয় না কোথায় মদের ঠেক রয়েছে, এও ঠিক তেমনি। বড় বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন তিনি, কত সমৃদ্ধ হয়েছি ওঁনার ক্লাসে। উনি বলতেন, শ্রীমায়ের কথার অনুসরণে, 'সাবিত্রী পাঠে ব্যয়িত কোন সময় বৃথা যায় না।' জীবনে কত কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ক্লাসে গেছি, ঠিক সঠিক সমাধান পেয়ে গেছি।

উনি খুব রসিক মানুষও ছিলেন। একবার ‘মা’ গ্রন্থ পাঠ করছিলেন বেহালা সখের বাজার Centre-এ। তৃতীয় অধ্যায় পড়াচ্ছিলেন, যেটিকে মা-শ্রীঅরবিন্দ পথের রক্ষাকবচ বলা হয়। যেখানে প্রথম লাইনটি ছিল, ‘জীবনের পথে সকল ভীতি সংকট বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে যদি বর্মাবৃত হয়ে চলতে চাও, তবে কেবল দুটি জিনিস প্রয়োজন, সে দুটি সর্বদাই একসঙ্গে রয়েছে, প্রথম মা ভগবতীর করুণা, আর দ্বিতীয়, তোমার দিক থেকে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, সমর্পণে গঠিত তোমার অন্তঃকরণ।’ এইটুকু পড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, একেবার Buy ১ Get ১ ব্যাপার। একটার সঙ্গে একটা Free।

এইরকম ছোট ছোট কত যে উদাহরণ আছে, তার ইয়ত্তা নেই। কত ভুল ধারণা, Pre-conceived notion তিনি দূর করে দিয়েছিলেন, তা বলার কথা নয়। একটি ছোট উদাহরণ দিই। একবার তিনি বলেছিলেন, সৃষ্টির মূল উৎসই হলেন পরমা জননী তাঁকে আমরা যে নামেই ডাকি না কেন, X-Y-Z– কিন্তু তিনিই হলেন সেই পরাৎপর শক্তি। তাহলে আমরা যে জিনিস পূজা করে তাঁকে নিবেদন করছি, সেটা প্রসাদ, আর যেটা বাজার থেকে কিনে আনছি সেটা প্রসাদ নয়? সবই তো তাঁর! সুতরাং সবকিছুই প্রসাদজ্ঞানে খেতে হয়। এ কথার সঙ্গে আমরা রামপ্রসাদের কথার মিল পাই,

“শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
আহার কর মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা-মারে ।”

—কত সুন্দর করে তিনি এটা বুঝিয়েছিলেন।

আমাদের মনে ‘ভালো’ সম্পর্কে কিছু মনগড়া ধারণা থাকে। সেই ধারণাকে তিনি নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন, ‘আমি ভালো’, এটা যেমন অহংকার, তেমনি, ‘আমি খারাপ’, এটা তামসিক অহংকার, অবশ্যই শ্রীঅরবিন্দের কথার অনুসরণে।

সাধনার ভিত প্রস্তুতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন (মানসিক সম্পদ), তা সবকিছুই তাঁর ক্লাসে পাওয়া যেত। তিনি এতটাই সমৃদ্ধ ছিলেন যে, মুগ্ধ না হয়ে পারা যেত না।

এরপর জীবনের দীর্ঘ পথ অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু সেই প্রণামের মুহূর্তটা আজও ভুলতে পারিনি। উনি গত হলেন, ২২শে মে, ২০২৩। সেই কী অদ্ভুতভাবে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলাম, হয়ত এটাকেই চৈত্যিক দুঃখ বলে, তাঁর সঙ্গে আমার কোন পার্থিব চাওয়া পাওয়া ছিল না, কিন্তু একটা আত্মিক যোগ ছিল।

শ্রীঅরবিন্দের ‘দিব্য ভোগ’ idea-টা তিনিই সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সবসময় পৃথিবীকে নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁর যোগের লক্ষ্য বিশ্বের বুকে দিব্য অর্থাৎ পূর্ণ জীবন। বৈকুণ্ঠ বা কোন অপার্থিব জগৎ তাঁর যোগের লক্ষ্য নয়। তাই দিব্যভোগ সম্পর্কে সাধকের প্রত্যক্ষ ধারণা থাকা দরকার। অন্যান্য যে কোন সাধনায় অর্থকে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের যোগেই অর্থশক্তির

মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই বক্তব্যটি উনি খুব সন্দর করে বুঝিয়েছিলেন , রিক্ততার মধ্যেই কি প্রকাশ? সমৃদ্ধির মধ্যে কি তাঁর প্রকাশ নেই? সৃষ্টির মূল উৎস যিনি , সবই তো তাঁর! তাহলে সমৃদ্ধির মধ্যেও তিনিই রয়েছেন। আসলে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ভোগবাসনাকে সর্বদা চরিতার্থ করতে চাই। তাই ধনসম্পদ ব্যবহারকারীকে ভোগী বলে নির্ধারণ করি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন , বাসনাবিহীন ভোগ হল দিব্যভোগ। আমাদের সাধারণ ভোগের সঙ্গে বাসনা মিশে থাকে। তাই আমরা আসক্তির বশবর্তী হয়ে যাই। ভোগ করবো, অথচ তাতে বাসনা থাকবে না , এ তো সোনার পাথরবাটির মত কথা! হাতে আছে, অথচ হাতে নেই এমন ব্যাপার। কিন্তু ভোগের সঙ্গে বাসনাকে নির্মূল করার কথা একমাত্র এ পথেই বলা হয়েছে। এরজন্য সাধনার প্রয়োজন! এ একদিনে সম্ভব নয়। বাসনার বিষদাঁতকে একদিনে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তা দীর্ঘ তপস্যা সাপেক্ষ। কিন্তু কঠিন হলেও তা অসম্ভব নয় , এ আশ্বাস শ্রীঅরবিন্দ আমাদের দিয়েছেন।

মাস্টারমশাই আরও শিখিয়েছিলেন , মা'কে ভালোবাসতে হয়, তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হয় নিজেকে। তিনি হলেন পরমা আদ্যাশক্তি , ভাগবতী চিৎশক্তি! সুতরাং তাঁকে ধরলে তিনিই সমস্ত বাধা দূর করে দেন!

তাঁর সংকলিত শ্রীঅরবিন্দের কয়েকখানি পত্রের ক্লাসে তিনি এই পত্রটির ওপর বিশেষ জোর দিতেন, যেটি কলেজস্ট্রীটের পাঠমন্দিরে বাঁধানো আছে , 'মা-ই গন্তব্যস্থান, তাঁর মধ্যে সবই আছে। তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁর চেতনায় বাস করলে আর সব আপনিই ফুটে যায়।'

এবং এই গন্তব্যে পৌঁছতে গেলে যে কালজয়ী পত্রটির কথা তিনি বিশেষভাবে বলতেন, সেটি হল ,

'তপস্যা শুধু এই, স্থির থাকা, মাকে ডাকা, খুব শান্ত দৃঢ়ভাবে অশান্তিকে, নিরাশাকে, কামনা-বাসনাকে প্রত্যাখ্যান করা।'

বিশ্বনাথদাকে যেমন দেখেছি

উত্তম কুমার ভৌমিক

(১) "..... কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে..."

আজকে এমন একজন মানুষকে নিয়ে কিছু লিখবার জন্য প্রেরণা বোধ করছি যিনি আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে অথচ যেন কত আপনজন। তিনি পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী বিশ্বনাথ রায়। সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি ব্রিজ রায় নামে খ্যাত। মা-শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। যিনি বিগত ২০২৩ সালের ২২শে মে তারিখে মাতৃলোকে যাত্রা করেছেন। যাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসায় কেটেছে আমার জীবনের বেশ কিছুটা সময়, প্রায় ৩০-৩৫ বৎসর। মা-শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে প্রবেশের কিছুদিনের মধ্যেই যাঁর অকৃত্রিম স্নেহের সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। ক্রমশঃ কাছে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। আর সেই সূত্রেই এক সহজ পুঞ্জীভূত প্রেরণাশক্তি আমাকে মা-শ্রীঅরবিন্দের যোগপথে প্রবেশের প্রাথমিক পাঠ শিখিয়েছিল। বলা যেতে পারে পূর্ণযোগ-পথে দীক্ষা হয়েছিল তখন থেকেই। এ যেন ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানের কাঁধে চড়েছিল। তারপর থেকে যতদিন তিনি শরীরে ছিলেন, দাদা-ভাইয়ের এক সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অজান্তে। বরং বলা যায়, তিনি ভালোবেসে আমাকে দাদা ডাকার অধিকার দিয়েছিলেন। যত তাঁর কাছে এসেছি ততই বুঝতে পেরেছি তিনি কাছে থেকেও যেন কতদূরে অথচ পথ চলতে তাঁকে কতই না প্রয়োজন। মনে হয় এ-প্রয়োজন শুধু আমার নয়, মা-শ্রীঅরবিন্দ যোগপথে যারা তাঁর সান্নিধ্যে কম-বেশি এসেছেন তাঁদের সকলেরই। কারণ লক্ষ্য করতাম তাঁর যে কোন ক্লাস অথবা বক্তৃতায় নানান বয়সের, এমনকি ভিন্ন যোগপথের ভক্ত ও অনুরাগীদের উপস্থিতি। আমরা জানি তিনি কর্মক্ষেত্রে ছিলেন একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক, মা-শ্রীঅরবিন্দ যোগপথে একজন অগ্রণী সাধক, সুবক্তা, গবেষক, লেখক ইত্যাদি। সর্বোপরি তিনি ছিলেন আমাদের অভিভাবক স্বরূপ। এক কথায় তিনি

নিজেই ছিলেন একটা প্রতিষ্ঠান। তাঁর হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তেমনি হাওড়া জেলার বালিটিকুরীতে এবং আমতা থানার ঝিখিরার সন্নিহিত প্রত্যন্ত একটি গ্রাম রাউতড়ায় গড়ে উঠেছে যথাক্রমে 'অর-মা কালচারাল সেন্টার' এবং শ্রীঅরবিন্দ ভবন। যে দুটি কেন্দ্রের সঙ্গে আমার নাড়ীর সম্বন্ধ। মনে পড়ছে রাউতড়া কেন্দ্রটির নামকরণের জন্য দুটি নাম পছন্দ করে দাদাকে দিয়েছিলাম কিন্তু দাদা সেগুলির পরিবর্তে শ্রীঅরবিন্দ ভবন নামটি রাখার ব্যাপারে ভাবতে বলেছিলেন। আমি শুনে বলেছিলাম, দাদা, কোলকাতায় তো শ্রীঅরবিন্দ ভবন একটা আছে তাই...। দাদা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন তাতে কি এসে যায়, পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে ঐ রকম ভবন গড়ে উঠুক, এই তো চাই। তারপর আর কথা না বলে দাদার এই প্রস্তাব আমরা মেনে নিয়েছিলাম এবং সেই মতই নামকরণ হয়েছিল। আর এইভাবেই ক্রমে ক্রমে দাদার নিকট-সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছিল। লক্ষ্য করতাম সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর কি অপরিসীম ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠা। বিশেষতঃ কোন অনুষ্ঠানে তাঁর সময়ানুবর্তিতা এবং বক্তব্য বিষয়কে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রূপে উপস্থাপিত করা যেন তাঁর সহজাত ছিল। প্রকৃত অর্থে তাঁর এই গুণগুলি ছিল আমাদের সকলের শিক্ষনীয় বিষয়।

ঠিক কবে, কোন তারিখে তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল তা আজ আর স্পষ্ট মনে নেই। তবে হুগলি জেলার পোড়াবাজার গ্রামে ইন্টিগ্রাল এডুকেশন ক্যাম্পে একসঙ্গে কয়েকটা দিন তাঁর সান্নিধ্যে কাটানোর অবিস্মরণীয় স্মৃতি বেশ মনে পড়ে। সেই সুবাদেই পর পর তাঁর কিছু বক্তৃতা শোনার এবং অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন থেকেই যেখানেই দাদার বক্তৃতার অনুষ্ঠান থাকত সেখানেই ছুটে যেতাম এমনি ছিল তাঁর বক্তৃতার আকর্ষণী ক্ষমতা। ইতিমধ্যে কোলকাতার পাঠমন্দিরে তাঁর সাধনার ক্লাসে যোগদানের সুযোগ হয়েছিল। পাঠমন্দিরে তাঁর নেওয়া সাধনার ক্লাস আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করত। প্রতি বৃহস্পতিবার অফিসের ছুটির পরে পড়িমরি করে হাজির হতাম ক্লাসে। সাধনা-র এই ক্লাস থেকে কোন অজান্তেই যেন এই ধরনের আলোচনার জন্য গ্রামে একটি কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা মনে ঠাঁই পেয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিতে, আগেই বলেছি, ২০০৯ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ঝিখিরার রাউতড়া গ্রামের কেন্দ্রটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। সেই সময় দাদা হাতে ধরে শিখিয়ে ছিলেন একটি কেন্দ্র গঠনের ভূমিকা ও তাৎপর্য। এইভাবে ক্রমে ক্রমে দাদার সঙ্গে একটা পারিবারিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। দেখা হলে কিম্বা ফোন করে কেন্দ্রের খবরাখবর, মেয়েদের পড়াশোনা, তাদের বিবাহ এবং পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন। তাই অন্য অর্থে তিনি ছিলেন আমার সত্যিকার অভিভাবক। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম দাদার সঙ্গে যাদের কমবেশি পরিচয় ছিল সকলেই বোধ

করত দাদা তার সবচেয়ে কাছের মানুষ। এমনি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল তাঁর ব্যবহার শৈলী। ঝিখিরা সেন্টারের অনুষ্ঠানে যখনি দাদাকে আমরা পেতে চাইতাম তখনি তিনি একবাক্যে সাড়া দিতেন। পথশ্রমের ক্লান্তি উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্ত চলে আসতেন। আর বলে দিতেন, সম্ভব হলে, অনুষ্ঠানের পরে এলাকার স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনার একটু ব্যবস্থা রাখার জন্য। যুব সমাজের চরিত্র গঠনের দিকে এমনি ছিল তাঁর আন্তরিক প্রয়াস। এটি আমাদের সকলেরই আর একটি শিক্ষণীয় বিষয়। জীবনের নানা সঙ্কটময় মুহূর্তে পেয়েছিলাম তাঁর অমূল্য উপদেশ যা চিরকাল স্মরণে থাকবে। স্মৃতিপটে আরও কত কথাই না ভেসে আসছে। সব কথা লিখতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘায়িত হবে। তাই অতিমারির সময়কার দু-একটি কথা বলে এ-প্রসঙ্গ শেষ করবো। করোনার ভয়ঙ্কর সময়ে আমরা সবাই যখন প্রায় গৃহবন্দী তখন উত্তরপাড়া, হুগলি কেন্দ্রের শঙ্করদার সহযোগিতায় গুগল মীটে দাদার কণ্ঠ শুনবার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। এবং আশ্চর্যের বিষয় নিয়মিত ঐ সব অনুষ্ঠানের অদৃশ্য স্পর্শে অতি অল্পকালের মধ্যেই আমাদের বন্দীদশা ঘুচে গিয়েছিল বলা যায়। গুগল মীটের ক্লাসে যোগদানের মধ্যে দিয়ে অতিমারির উদ্বেগের দিনগুলো কি আনন্দেই না কেটেছিল। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীঅরবিন্দের মা গ্রন্থের সেই অমোঘ বাণী—"এ-বস্তুর স্পর্শে সঙ্কট সুযোগে পরিণত হয়, ব্যর্থতা সার্থকতায়, দুর্বলতা অমোঘ সামর্থ্যে পরিবর্তিত হয়।" কিছুদিন পর আমাদের কেন্দ্রও দাদার এই বদান্যতা থেকে বঞ্চিত হয়নি। আমাদের অনুরোধে দাদা প্রায় এক বৎসরকাল শ্রীঅরবিন্দের কারা কাহিনী-র উপর বিস্তারিত ক্লাস নিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের গূঢ় অথচ হাস্যরসাত্মক কাহিনীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আমাদের শুধু যে মুগ্ধ করেছিল তাই নয় ঐ গ্রন্থের সাহিত্য মূল্য এবং যোগপথের সুপ্ত ইঙ্গিতগুলিও দাদা আমাদের সামনে খুলে ধরেছিলেন। ঐ সময়কালে কোন একদিন বেলা দশটা নাগাদ দাদার ফোন পেলাম। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে দাদা প্রায় ২০-২৫ মিনিট ধরে বাকসাড়া কেন্দ্রের কিছু সমস্যার কথা জানিয়ে নির্দেশ দিলেন এই সঙ্কট মুহূর্তে ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। এবং ওখানকার গৌতমদার (গৌতম মুখার্জি) টেলিফোন নাম্বারও আমাকে জানিয়ে দিলেন। এ থেকে বোঝা যায় কেন্দ্রগুলির অগ্রগতির বিষয়ে দাদা কতখানি আন্তরিক ছিলেন। কেন্দ্রগুলির জন্য তাঁর কি অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ছিল। এইভাবে দাদা আমাদের মত অভাজনদের প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে মা-শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের কর্মযজ্ঞে অনুপ্রাণিত করে গেছেন এবং আজও করে চলেছেন। সুতরাং এ-হেন দিশারী, অভিভাবক স্থূল শরীরে কাছে না থাকলেও তিনি যে সর্বদাই সাথে সাথে আছেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

(২) "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি......

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সামান্যটুকু যা বললাম এ সবই তাঁর বহির্জীবনের পরিচয়। তাঁর সমগ্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। মনে হয় একজন সমকক্ষ সাধকের পক্ষেই সেটি সম্ভব। সুতরাং আমি অকপটে স্বীকার করছি যে তাঁকে নিয়ে বিশদে লিখবার, বিশেষত তাঁর অন্তর্জীবন নিয়ে লিখবার, অধিকার আমার নেই। যাদের সে-অধিকার আছে তাঁরা নিশ্চয়ই সেইভাবে তাঁর মূল্যায়ন করবেন। তাই এই অধ্যায়ে তাঁরই ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিয়ে একটি দিনের কিছুটা সময় আন্তরিক আলোচনার যে সুযোগ পেয়েছিলাম, স্মৃতির পাতা থেকে উদ্ধার করে সে বিষয়ে কিছু লিখবার প্রয়াস করছি। যদি তার মধ্যে থেকে জানা বিশ্বনাথদার অজানা কোন দিক উদ্ঘাটিত হয় এবং তা থেকে পাঠক, পাঠিকা এবং পূর্ণযোগ-পথের অনুগামীরা কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত হন তবেই তা সার্থক জানবো। চলুন ভূমিকা ছেড়ে সেই বিশেষ দিনটিতে আমরা ফিরে যাই।

দিনটি ছিল সোমবার, ইং ২৯শে অক্টোবর, ২০১৮ সাল। কার্তিকের একটি মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণসিক্ত দিন। পূর্ব-নির্ধারিত সময় অনুযায়ী দাদার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি, আভাসদা, (আভাস নারায়ণ বিশ্বাস, শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে একজন সুবক্তা, লেখক) আর হাওড়ার অর-মা কালচারাল সেন্টার-এর অধ্যক্ষা ঝর্ণা সামন্ত অপরাহ্ন ৩.৩০ মিনিট নাগাদ বেহালার মঙ্গলম পার্কের ৩/৫ নম্বর ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছিলাম। এই প্রথমবার আসার কারণে ফ্ল্যাট খুঁজে পেতে শুরুতে সামান্য বিভ্রান্তি হলেও দাদার সক্রিয় নির্দেশে এবং ফ্ল্যাটের প্রবেশদ্বারের দ্বাররক্ষীদের সহায়তায় শেষমেশ নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হয়েছিলাম। কাছাকাছি যেতেই সহাস্য দাদা ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাদের দেখা দিলেন। অতঃপর আমরা ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এলে সহাস্য দাদা এবং প্রণতিদি (আমি বিশ্বনাথদার স্ত্রীকে বরাবর দিদি সম্বোধন করি) বেরিয়ে এসে আমাদের আন্তরিকভাবে ভিতরে ডেকে নিলেন।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই বিস্ময়ে হতবাক! আরে এটা বসতবাড়ি কোথায়? এতো একটা আস্ত লাইব্রেরী। শুধু বই আর বই! যাই হোক প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটল দাদার আহ্বানে। দাদা আমাদের তাঁর ড্রইং কাম রিডিং রুমে বসতে বললেন। সেখানে বসার জন্য একটি সিঙ্গেল আর একটি ডাবল সোফার ব্যবস্থা ছিল। দাদাকে ঘিরে আমরা মুখোমুখি সবাই বসলাম। দাদা বসলেন সিঙ্গেল সোফাতে এবং আমরা ডাবল সোফায়। বসায় কিছুটা অসুবিধা লক্ষ্য করে প্রণতিদি ভিতর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এলেন যাতে আমরা স্বচ্ছন্দে বসতে পারি। আমি সোফা থেকে উঠে এসে চেয়ারে বসলাম। অতঃপর দাদা কথা শুরু করলেন। আলোচনা সবে শুরু হয়েছে প্রণতিদি সহসা বললেন ওঁর কথায় মজে গেলে তোমরা আর উঠতে পারবে না, তাই আগে ফ্ল্যাটের ঘরগুলো

একটু ঘুরে দেখে নাও। দিদির কথায় সাড়া দিয়ে আমরা বিশ্বনাথদার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে একে একে দেখতে আরম্ভ করলাম। প্রসঙ্গক্রমে, ফ্ল্যাটটি ঘুরে ঘুরে একনজরে যা দেখলাম সে বিষয়ে কিছু বলে রাখি—ফ্ল্যাটটি দুতলায়, তিন শয্যাবিশিষ্ট। ঢুকেই একটি এল সাইজের ড্রইং কাম রিডিং কাম ডাইনিং স্পেস। ডাইনিং স্পেসের বাম দিকে একটি বেডরুম এবং ডানদিকে মুখোমুখি কিচেন আর ওয়াশরুম আরও একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে দুদিকে দুটি বেডরুম। যেখানে আমরা বসেছিলাম ড্রইংরুমের সেই অংশে বুকসেল্ফে থরে থরে সাজানো শুধু বই আর বই। মা-শ্রীঅরবিন্দের রচনা সংগ্রহ এবং ঐ সংক্রান্ত বই ছাড়াও সেখানে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিভুতিভূষণ ইত্যাদি রচনাবলী এবং নানান তথ্যসমৃদ্ধ বহু মূল্যবান পুস্তক-সমাবেশ আর সাথে আছে দাদার নিজস্ব গবেষণার ও লেখার বহু মূল্যবান সব ফাইল এবং অসংখ্য পত্র-পত্রিকা, সবই পরিপাটি করে সাজানো। সেই অর্থে বলা যেতে পারে ড্রইংরুমটি অধ্যাত্ম পথিকের কাছে এবং পুস্তক-প্রেমিক পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পঠন-পাঠনের একটি আদর্শ ক্ষেত্র। এছাড়া অন্য দুটি ঘরেও আছে অসংখ্য মূল্যবান পুস্তকের সমাবেশ। আমার মনে হয় মা-শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে যারা গবেষণা করতে ইচ্ছুক তারা এখান থেকে লাভ করতে পারবে অনেক মূল্যবান তথ্য যা হয়তো অন্যত্র বিরল। আগে বলেছিলাম দাদার এই ফ্ল্যাট বাড়িটি একটি লাইব্রেরী কিন্তু এটিকে একটি গবেষণাগার বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর একটি লক্ষ্যণীয় জিনিষ হল প্রত্যেকটি বই আলমারিতে এবং তাকে এত পরিচ্ছন্ন করে সাজানো যে দেখলে মনে হবে এইমাত্র সেগুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। শুধু কি তাই, দাদার নিজস্ব গবেষণা ও বক্তৃতা সংক্রান্ত ফাইলগুলি পরবর্তী উৎসাহী গবেষকদের জন্য একটি ডাইরিতে সূচীপত্র করে রাখা আছে, দাদা সেটিও আমাদের দেখালেন। সুতরাং বোঝা গেল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষকদের জন্য দাদার কতখানি আন্তরিক ভাবনা ছিল। যখন সবকিছু দেখতে দেখতে দাদার নিজস্ব গবেষণা কক্ষে গেলাম তখন অবাক হয়ে দেখলাম সমস্ত টেবিল জুড়ে বইয়ের স্তূপ এবং পাশের বিছানার উপর সাজানো সারিবদ্ধ বই। মনে পড়ছে সেই সময় দাদা বর্তিকা পত্রিকার জন্য কিছু লেখা তৈরি করছিলেন। দাদা জানালেন সব সময় তাক অথবা আলমারি থেকে বই নামাতে অসুবিধার কারণে হাতের কাছেই যাতে সেগুলি পাওয়া যায় তাই এই ব্যবস্থা। মাত্র কিছুদিন হলো দাদার গলব্লাডার অপারেশন হয়েছে তাই চলাফেরায় কিছুটা সংযত হতে হয়েছে, ইচ্ছামত বইপত্র তাক বা আলমারি থেকে ওঠানো নামানো আগের মতো সম্ভব হয় না, এই ব্যবস্থার এটিও একটি কারণ, দাদা জানালেন।

অতঃপর ঘুরে এসে আমরা প্রত্যেকে নিজের জায়গায় বসলাম। দাদা পুনরায় আলোচনা শুরু করলেন। সেদিনের আলোচনায় বিশ্বনাথদার জীবনের যেসব অজানা

তথ্য, অন্ততঃ আমার কাছে, উঠে এসেছিল সেকথাই এবার বলব। দাদার মুখোমুখি বসে তাঁর জবানীতে তাঁরই জীবনের কথা শোনা কি যে সৌভাগ্য, বিশেষত আমার মতো এক অভাজনের, ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। রোমাঞ্চকর সেসব কাহিনী শুনতে শুনতে হারিয়ে যাচ্ছিলাম অতীত ঊষার গর্ভে।

স্বাভাবিকভাবেই যদিও এই আলোচনা ছিল নিতান্তই ঘরোয়া তথাপি সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রে ছিল মা-শ্রীঅরবিন্দের অদৃশ্য প্রোজ্জ্বল উপস্থিতি। যাই হোক আগের কথার সূত্র ধরে দাদা তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে পুনরায় আলোচনা শুরু করলেন। আলোচনা কিছুটা এগিয়েছে এমনসময় প্রসঙ্গক্রমে আভাসদা, দাদার উদ্দেশ্যে বললেন-'আচ্ছা, দাদা একটু বলুন আপনি কিভাবে মা-শ্রীঅরবিন্দের পথে এলেন'? কিছুক্ষণ নীরব থেকে দাদা সাবলীলভাবে শুরু করলেন অতীত দিনের স্মৃতিচারণা। নানা রোমহর্ষক ঘটনা যেমন একে একে উদ্ঘাটিত হল সেই স্মৃতিকথায় তেমনি এল কত কৌতূহলোদ্দীপক ও হাস্যমুখর মুহূর্তের ঘটনা। প্রসঙ্গক্রমে যখন রবীন্দ্রনাথের কথা এল তখন ঝর্ণাদি বললেন এতো স্বাভাবিক শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গ এলে রবীন্দ্রনাথ আসবেই। দাদা সঙ্গে সঙ্গে সংযত সুদৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন-'শোন ঝর্ণা, আজকের দিনে তুমি একথা যত সহজে বলতে পারছ সেদিনের পরিস্থিতি কিন্তু তা ছিল না। কারণ কবিগুরুর 'নমস্কার' কবিতা প্রসঙ্গেই রবীন্দ্র-বলয়ের মানুষজনেরা বলতেন এটা নাকি কবির সাময়িক ভাবোচ্ছাস, একথা তো আমার প্রাসঙ্গিক বক্তৃতায় আগেও তোমাদের বলেছি। সুতরাং এ প্রসঙ্গে আর বেশি কিছু বলছি না, নিশ্চয়ই বিষয়টা অনুধাবন করতে পারছ।

শোন, যা বলছিলাম আগে সেকথা বলি। দাদা আবার ডুব দিলেন স্মৃতির গহ্বরে। ফেলে আসা জীবনের আরও অনেক অজানা কাহিনী উঠে এল ক্রমে ক্রমে। কি ছিল না তাতে? ছিল ষাটের দশকের নাট্যআন্দোলনের কথা, সত্তরের দশকের বাংলার নকশাল আন্দোলনের কথা এবং এসবের সঙ্গে দাদার সক্রিয় সংযোগের কথা। উঠে এল দাদার চাকুরী জীবন এবং সংসার জীবনের নানা প্রাসঙ্গিক কথা। যেন একটি কুঁড়ির ক্রমশঃ ফুল হয়ে ফুটে ওঠার ইতিবৃত্ত। সেই আলোচনার মধ্যে ছিল এমন সব ঘটনা প্রবাহ যা একাধারে যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি অনুপ্রেরণামূলক।

আমরা তন্ময় হয়ে শুনছিলাম সেসব কাহিনী। ভুলে গিয়েছিলাম সময়ের হিসাব। সহসা চায়ের আগমনে আমাদের হুঁস ফিরে এল। দিদি আলোচনার ফাঁকে কখন উঠে গিয়ে এই ব্যবস্থা করে ফেলেছেন আমরা বুঝতেই পারিনি, আলোচনার মধ্যে চা সেবন যেন যাত্রা, নাটকের সংলাপের ফাঁকে আবহসঙ্গীতের মত মনে হচ্ছিল।

চা পানের সামান্য বিরতির পর আলোচনা আবার শুরু হল। জানা গেল নাট্যআন্দোলনের সময় ছাপা অক্ষরে দাদার প্রথম লেখা প্রকাশের কথা। সমসাময়িক নানা নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্য সংস্থার সঙ্গে দাদার নিবিড় যোগাযোগের কথাও প্রসঙ্গক্রমে

প্রকাশ পেল। এই সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যেই চলেছে তাঁর সারস্বত সাধনা। সেখানে কোন অনাদর ছিল না। কথায় কথায় এল কফি হাউসের আড্ডার কথা। সেই সূত্র ধরে জানা গেল সেই আড্ডার কেউ কেউ যারা দাদার জুনিয়র কিম্বা সিনিয়র পরবর্তীতে তাঁদের রাজনীতিতে প্রবেশ এবং কালে সরকারি শাসন ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে আমূল বদলে যাওয়ার কথা। এইসব বলতে বলতে দাদা মাঝে মাঝে একটু চুপ হয়ে যাচ্ছিলেন, যেন হারিয়ে যাচ্ছিলেন সুদূর অতীতের অতলে। ক্ষণপরেই আবার স্বতঃস্ফূর্ত ফিরে আসছিলেন স্মৃতিমন্থনে। জানালেন ১৯৬৭ সালে স্কুল শিক্ষক হিসাবে তাঁর প্রথম চাকুরি লাভের কথা। দাদা ক্লান্তিহীন বলে চলেছেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত পান করছি সেই স্মৃতি-সুধা, যা কেবল অনুভূতিগ্রাহ্য, প্রকাশের ভাষা যার তল পায় না।

ক্রমে এল দাদার স্কুল শিক্ষকের চাকরি ছেড়ে কলেজে অধ্যাপকের চাকরিতে যোগদানের কথা। দাদা আভাসদাকে ইঙ্গিত করে বললেন 'কি জান আভাস সত্যি বলতে কি তার পরেই আমার জীবনে এল এক আমূল পরিবর্তন।' এই কথা বলে দাদা ক্ষণকাল চুপ হয়ে গেলেন। একটা নীরবতা নেমে এল আলোচনার মাঝখানে।

আভাসদা সেই নীরবতা ভঙ্গ করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন 'জীবনের এই যে পরিবর্তনের কথা বলছেন, এর পিছনে কি কোন বিশেষ কারণ আছে?' আভাসদার এই আন্তরিক জিজ্ঞাসা, যজ্ঞাগ্নিতে যেন সহসা ঘৃতাহুতি হল! দাদা একেবারে উচ্ছসিত হয়ে বলে উঠলেন 'আছে বৈকি!' তবে তোমরা একে গুহ্য বা 'Occult' যাই বল না কেন আমি এ সবকে একেবারেই আমল দিই না, কেন না এ আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তবে তা এতটাই ব্যক্তিগত সেকথা না বলাই ভালো। আবার কিছুটা নীরব হয়ে দাদা বললেন, 'আজও আমার কানে বাজছে সে কথা। 'Grace'-এর যে কী চমৎকারী প্রভাব তা বুঝবার সাধ্য আমাদের নেই। সেইদিন শুধু এইটুকু বুঝেছিলাম আমাকে কোন ঢোঁড়া সাপ ধরেনি, ধরেছে জাত সাপ। ঐ 'Grace' না থাকলে সেদিন আমার জীবনে যেকোনো ধরনের মারাত্মক কিছু ঘটতে পারত। প্রাণনাশও অসম্ভব ছিল না, আর তা হলে তোমাদের আজকের বিশ্বনাথদাও থাকত না। এ ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যাবে না। ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে আরও যা সব ঘটেছে সেসব শুনলে হয়তো মূর্ছা যাবে তোমরা, আবারও বলছি সেসব একান্তভাবেই ব্যক্তিগত।

এই কথা বলতে বলতে দাদা কিছুটা nostalgic হয়ে পড়েছিলেন। খানিক থেমে দাদা আবার প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। আবার শুরু করলেন কোলকাতার বাইরে মুর্শিদাবাদের নিমতিতায়, কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে চাকরী জীবনের কথা। সেটা ছিল ১৯৭২ সাল। শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষ। কাকতালীয়ভাবে দাদার প্রথম মুর্শিদাবাদ যাওয়ার দিনটিও ছিল ১৫ই আগষ্ট, তবে দাদার কথায় তখনও পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবস ছাড়া ঐ দিনটির অন্য কোন তাৎপর্য তাঁর কাছে ছিল না। সে যাই হোক শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষ

হওয়ার কারণে সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে সেই উপলক্ষ্যে সাজসাজ রব। দাদা বললেন 'ওসবের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না, কারণটা একটু আগেই বলেছি, তবে পরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় শ্রীঅরবিন্দের জন্ম শতবর্ষের বিষয়টি জেনেছিলাম।' ইতিমধ্যে নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে নিমতিতা কলেজে কাটানোর পর দাদা বদলী হয়ে এসেছিলেন বেলডাঙ্গা কলেজে। ঐ সময়েই দাদার বিবাহ এবং কলেজের কাছেই ঘরভাড়া নিয়ে একাধারে সংসার জীবন এবং চাকরি জীবন।

দাদা বললেন 'ঐখানে গিয়ে জীবন বইতে শুরু করল অন্যখাতে। এল এক নূতন দিশা, কারণটা আগেই বলেছি 'Grace'। ভাড়াবাড়িতেই শুরু মা-শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে আলোচনা। প্রতিষ্ঠা হল 'শ্রীঅরবিন্দ সাধন কেন্দ্র'। পুরানো দিনের সেইসব কথা বলতে বলতে দাদাকে ভীষণ উচ্ছল দেখাচ্ছিল। দাদার প্রাণবন্ত বর্ণনায় আমরাও অবগাহন করছিলাম সেই উজ্জ্বল অতীত দিনগুলিতে। দাদা বললেন 'সেখানে নিয়মিত পাঠচক্র চলত। আমার কিছু ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও আরও অনেকে যোগ দিত সেই আলোচনায়। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার পারিবারিক ভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ছে তোমাদের দিদি (প্রণতিদি) আবার কয়েকজনকে গানও শেখাতেন। ঐ সময়েই আমাদের কন্যা সন্তান 'পরমা' এল'। সুতরাং বলা যায় এই সমস্তকিছু নিয়ে মা-শ্রীঅরবিন্দের কৃপায় দাদার সংসার তখন চাঁদের হাট।

দাদা অনর্গল বলে চলেছেন, আমরা অভিভূত নীরব শ্রোতা, 'এমনি করে দিনগুলো কাটছিল স্রোতের মত। ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল ১৯৭৮ সাল। ইতিমধ্যে কোলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবনে বক্তৃতার সুযোগ হয়েছে, সেও এক কাকতলীয় ঘটনা, এ বিষয়ে যথাসময়ে তোমাদের বলব। এখন যেকথা বলছিলাম তাই বলি, 'আমার ইচ্ছা হল বেলডাঙ্গার শ্রীঅরবিন্দ সাধন কেন্দ্রে মায়ের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান করতে হবে। আমার মনের ইচ্ছেটা সকলকে জানালাম। সবাই আমার ইচ্ছায় একবাক্যে সায় দিল এবং শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি। শুনলাম কোলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের সেন্টিনারি অনুষ্ঠান খুব সফলভাবে করা হয়েছিল। সুতরাং অভিজ্ঞতা লাভের জন্য খোঁজ খবর শুরু হল শ্রীঅরবিন্দের সেন্টিনারির সময় কেমনভাবে তা করা হয়েছিল এবং সেই সূত্র ধরে একে একে উন্মোচিত হল সেই সময়কার নানা প্রেক্ষাপট। সেই পাথেয় সম্বল করে মায়ের সেন্টিনারি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি যখন চলছে তখন বেলডাঙ্গায় বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। ফলতঃ মায়ের সেন্টেনারির অনুষ্ঠানটিও একটা লক্ষ্যনীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে সফলভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল।'

কথায় কথায় দাদা বললেন 'এবার ঐ সময়কার একটা ঘটনার কথা তোমাদের বলব, যা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে, কোনদিন আমি তা ভুলতে পারব না। মন দিয়ে শোন, একটি অতি সাধারণ পরিবারের এক ছেলে নিয়মিত আসা যাওয়া করত

পাঠচক্রে। নাম তপন প্রামাণিক। বাড়ি পাশাপাশি বেনেদা নামে একটি গ্রামে। মা-শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তার একটা আন্তরিক আকর্ষণ ছিল আর সেই কারণেই আমাদের পরিবারের সঙ্গে তার একটা সহজ সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। আমাদের কন্যা পরমা তো তারই কোলেপিঠে চড়ে শৈশবে বড়ো হয়েছিল। সেই তপন বর্তমানে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম দিল্লি কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ। শুধু তাই নয় বর্তমানে তপন একজন নিষ্ঠাবান সাধক। আমি আজও পরিচিত সকলকে তপনকে দেখিয়ে বলি' প্যান্ট শার্ট পরা সন্ন্যাসী যদি দেখতে চাও তবে ওখানে গিয়ে ওকে দেখে এস।'

খানিক থেমে, দাদা বললেন 'তখন সবে কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অধ্যাপক নিয়োগ শুরু হয়েছে। সময়টা ১৯৮৪ সাল। বন্ধুদের চাপে পরীক্ষায় বসলাম এবং পাশ করে কোলকাতার দীনবন্ধু এ্যান্ড্রুজ কলেজে সিলেক্টও হয়ে গেলাম। তারপর খোঁজ নিয়ে জানলাম শিয়ালদা থেকে ঐ কলেজ বেশ খানিকটা দূরে, যাতায়াতের বেশ ঝামেলা। সুতরাং আর বিশেষ ইচ্ছা হল না বেলডাঙ্গা ছেড়ে কোলকাতায় আসতে। কারণ বেলডাঙ্গা কলেজ আর বাসস্থান খুবই কাছাকাছি, যাতায়াতের কোনো ঝক্কি পোহাতে হয় না তদুপরি শ্রীঅরবিন্দ সাধন কেন্দ্রের পাঠচক্রের আকর্ষণ তো আছেই। শেষমেশ বেলডাঙ্গা কলেজেই থেকে গেলাম।

কিন্তু বিধি বাম। ইতিমধ্যে কাজের সুবাদে কোলকাতা শ্রীঅরবিন্দ ভবনে যাতায়াত বেড়েছে। ঐ বৎসর (১৯৮৪ সাল) জুলাই মাসের গোড়ার দিকে কোন এক কাজের সূত্রে আমাকে কোলকাতা ভবনে আসতে হয়েছিল এবং সেই সময় ভবনে শান্তি নিকেতনের অধ্যাপক ডঃ শিশির ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমার সঙ্গে আলাপচারিতায় জানলেন কোলকাতার দীনবন্ধু এ্যান্ড্রুজ কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পাওয়া সত্বেও কেবলমাত্র যাতায়াতের অসুবিধার জন্য আমি বেলডাঙ্গা কলেজ ছেড়ে আসতে চাইছি না। ডঃ ঘোষ বিস্মিত হয়ে বললেন 'সে কি কোলকাতার কলেজে সুযোগ পাওয়া সেত ভাগ্যের কথা আর সামান্য কারণে এই সুবর্ণ সুযোগটা নষ্ট করছো।' অতঃপর প্রায় জোর করেই আমাকে বললেন 'এক্ষুনি ফিরে যাও এবং বেলডাঙ্গা কলেজে ইস্তফা দিয়ে কোলকাতা কলেজে যোগ দাও।'

আমি উত্তরে বললাম 'তা কি আর হবে। প্রায় তিন মাস হয়ে গেল, এখনও কি আর ফাঁকা আছে ইত্যাদি.. ইত্যাদি।' শিশির বাবু প্রত্যুত্তরে বললেন 'ঠিক আছে, আর সময় নষ্ট না করে তুমি আগামিকালই দীনবন্ধু এন্ড্রুজে গিয়ে প্রিন্সিপ্যাল-এর সাথে দেখা কর।' ডঃ ঘোষের কথামত পরের দিন আমি প্রিন্সিপ্যাল-এর সাথে দেখা করলাম। এবং জানতে পারলাম জুলাই মাস থেকে সেশন শুরু হবে বলে ভাগ্যক্রমে এখনও অন্য কাউকে জয়েন করাননি। আরও কিছু আলোচনার পর তিনি বললেন 'যাও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে ইস্তফা দিয়ে চলে এস, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

বলাই বাহুল্য আমি তাই করেছিলাম এবং বেলডাঙ্গা কলেজে ইস্তফা দিয়ে ১৯৮৪ সালের ২১ শে জুলাই কোলকাতার দীনবন্ধু এ্যান্ড্রুজ কলেজে যোগ দিয়েছিলাম এবং অবসর জীবন অবধি ঐ কলেজেই অধ্যাপনা করেছিলাম। সেই থেকেই কোলকাতার সাথে শুরু হয়েছিল নিবিড় যোগাযোগ।

বিশ্বনাথদার সঙ্গে কিছুক্ষণ (২)

কথা প্রসঙ্গে ফিরে এল কোলকাতা শ্রীঅরবিন্দ ভবনে দাদার প্রথম বক্তৃতা-প্রসঙ্গ। সময়টা ছিল ১৯৭৪ সাল। দাদা বললেন-'সে এক আকস্মিক ঘটনা। কোন এক বিশেষ কাজ নিয়ে কোলকাতা ভবনে এসেছিলাম। লাইব্রেরীতে বসে কাজ করছিলাম। এমন সময় সহসা মানিক দা (মানিক মিত্র, ভবনের তখনকার লাইব্রেরীয়ান) প্রস্তাব দিলেন ভবনে একটা ক্লাস করার জন্য। আকস্মিক এই প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার আগেই মানিকদা জানাল এক বিশেষ কারণে আগামী ক্লাসটি উনি নিতে পারবেন না তাই এই বিকল্প ব্যবস্থার ভাবনা। একথা শুনে আমি রাজী হয়ে গেলাম। নির্দিষ্ট দিনে ক্লাস নিলাম। ঐ ক্লাস শুনে মানিকদা কি বুঝেছিলেন জানি না, আমাকে আগষ্ট মাসে আর একটি ক্লাস নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমি মানিকদাকে জিজ্ঞাসা করলাম বক্তৃতার কোন নির্দিষ্ট বিষয় আছে কিনা। মানিকদা উত্তরে জানালেন 'সে আপনি যা বলবেন, তবে যা বলবেন আমাকে একটু দেখিয়ে নেবেন। আমি সম্মতি জানিয়ে চলে এলাম। মনে মনে ভাবলাম শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে 'আগষ্ট' একটি বিশেষ মাস। একাধারে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম মাস এবং ঐ মাসেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'নমস্কার' কবিতাটির আত্মপ্রকাশ। আবার ঐ মাসেই শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরম পত্রিকার জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হয়ে 'তদানীন্তন' বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। সুতরাং ঠিক করলাম ঐ দুই মহান ব্যক্তিকে নিয়ে একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। তাই সেই বিষয়ে, মানিকদার কথা মত, বক্তৃতার একটা খসড়া তাঁকে দেখালাম। মানিকদা আদ্যোপান্ত পড়ে সম্মতি দিলেন। দাদা বলেছিলেন ঐ ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁর বক্তৃতার একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল।

একটু থেমে স্মৃতির পাতা উল্টিয়ে দাদা বললেন 'আমি যখন নির্দিষ্ট দিনে ঐ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মঞ্চের চেয়ারে বসলাম, দেখলাম হলের সমস্ত জায়গাটা শ্রোতায় ভরে গেছে। একটুও ফাঁকা নেই। যাই হোক বক্তৃতা শেষ হল একটা নতুন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। কেন না যে সমস্ত শ্রোতা ঐ দিন হলে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই দীর্ঘদিন ধরে যেমন মা-শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে অভিজ্ঞ তেমনি

রবীন্দ্র চর্চাতেও তাঁরা অভিজ্ঞ। বক্তৃতার শেষে অনেকেই কাছে এসে ভালোলাগার কথা জানিয়ে গেলেন। মানিকদা তো একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, আরও এই কারণে যে, তিনি এতদিনে একজন নূতন বক্তা আবিষ্কার করেছেন। উচ্ছ্বাস দমন করতে না পেরে আরও বললেন 'মাষ্টার তুমি ওদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছ।' পরে জেনেছিলাম মানিকদার একথা বলার কারণ। কেননা ঐ দিন শ্রোতাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের বিষয়েই বেশকিছু গোঁড়া মনোভাবাপন্ন স্রোতা উপস্থিত ছিলেন, মানিকদা সেটা জানতেন।

কথা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এল পণ্ডিচেরি আশ্রমের কথা। পণ্ডিচেরি আশ্রমে দাদা যখন যেতেন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অথবা গবেষণা সংক্রান্ত কোনো কাজে তখন সেই সময়কার প্রবীণ সাধক সাধিকাদের সঙ্গে দেখা করতেন। আর সাহানাদির সঙ্গে দাদার ছিল একটা আন্তরিক যোগ, তাঁর কাছে যেতেন দেখা করতে নানা কাজের সূত্রে। সেই রকম সাক্ষাৎকারের একটি স্মৃতিচারণ করে দাদা বললেন 'একদিন কাজ করছিলাম সাহানাদির ঘরে বসে। কিছু পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন নলিনী সরকার ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তাঁদের কথাবার্তা শেষে নলিনী বাবু এবং উমাপ্রসাদ বাবু চলে যাওয়ার পর দিদি আমাকে ডেকে বললেন 'মাষ্টার আগামীকাল একবার আসবে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম নিশ্চয়ই আসব। কখন আসতে হবে জেনে নিয়ে সেদিনের কাজ শেষ করে ফিরে এলাম। পরেরদিন নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হলাম। দিদিও প্রস্তুত ছিলেন। আমাকে বললেন 'চলো তোমার সঙ্গে একটু সমুদ্রের ধারে যাব। ওখানে নলিনী, উমা ওরা আসবে। আমি নির্দেশ মত দিদিকে ধরে ধরে নিয়ে গেলাম সমুদ্রের ধারে। সেখানে আগেই ঐ দুজন চলে এসেছিলেন। আমরা যাওয়ার পর নলিনী সরকার বসলেন মাঝখানে আর তার দুদিকে যথাক্রমে বসলেন সাহানাদি এবং উমাপ্রসাদ বাবু। আমি বসলাম তাঁদের পিছনে। শুরু হল তাঁদের কথাবার্তা। আমি নীরব শ্রোতা। তাঁদের আলোচনায় বুঝতে পারলাম তাঁরা প্রায় দুশো বৎসর পিছনে ফিরে গেছেন। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবছিলাম কি অসম্ভব স্মৃতির অধিকারী ছিলেন তাঁরা। কথা শেষ হলে দিদিকে পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরে এলাম।' কথা প্রসঙ্গে মোহনলাল বাজপেয়ীর সঙ্গেও যে পণ্ডিচেরিতে দাদার সঙ্গ হত সেকথা বলেছিলেন।

এদিকে অপরাহ্ণ সন্ধ্যার আকর্ষণে ধাবমান। সময়ের এই উচ্ছ্বাস গতি পরীক্ষার হলের পর এই দ্বিতীয়বার অনুভূত হল। কথার ফাঁকে কখন উঠে গিয়ে প্রণতিদি আমাদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করেছেন বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারলাম যখন তাঁর কাছ থেকে সেগুলি সদ্ব্যবহারের ডাক এল। কিন্তু পেটে ক্ষিদে থাকা সত্ত্বেও আমরা একটু কুণ্ঠা বোধ করছিলাম কারণ শরীরের খাদ্য পূরণ করতে গিয়ে দাদার পরিবেশিত

'সাইকিক ফুড' থেকে যে বঞ্চিত হতে হবে। সাইকিক ফুড তো সবসময় পাওয়া যায় না। শুনে দাদা একটু হাসলেন।

তারপর বললেন চলো একটু খেয়ে নাও। আমিও তোমাদের সঙ্গে বসছি। খেতে খেতেই না হয় কথা হবে। অগত্যা আমরা ডাইনিং-এ গিয়ে বসলাম। দাদা আমাদের পাশে একটা চেয়ারে বসলেন। ততক্ষণে সারা ডাইনিং টেবিল জুড়ে রাখা হয়েছে নানান খাদ্য সম্ভার। জানতে পারলাম সব রন্ধনপদই প্রণতিদির স্বহস্তে প্রস্তুত। তাতে যেমন ডালপুরি আছে তেমনি আছে ফুল কপি আলুর তরকারি, আছে পরম উপাদেয় পরমান্ন আর আছে মিষ্টান্ন। প্রণতিদি পরম যত্নে সে-সবই একে একে পরিবেশন করলেন। আমরা খাওয়া শুরু করলাম। শুরু হল পুনরায় দাদার স্মৃতিচারণ। দাদার সুললিত স্মৃতিচারণের মাঝে দিদির অন্ন পরিবেশন এককথায় যাত্রা-নাটকে আবহসঙ্গীতের মতন মনে হচ্ছিল। দাদা অতীতের অতলে ডুব দিয়ে কত যে প্রেরণাদীপ্ত কাহিনী সব তুলে আনছিলেন তা বর্ণনাতীত। সেই সূত্র ধরেই জানা গিয়েছিল কবি সুমন, সুভাষ ঘোষাল প্রমুখ ব্যক্তিরা একসময় দাদার ছাত্র ছিলেন। উঠে এসেছিল হিমাংশুদার প্রসঙ্গ। বিশেষতঃ একবার পণ্ডিচেরি আশ্রমে মাকে প্রণাম করতে গিয়ে হিমাংশুদার পকেট থেকে নস্যির ডিবে পড়ে গিয়ে যে হাসির ঘটনা এবং হিমাংশুদার ঘর মা নেওয়ার পর তাঁকে অন্যত্র জায়গা দেওয়ার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা, দাদার মুখে সেইসব ঘটনার বিবরণ শোনার অনুভূতিই আলাদা।

এই কাহিনী বলতে বলতে দাদা একটু নীরব হয়ে গেলেন। অতঃপর যে কাহিনী শোনালেন আমার মনে হয় অধ্যাত্ম পথিকের কাছে অনুপ্রেরণামূলক। ঘটনাটি ঘটেছিল বেলডাঙ্গায় মায়ের সেন্টেনারী অনুষ্ঠানের কিছু পরে। ঘটনাটি তপন প্রামাণিক-কে নিয়ে। যে তপনের কথা আগে বলেছিলাম। একদিন তপন এসে দাদাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল 'আচ্ছা স্যার, মা-শ্রীঅরবিন্দের যোগের বিষয়ে আপনি যেসব কথা বলেন সেসব কি সংসারে থেকে করা যায়? আমরা দাদার কথা উৎসুক হয়ে শুনছিলাম। দাদা বললেন

'আমি তাকে বলেছিলাম, হ্যাঁ নিশ্চয়ই করা যায়, তবে কিছু অসুবিধা তো হয়ই। ঐদিন আর বেশি কথা হয়নি। আরও কিছুদিন পরে তপন এসে আমাকে বলেছিল 'স্যার, আমি ভেবে দেখলাম সংসারে থেকে আমার পক্ষে এই পথে অগ্রসর হওয়া বেশ অসুবিধার। সুতরাং স্যার, আপনি যদি আপনার পরিচিত কোনো সেন্টারে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলে ভালো হয়।' দাদা বললেন, আরও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর আমি তাকে বলেছিলাম 'ঠিক আছে আমার যেসব সেন্টার জানা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখব কোথাও কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। এখন তুমি এসো।' তারপর দাদা দিল্লি আশ্রমের তারাদিকে (তারা জোহর) সমস্ত জানিয়ে

চিঠি লিখেছিলেন। শেষমেশ দিল্লি কেন্দ্রে তপনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে তপন নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে। এখন সে সেখানকার ট্রেজারার (যে কথা আগেই বলেছি)। যাঁরা দিল্লি কেন্দ্রে গেছেন ফিরে এসে সবাই তপনের সহায়তা এবং নিষ্ঠার কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। তপনের সাফল্য উৎসাহী মা-শ্রীঅরবিন্দ ভক্তদের অনুপ্রাণিত করবে নিশ্চয়ই। গ্রাম্য পরিবেশে এক সাধারণ পরিবারে মানুষ হয়েও ভগবৎ কৃপায় কিভাবে অসাধারণ হয়ে ওঠা সম্ভব তপন তার জীবন্ত উদাহরণ। তার হয়ে ওঠার কাহিনী মনে করিয়ে দেয় শ্রীঅরবিন্দের 'মা' গ্রন্থের সেই অমোঘ বাণী "এ বস্তুর স্পর্শে সঙ্কট সুযোগে পরিণত হয়, ব্যর্থতা সার্থকতায়, দুর্বলতা অমোঘ সামর্থ্যে পরিবর্তিত হয়..."

প্রেরণাদীপ্ত আর একটি কাহিনী সেদিন দাদা আমাদের শুনিয়েছিলেন। উপরের কাহিনীটি শোনানোর পর দাদা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কিছুটা চুপ থাকার পর বললেন আর একটি স্মরণীয় ঘটনা বলছি মন দিয়ে শোন সেই সময়টায় আমি একাই ছিলাম বেলডাঙ্গায়। তোমাদের বৌদি তাঁর মেয়েকে নিয়ে তখন কোলকাতায় ছিলেন। সেদিন কলেজের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল। চারিদিকে আবছা অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল। ঘরের কাছাকাছি আসতেই লক্ষ্য করলাম মাথায় চাপা দেওয়া কেউ যেন একটু দূরে অন্ধকারে সরে গেল! অন্ধকারের মধ্যেই স্পষ্ট মনে হলো এ-কোন মানুষের মূর্তি। বুকের ভিতরটা একটু কেঁপে উঠলো, যেন একটু দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থা! যাই হোক আমি চাবি খুলে ঘরে ঢুকলাম। প্রতিদিনের মত মায়ের আসনের সামনে একটা ধূপ জ্বালিয়ে বসলাম চৌকির উপর। বসে একটু ভাবছি, এমন সময় দেখি ভেজানো দরজাটা ধীরে ধীরে একটু ফাঁকা করে ঘরে ঢুকে এলেন আপাদমস্তক চাপা দেওয়া এক মহিলা।' ভৌতিক কাহিনীর মত রুদ্ধশ্বাস আমরা শুনছি। দাদা বলে চলেছেন 'ঘরে ঢুকে ঢাকা খুলে ভদ্রমহিলা আমার সামনে এসে নমস্কার জানিয়ে বললেন 'আমি তপনের মা।' তখন আমি ধাতস্থ হয়ে তাঁকে বসতে বললাম। তিনি বসলেন। আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছি হঠাৎ কি কারণে উনি এসেছেন, উদ্দেশ্যই বা কি ইত্যাদি। এমন সময় উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তপন কি আপনাকে চিঠিপত্র দেয়'। আমি বললাম, না। তখন উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কেমন আছে'। আমি বললাম, খবর পাই, ও ভালো আছে। এই উত্তর পাওয়ার পর উনি আর কিছু না বলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর আমি স্থাণুবৎ বসে রইলাম কিছুক্ষণ।' এই বলে দাদা চুপ করে গেলেন। ক্ষণ পরে দাদা যে কথাটি বললেন তা সত্যিই আজও কানে বাজে। দাদা বললেন,'সত্যিই, সেইদিন এক সাধকের মাকে দেখেছিলাম'।

এরপর তপন শেষ যেবার গ্রামে ফিরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেই কথা এবার বলি, 'তপন গ্রামে ফিরেছিল তার বাবার মৃত্যুর পর। পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম

মিটে যাওয়ার পর ও আমার বাড়িতে এসেছিল। নানান বিষয়ে অনেক কথাই হয়েছিল সেদিন। কথাবার্তার পর বিদায়ের আগে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'আবার কবে আসবে?' শুনে নির্লিপ্ত সে বলেছিল, 'যেটুকু বন্ধন এতদিন ছিল বলে মনে হত সেটাও ছিন্ন হয়ে গেল।' এই কথা বলে প্রণাম করে সেই যে সামনে চলতে আরম্ভ করেছিল আর পিছন ফিরে তাকায় নি। এ ছিল যেন তপনের 'অগস্ত্য যাত্রা।' দাদার কথার ফাঁকে দিদির হাতে তৈরী ডালপুরি, তরকারি প্রয়োজন মত আরও কিছুটা করে পরিবেশিত হল। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রী অরবিন্দ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দাদা ঝর্ণাদির প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সেই আলোচনা থেকে বোঝা গেল কেন শ্রীঅরবিন্দ জনৈক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন "Tagore has been a wayfarer towards the same goal as ours in his own way...."। সব শেষে দিদি সুদৃশ্য পাত্রে পরিবেশন করলেন পরমান্ন। আহা, তার স্বাদ আজও যেন মুখে লেগে আছে। তবে ভোজনের এই তৃপ্তি পুরোপুরি উপভোগ করার আগেই তা যেন ম্লান হয়ে গেল যখন দিদি আমাদের শোনালেন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। অতএব আজকের মত আমাদের থামতে হবে। কারণ ঐ দিন বেহালার সখের বাজার সেন্টারের পাঠচক্রে দাদাকে যেতে হবে। দাদা তখনও ক্লান্তিহীন বলে চলেছেন। কিন্তু হায়! সময়ের অনুশাসন অলঙ্ঘনীয়। তাই অগত্যা আলোচনায় ছেদ টানতেই হল। দাদা থামলেন। এ যেন ছোট গল্পের মত, শেষ হয়েও হইল না শেষ। শ্রবণের অতৃপ্তি দূর হতে না হতেই তৃপ্তিকর চা— এর আবির্ভাব হল ডাইনিং টেবিলে। দাদা উঠে ভিতরে গেলেন পাঠচক্রে যাওয়ার জন্য তৈরী হতে। ঝর্ণাদি চা রসিক নয়। তাই আমি এবং আভাসদা চা পান শেষ করে উঠে পড়লাম বাড়ি ফেরার জন্য। বিদায় পর্ব শেষে পথে নামলাম। আবহাওয়া তত ভালো নয়। সকলে দ্রুত পদপাতে চৌরাস্তায় এসে বাসে উঠে বসলাম। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা তখনও ঝিরিঝিরি ঝরে চলেছে। চিদাকাশ আচ্ছন্ন করে অশ্রুত বেজে চলেছে আলোচনার বিশেষ মুহূর্তগুলি। আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দাদার উদ্ভাসিত মুখচ্ছবি।

কি হবে আমার কল্পান্তের প্রলয়ের প্রশ্বাসেঃ বিশ্বনাথ রায়

মুকুন্দ গোস্বামী
কলকাতা

প্রশ্নঃ মাস্টারমশাই, আগে যখন বাধাবিঘ্ন এসেছিল, তখন তো আপনার সাথে অনেক কথা হয়েছিল। আপনার কথাগুলো ওষুধের মতো কাজ করেছিল। সেই সাঁতারের উদাহরণ.....। তা, বাধাবিঘ্নগুলো আবার এসেছে। এ কোন সাধনার বাধা নয়, এ পারিবারিক বাধা----সংসার-জীবনে হয়ে থাকে। এবারে সেই বাধাগুলোই এসেছে, কিন্তু তারা এবার এসেছে প্রচণ্ডভাবে তাদের শক্তি বাড়িয়ে, বহুগুণিত করে, প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করেছে।

কিন্তু এবারে আমি পুরোপুরি অন্য মানুষ এক,'— এসবের কোনো effect ই (প্রভাব) নেই আমার উপরে। ভেতর থেকে জানি: এগুলি সব বিনষ্ট হবে, এগুলি সব ফালতু।..... সংসারের কোনো লোক দেখে বলবে, "এ কি! তুমি পাগল হয়ে গেছ! এইরকম carefree (নিশ্চিন্ত) রয়েছ?"

এরই সাথে আমার ভেতর থেকে যে কথাগুলি উঠে আসছে — প্রথম, শ্রীঅরবিন্দের 'চিন্তাবলি ও সূত্রাবলির' একটি লাইন, "ভগবান যদি অত্যাচারী, উৎপীড়কের ভূমিকায় এসে দেখা দেন, পরিণামে তারও সার্থকতা তিনি প্রমাণ করে দেন।" আর দ্বিতীয়ত সাবিত্রী-র একটি লাইন অনেকটা এইরকম ছিল, " শুরু যার ভগবানের, তার শেষ কি খারাপ হতে পারে?"

আমি কিন্তু খুব সুন্দর আছি। আপনাকে ফোন করেছি দুটি কারণে। একটা ভয় আছে, সে বলছে — "মুকুন্দ তুমি যে এত নিশ্চিন্ত নির্বিকার আছ, মা-শ্রীঅরবিন্দের উপর নির্ভর করছ ভাবছ তাঁরা সব ঠিক করে দেবেন, এগুলো শুধু তোমার কল্পনা,

এর কোন সত্যতা নেই"। দ্বিতীয় রয়েছে আর একটি 'মিচকে শয়তান' — সে বলে, "এত দিন মা- শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে থাকার কি ফল তুমি পেলে?" এগুলো ভেতর থেকে মাঝে মাঝে আসছে।

উত্তর : যতটুকু শুনে রাখলাম, তাতে এটাই বলার, — প্রথমে বলেছিলে যে 'এটা সাধনার ঐসব নয়, এ পারিবারিক ব্যাপার'। তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে ---প্রথম বিষয়ই হচ্ছে, তোমার পরিবার তোমার কাছে যদি এখনও সাধনার অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, তাহলে তো প্রশ্ন থাকছে! আমরা পারি না, কিন্তু সংসারে আমার যা ভূমিকা সেটা তো আমার সাধনার অন্তর্ভুক্ত। আমাকে তো এই জায়গাটা ছেড়ে যেতে হচ্ছে না।

আজকে কোন্ জায়গা সাধনার ক্ষেত্র হতে পারে? তথাকথিত যদি কোন আশ্রম বা কেন্দ্র হয়, সেখানেও তো এইসব জিনিস, যা আজকে সংসারে আমরা face (মুখোমুখি হচ্ছি) করছি, সেগুলোও তো face করতে হবে।

আর সাধনা কথার মূলের মধ্যেই রয়েছে ---- সেইসব বাধাই আমাদের সামনে আসে, যেগুলো আমার অপূর্ণতা থেকে মুক্ত করে আমাকে পূর্ণতায় নিয়ে যায়। অতএব first point (প্রথম ব্যাপার) যেটা এটা একবারও আমার ভাববার প্রয়োজন নেই যে, সাধনাটা হচ্ছে একটা পৃথক জিনিস আর যে বর্তমানে সংসার জীবনে রয়েছি সেটা পৃথক জিনিস।

দ্বিতীয় যেটা, আমার মনে হয়েছে, তোমার প্রশ্নেরও বাইরে, সেটা হচ্ছে যে এই যে কি ঘটেছে সেটা তো জানার দরকার নেই, বিষয়টা মানে মূলভাবটাই হচ্ছে প্রশ্ন। তাতে তুমি বলছ, তোমাকে touch (স্পর্শ) করছে না এবং অনেকে দেখে মনে করবে যে এরকম ঘটনা সত্ত্বেও তুমি যেন নির্বিকার রয়েছ। এটাকে তারা এক ধরণের উন্মাদের দিক বলে মনে করতে পারে এবং বুদ্ধিহীনতার দিক বলে দেখতে পারে। এখানে একটা মন্তব্য হচ্ছে : আমাকে যখন touch করছে না কথাটা বলছি, সেখানে কোন সমস্যা নেই — তাতে কে আমায় পাগল বলল, কি বলল; তাতে কিছু নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, "আমায় touch করছে না" মানে...যে ঘটনাগুলি আমার মধ্যে আসছে, যার মুখোমুখি হচ্ছি ---- তাতে আমার কোনও action (ভূমিকা) থাকবে না তা নয়, আমার যা করণীয় তা আমি করব।..... শুধু অন্যের জীবনের থেকে পৃথক হচ্ছে — আগে আমি আমার শুধু মাথার উপর নির্ভর করছিলাম বুদ্ধি, যুক্তি, বিবেচনা-বোধের উপরে নির্ভর করছিলাম; অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে, শারীরিক প্রতিক্রিয়া বা প্রাণিক যে সমস্ত দ্বন্দ্ব আসছিল, সেইগুলোর দিকে না গিয়ে আমি আমার ঊর্দ্ধতম ক্ষেত্র মন থেকে করছিলাম।...কিন্তু সাধনা মানেই হচ্ছে — এখনও আমি সে জায়গা থেকে কাজ করলেও ক্রমাগত, আমি আমার অন্তরাত্মার সাথে যুক্ত হবার চেষ্টা করব

— অর্থাৎ আমার সিদ্ধান্তগুলো অন্তরাত্মার দিক থেকে আসবে। তাতে, অনেক সময় দেখা যেতে পারে, প্রত্যক্ষভাবে আমি একটা সাধারণ মানুষের চাইতেও বেশী, আরো বেশী প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারি, অথবা একেবারেই দেখাতে পারি না। ...... অতএব লোকের প্রশ্নটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে : 'আমার সিদ্ধান্ত'টা আমি কোথা থেকে নিচ্ছি? কার কাছ থেকে নিচ্ছি? আমার সাধন জীবন তখন-ই শুরু হচ্ছে, যখন আমি আমার প্রকৃতি অর্থাৎ শরীর, মন, প্রাণকে অতিক্রম করে আমার মধ্যে যে সত্তা --- সেটাকে যে technical (ব্যবহারিক) নামই দেওয়া হোক, ঈশ্বরের অন্তরাত্মা, চৈত্যসত্তা যাই হোক, প্রতিনিধি আমাদের মধ্যে---- আরও স্পষ্ট করে বললে; আমার অপূর্ণ আধারের মধ্যে পূর্ণতার প্রতিনিধি --- তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে নিচ্ছি কিনা। ....তখনই বোধ করা যাবে যে, আমি সাধন জীবনে রয়েছি। পরের যেটা, --- একটা দুটো প্রশ্ন এসেছে, 'মিচকে শয়তান' আর 'একটা পরামর্শদাতা'। এই যে আমাদের সামনে আসছে—এইযে যেভাবে সংসারের, জীবনের ক্ষেত্রে আমার প্রতিক্রিয়াটা যেখানে আসছে — সেখানে শেষেরটা যেটা, সেটাই বড় প্রশ্ন যে, আমার ভেতরে প্রশ্ন উঠেছে, এতকাল মা-শ্রীঅরবিন্দ ক'রে, তাহলে এইভাবে--- ফলটা কি হল? এই ঘটনাকে নিজেকে জোরের সঙ্গে বলতে হবে, যেটা তুমি নিজেই তুলে দিয়েছ, অর্থাৎ Aphorisms (চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি) এর একটা জায়গা থেকে, আবার Savitri (সাবিত্রী) থেকে--- এটা হচ্ছে, নিজেকে বোঝাতে হবে: 'আমি আমার মতো করে আমার গভীরতম, ঊর্ধ্বতম সত্তার সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি; কিন্তু, আমার করা না করার উপরে তাঁর শক্তির ক্রিয়া সীমাবদ্ধ নয়। আমি যেহেতু তাঁকে স্মরণ করেছি, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি --- এবং প্রতিমুহূর্তে আমার এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে তাঁর সামনে রাখছি; অতএব, তার যে বাইরের ফল এখন দেখা যাচ্ছে, সেইটে দিয়ে বিচার করা চলবে না।

অর্থাৎ, নিজেকে বিশ্বাস রাখতে হবে, ঐ যেমন উনি পরিষ্কার বলেছেন, ''এই পর্দার আড়ালে মা রয়েছেন, সময়ে দেখা দেবেন"—এখন এই অবস্থাটা চলছে। অতএব, লোকের কথা আর নিজের ভেতরের এই সমস্ত ফিসফিসানি পরামর্শের কথা --- এগুলির কোনও মূল্য নেই নিজের কাছে। নিজের মূল্য হচ্ছে : এই যা কিছু আসছে --- সমস্ত কিছুতে আমি যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি --- সেই সিদ্ধান্তটা আমার অন্তরাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিনা; কেননা, এখনই বলা যাচ্ছে না তা অন্তরাত্মা থেকে কিনা। আমি অবশ্য আমার স্তর থেকে বলছি।

আমি এখন একটা— at least (কমপক্ষে) যেটা করতে পারি— যখনই প্রতিক্রিয়াটা হয়— সাধারণত প্রাণিক মানসিক স্তর থেকেই হয় সেটাকে আস্তে আস্তে shift (সরিয়ে) করে আমি অন্তরাত্মার দিকে নিয়ে যাচ্ছি কিনা; এবং সেটার ক্রম progress

(উন্নতি) যদি ঘটতে থাকে---- তাহলে, আস্তে আস্তে ঐগুলো instrument (যন্ত্র) হয়ে যায়, অর্থাৎ mind (মন) এবং vital (প্রাণ); আর Real Actor (মূল কর্তা) হয়ে যাবে Psychic (চৈত্য), এই অভ্যন্তরস্থ সত্তা। এটা যদি হয়, তাহলে তো আর সমস্যা থাকার কথা নয়। ‘‘সমস্যা থাকার নয়” মানে আমাকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে “আমি সচেতনভাবে ওঁর সঙ্গে যুক্ত আছি কিনা বা যুক্ত থাকার চেষ্টা করছি কিনা।” তাতে লোকে পাগল বলুক, যা খুশী বলুক, অথবা আমার ভেতরে পরামর্শদাতারা এসে বলুক, “হ্যাঁরে, এতদিন তো এইসব কাণ্ড করলি, অন্যের চাইতে তোর আর কি পৃথক হল? তোর কপালেও তো এই জুটল!”এগুলির কোনও মূল্য নেই।

প্রশ্ন: আর, মাস্টারমশাই, ঐ কল্পনার ভয়টা?

উত্তর: ও তো ভেতরে ভেতরে ঐ পরামর্শদাতা! সে তো চিরকালই জিনিসটাকে ভণ্ডুল করতে চাইবে! সে বলবে, ‘‘এইসব তোমার Psychic -এর চিন্তা করা কল্পনামাত্র।” ...আমি তোমাকে Savitri -র ঐ জায়গাটা স্মরণ করতে বলি—যখন রাণী দীর্ঘ শোক প্রকাশের পরে শেষ লাইন বলেছিলেন, “তাহলে আত্মা অন্তরাত্মা যথার্থ সত্য না মিথ্যা” ইত্যাদি। নারদ বলেছিলেন,‘‘রাত্রি রয়েছে বলে কি সূর্য অনুপস্থিত?”

আমার এরকম একটা অন্ধকার phase (দশা) চলছে.... আজকে মুকুন্দ আমাকে এই কথা বলছে—কত বছর ধরে, কতদিন ধরে তাকে দেখছি, সে আমাকে কত বলেছে তাতে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা প্রতিনিয়ত— সে তো পৌঁছে যায়নি — আমরা তো সব একসঙ্গে সহযাত্রী! ... এই মনে হচ্ছে মুক্তির দুয়ারের মধ্যে এসে পৌঁছালাম, তার পরেই দেখছি আমার চাইতে বদ্ধ কেউ নেই! আর সেই বদ্ধতাকে আমি বিবেচনা করি যে সমস্ত ঘটনা আমাদের জীবনে আসে।... কে না এর ভেতর দিয়ে যায় নি? কেউ একবার outwardly (বাইরের থেকে) শ্রীঅরবিন্দ, মায়ের বাইরের জীবনটা চিন্তা করেছে?

এক্ষুনি আমার একটা কথা মনে পড়ছে--- মা-এর যে ছেলে আঁদ্রে, তার একটা স্মৃতিকথার মধ্যে পড়েছিলাম মা তো সেই কবে শিশুবয়সে তাকে ফেলে দিয়ে চলে এসেছিলেন...। তারপর, সে বড় হচ্ছে, যখন তার বয়স ১১ বা ১২ বা ১৩ হবে যে বাড়িতে সে ছিল, প্রতিদিন খাবার টেবিলে তাকে তার মা-র সম্পর্কে নানা কটু কথা শুনতে হত — ‘এই তো ছেলেকে ফেলে দিয়ে গেছে, কোথায় গেছে এইসব। একদিন নাকি, খাবার টেবিলে আঁদ্রে বসে আছে, ওর মন্তব্যটা আমার মনে আছে যে, চেয়ার থেকে তার পাটা মাটিতে পড়ত না, ঝুলে থাকত। অর্থাৎ এত ছোট! টেবিলে, ঐদিন, ওর মা সম্বন্ধে নানান কটু কথা হচ্ছে। মানে, যা হতে পারে, পারিবারিক জীবনে যা হয়। আচ্ছা, আজকে আমার এখানে যদি একটা ঘটনা ঘটে যে একটা বাচ্চাকে তিন বছর বয়সে তার মা ফেলে দিয়ে অধ্যাত্মসাধনার জন্য বেরিয়ে গেছে --- কি উত্তর হবে?

প্রশ্নকর্তা: Abnormal (উন্মাদ)

উত্তর: লোককে দোষ দেওয়া। আমিই তো সমালোচনা করব, কত যুক্তি দেখাব: 'ভগবান কত কি করেন—তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করবে--- সংসার জীবন' ---এই সমস্ত ! সেখানে আঁদ্রে বলছে, তখন কিশোরও হয় নি সে, চেয়ার বসলে মাটিতে পা-ও পড়েনা, সে ঐখান থেকে দাঁড়িয়ে বলছে "My Mother is Truth" ....এই লাইনটা আমি কখনো ভুলব না, "My Mother is Truth." My Mother is not following the Truth– my Mother is Truth. (আমার মা 'সত্য'কে অনুসরণ করছেন না, তিনিই সত্য)।

আমাদের ভেতরে সেই আঁদ্রে কে জাগিয়ে রাখতে হবে ---- আমার মা হচ্ছেন 'সত্য'— কত কথা তাঁকে নিয়ে এখনও বেরোচ্ছে....। এগুলো আসবে, যাবে.... সেটা শেষ কথা নয়। শেষ কথা হল আমার ভেতরের বিশ্বাস — My Mother is Truth,— 'আমার মা সত্য'..... বিশ্বের সমস্ত রকম ঘটনা আমাকে দোলাতে পারবে না। নিশিকান্তের কবিতাটার মানে, সেই কবচের মতো মনে রাখা দরকার—

কি হবে আমার বকুল বিলাসী
মলয় না যদি আসে
আমি তব মঞ্জরী
কি হবে আমার কল্পান্তের
প্রলয়ের প্রশ্বাসে
তুমি মোরে আছ ধরি

কবিও আমাদের মতো দুলেছেন---- কত লাইন! ...একটা কবিতা যে কত বড় আশ্রয় হতে পারে নিশিকান্ত তার পরিচয়।

আসল কথা তো, আঁদ্রে, নিশিকান্ত, অমুক তমুক, আমি, মুকুন্দ—সবাই তো যাত্রী রে বাবা, সবাই যাত্রী। মুকুন্দ যতই বলুক তাকে কিছু স্পর্শ করছে না— যদি স্পর্শ করে না থাকে, তবে তার মধ্যে এই দোলাচল আসে না। .....এই দোলাচল স্বাভাবিক— এ সাধনার স্তর, এর ভিতর দিয়ে আমরা প্রতিমুহূর্তে পুড়তে পুড়তে নিখাদ সোনা হয়ে চলেছি.......

প্রশ্ন: মাস্টারমশাই, আপনি অনেক সাহস দিয়ে দিলেন......

[২০০৮ সালে ফোনে এই রেকর্ডিং হয়। সেটি অনুলিখন করে ওনার কাছে পাঠালে উনি বলেন, "লেখা ঠিকই আছে। এখন থাক, এখনই সব publish কোরো না।" আজ তিনি পার্থিব শরীরে আমাদের মাঝে নেই। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজ নিবেদন করলাম।]*

---

*৩০শে মে ২০২৪ ঋতম সংখ্যায় প্রকাশিত এখন পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে সম্পাদকের অনুমতিক্রমে।

স্মরণে মননে বিশ্বনাথদা

স্বপন ভট্টাচার্য্য,
চন্দননগর

প্রথম দেখা সম্ভবত ১৯৮৫ সালে, কোনো এক বক্তৃতার আসরে। প্রথম ভাষণেই এক অপূর্ব অনুভূতি, এক অসাধারণ স্পন্দনে সমগ্র সত্তা অভিভূত, এক অদ্ভুত আকর্ষণের অনুভূতি সমগ্র অন্তরে। যেমন তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর, যেমন জাদুকরী শব্দচয়ন, তেমনই অপূর্ব বাচনভঙ্গি, দমকে দমকে একের পর এক স্তর অতিক্রম করে যেন উঠে যায় কোনো এক উর্ধ্বতন স্তরে। সেখান থেকে সরাসরি নেমে আসে সেই শব্দব্রহ্ম, অনুরণন তোলে শ্রোতার হৃদয়ের অভ্যন্তরে। সরাসরি সংযোগ হয় বক্তার সাথে শ্রোতার আন্তর সত্তার। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের প্রতি পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে অন্তর। অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে দুই চোখ।

সেই প্রথম পরিচয়। প্রথম পরিচয়েই তাঁর সাথে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপিত হলো যেন। তিনি আমাদের বিশ্বনাথদা। আমাদের চন্দননগরে লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার এলাকায় বন্ধু অনিমেষের (বর্তমানে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের আশ্রমিক) একটা পারিবারিক ওষুধের দোকান ছিল। সেই দোকানের পিছনদিকের একটা ছোট্ট ঘরে যেখানে তখনকার দিনের মিক্সচার ওষুধ তৈরি হতো, সেখানে সন্ধ্যাবেলায় বিশ্বনাথদা প্রায়শই আসতেন একটা ছোট সাইকেলে চেপে, কখনো হুগলী থেকে আবার কখনো ভদ্রেশ্বর থেকে। বিশ্বনাথদাকে মধ্যমণি করে আমাদের এক ব্যতিক্রমী আসর বসতো। বিষয় শ্রীমা এবং শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও কর্মসাধনা। আমাদের সঙ্গে থাকতো আর এক বন্ধু হীরেন, হীরেন মুখোপাধ্যায়, যে আর ইহলোকে নেই। সে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের গবেষক ছিল এবং পরে অধ্যাপক হয়েছিল। সে বেশ ভালো গান গাইতো। ভক্তিমুলক গান, মা-শ্রীঅরবিন্দর গান। বিশ্বনাথদা হীরেনের গান শুনতে খুব ভালোবাসতেন। হীরেন

তার জন্মদিনে হুগলী ভবনে কয়েকবার গান গেয়েছিল। পণ্ডিচেরীতেও বিশ্বনাথদা হীরেনের গান গাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আর পণ্ডিচেরীর পুণ্যভূমিতেই তার জীবনাবসান হয়েছিল। আরো দু-একজন মাঝে মাঝে আসতো। সেখান থেকেই বিশ্বনাথদার হাত ধরে আমাদের শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের সাধন পথে চলার শুভ সূচনা হয়েছিল। সে আজ প্রায় চার দশক আগের কথা। তারপরে বিধিনির্দেশিত পথে জীবন এগিয়ে গেছে, কিন্তু মনের মণিকোঠায় এখনও সেই ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতিগুলো অম্লান হয়ে আছে।

যত দিন যেতে লাগল, বিশ্বনাথদার সাথে এক অন্তরঙ্গ বন্ধন ক্রমে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে লাগল। হুগলী ভবনে যাওয়া শুরু হলো। প্রায় প্রতি রবিবারে, অনিমেষ, হীরেন আর আমি, এই তিন বন্ধু মিলে সাইকেলে চেপে নিয়ম করে হুগলী ভবনে যাওয়া শুরু করলাম। বহুবার এইভাবে হুগলী সেন্টারে গিয়েছি। সে এক অপূর্ব আনন্দযাত্রা। হুগলী ভবনে শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র দেহাংশ সমাধিস্থ হবার পরেও বহুবার গিয়েছি। রাত্রিবেলায় সমাধির চারিপাশের এক অপার্থিব মধুময় পরিবেশে অন্তর প্রশান্তিতে ভরে যেত, মা-শ্রীঅরবিন্দের দিব্য পরশ অন্তরে অনুভূত হতো, তাঁদের দিব্য স্পন্দনে হৃদয় স্পন্দিত হয়ে উঠত। আর একটা আনন্দের বিষয় ছিল, প্রতি বুধবার রাতে কোলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবন থেকে বাড়ী ফেরা। আমার অফিস ছিল পার্ক স্ট্রীটে। ছুটির পরে ভবনে যেতাম। অনিমেষ আসতো চন্দননগর থেকে আর হীরেন ওর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিশ্বনাথদা আসতেন ওনার কলেজ থেকে। আমরা তিনজনে ওনার সাবিত্রীর ক্লাশে যোগ দিতাম। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী সম্পর্কে ওনার বিশ্লেষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কোথা দিয়ে সময় পার হয়ে যেত বোঝাই যেত না। ফেরার সময় সেক্সপীয়র সরণী থেকে বাসে হাওড়া, তারপর ট্রেনে করে যে যার গন্তব্যে। আমি নামতাম মানকুণ্ডুতে, অনিমেষ আর হীরেন চন্দননগরে আর বিশ্বনাথদা চলে যেতেন হুগলীতে। বহুদিন ধরে সাবিত্রীর ক্লাশ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ওনার আনন্দ-সঙ্গ লাভ করেছিলাম। বাসে, ট্রেনেও চলতো মা-শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা। সে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। দৈনন্দিন কাজের মাঝে প্রতি সপ্তাহের ওই বিশেষ দিনটির জন্য থাকতো অধীর অপেক্ষা। ওনার ভারী ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিতাম। কেমন একটা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভালোবাসার মানুষকে উপহার দিতে ইচ্ছা করে। দাদার ব্যাগ পুরোনো হয়ে গেলে উপহার হিসাবে একটা করে ব্যাগ দিতাম। উনি সানন্দে গ্রহণ করতেন। উনিও আমাকে একটা উপহার দিয়েছিলেন, একটা ছবি, ছবিতে ছিল একটা সোনালী আলো, নীচে থেকে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, আর ছবির নীচে মায়ের নিজস্ব হস্তাক্ষরে লেখা আছে "The Grace will never fail us such is the faith we must keep constantly in our heart.

With my blessing” নীচে আছে মায়ের স্বাক্ষর। সেই ছবিটা ল্যামিনেশন করে বাঁধিয়ে রেখেছিলাম। ওটা এখনো আছে আমার ঘরে নিত্যদিনের ধ্যান ও প্রার্থনার জায়গায়, শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের ছবির পাশে। যদিও রঙটা একটু ফিকে হয়ে গেছে কিন্তু মায়ের হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর এখনো সেখানে জ্বলজ্বল করছে। হুগলী সেন্টারের সাথে সাথে ওনার বাড়িতেও যাতায়াত শুরু হয়েছিল। মাসীমা, মেসোমশাইয়ের সাথেও পরিচয় হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় ওনার বক্তৃতা শুনতে যেতাম। একবার ১৫ই আগস্ট সকালবেলায় কোলকাতার মহাজাতি সদনে ওনার বক্তৃতা হচ্ছিল। শ্রোতৃমণ্ডলের মধ্যে মাসীমা মেশোমশাইও ছিলেন। হঠাৎ লোড শেডিং, সমস্ত আলো নিভে গেলো, মাইক্রোফোন বন্ধ। মঞ্চে সামান্য আলোর ব্যবস্থা করা হলো। বিশ্বানথদা সকলকে শান্ত হয়ে বসে থাকার অনুরোধ করে বললেন যে, ওনার গলার জোর যথেষ্ট, উনি মাইক ছাড়াই বক্তৃতা দেবেন আর ওনার কথা সকলেই শুনতে পাবেন। ওনার বক্তৃতা আবার শুরু হলো, যে জায়গায় উনি থেমেছিলেন ঠিক সেই জায়গা থেকেই সমান তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বরে আবার শুরু করলেন, আর বক্তৃতার এক জায়গায় যখন অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার কথা বললেন ঠিক তখনই আশ্চর্যজনকভাবে প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বলে উঠল। কি অদ্ভুত যোগাযোগ। মায়ের কি অসীম কৃপা।

বিশ্বনাথদার সাথে বাংলার বিভিন্ন সেন্টারে ঘোরা শুরু হলো। অনেক সেন্টারেই গেছি, তার মধ্যে গোপালপুরের আকুনি সেন্টার, দিল্লী সেন্টার, আর পুরুলিয়া সেন্টারের কথা বিশেষভাবে মনে আছে। আকুনি সেন্টারে তখন মণিদা ছিলেন, যিনি এখন পণ্ডিচেরীর আশ্রমবাসী। ওখানকার মহিলা সদস্যেরা কিছু কিছু হাতের কাজ করতেন। সেন্টারের পক্ষ থেকে আমরা একটা করে ধুতি আর সোনালী সুতো দিয়ে মায়ের প্রতীকচিহ্ন তৈরি করা সাদা রুমাল স্মারক উপহার হিসাবে পেয়েছিলাম। ধুতিটা এখনো রাখা আছে। দিল্লী সেন্টারে ওনার বেলডাঙার এক ছাত্র তপন প্রামাণিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ওনার সাথে নিকটবর্তী অনিল বাবুর বাড়িতেও গিয়েছিলাম। সেখানে শ্রীঅরবিন্দের একটা পাথরের মূর্তি দেখেছিলাম। পুরুলিয়া সেন্টারে যখন গিয়েছিলাম তখন শ্যামলদা জীবিত ছিলেন আর সেন্টারটা ছিল শহরের মধ্যেই। এখন যেখানে সেন্টার হয়েছে সেই জায়গাটা তখন সবেমাত্র নেওয়া হয়েছিল। বিশ্বনাথদাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, জায়গাটা দেখে নতুন সেন্টার তৈরির পরবর্তী পরিকল্পনার বিষয়ে মতামত দেবার জন্য। মনে আছে, ফাঁকা জমিতে চারদিকে চারটে বড় গাছ ছিল, আর বিশ্বনাথদা অভিমত দিয়েছিলেন গাছগুলো রেখে দিয়েই নির্মাণকাজ করতে। আগেই বলেছি ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতি, তাই সময়ের হেরফের হতে পারে, ঘটনাক্রমগুলো সময়ের হিসাবে আগে পরে হয়ে যেতে পারে। ১৯৮৯ সালে একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল হুগলী সেন্টারের সকলের সাথে দল বেঁধে পণ্ডিচেরী থেকে

শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্স আনতে যাবার জন্য। প্রস্তাবটা বিশ্বনাথদাই দিয়েছিলেন, আমাকে আর অনিমেষকে। অনিমেষ গিয়েছিল কিন্তু অফিস থেকে ছুটি না পাওয়ার জন্য আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আবার বিশ্বনাথদার অনুপ্রেরণাতেই ১৯৯০ সালে দুর্গাপুজোর ছুটিতে আমার প্রথম পণ্ডিচেরী যাবার সুযোগ হলো। দক্ষিণসাগরতীরে মহাতীর্থ পণ্ডিচেরী, সঙ্গী অনিমেষ আর চন্দননগরেরই অন্য একজন। বিশ্বনাথদাই আমাদের থাকবার জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলেন। প্রণতি বৌদি আশ্রমের কাছাকাছি কোনো বাস স্টপেজ থেকে আমাদের তিনজনকে গেস্টহাউসে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বন্ধু দুজন একটা সাইকেল রিক্সায় আর আমি ছিলাম বৌদির সাইকেলের কেরিয়ারে। গেস্টহাউসটা ছিল বড় অনেস্টি স্টোরের বিপরীত দিকের একটা গলির মধ্যে, যেটা এখন আর গেস্টহাউস হিসাবে ব্যবহার করা হয় না। যেখানে কিছুদিন পরে ১৯৯১ সালে আশ্রমিক বন্ধু অনিমেষের প্রথম বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল বিশ্বনাথদারই সহায়তায়। জীবনের এক মহাসংকটময় মুহূর্তে চিরকালের জন্য চন্দননগর ছেড়ে চলে এসে বন্ধু অনিমেষ যখন পণ্ডিচেরীতে এক দিকভ্রান্ত পথিকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন বিশ্বনাথদাই ওর জন্য সব রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ডাইনিং রুমে খাবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। বিশ্বনাথদার আনুকূল্যে ওর সমগ্র জীবনটাই আমূল বদলে গিয়েছিল, যে কথা ও সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। আমার প্রথম আশ্রম দর্শনেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। অযাচিতভাবেই শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র সাধন গুহায় যাবার সুবর্ণ সুযোগ এসে গিয়েছিল। সম্ভবত দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিনে অনিমেষের জন্মদিন ছিল আর তাই ও শ্রীঅরবিন্দের ঘরে যাবার অনুমতি পেয়েছিল। সমাধির সামনে বসে আছি, হঠাৎ একজন আশ্রমিক এসে বলে গেলেন, যারা যারা শ্রীঅরবিন্দের ঘরে যেতে চান মেডিটেশন হলে চলে যান। কি পরম সৌভাগ্য, কি অহৈতুকী কৃপা! মা-ই প্রভুর ঘরে প্রণাম নিবেদনের ব্যবস্থা করে দিলেন। ভিতরে ভিতরে একটা আস্পৃহা তো ছিলই। আরও একটা ঘটনা মনে আছে। তখন আশ্রমের মূল দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে জুতো রাখার ব্যবস্থা ছিল। একদিন সমাধি প্রণাম সেরে জুতো নিতে গিয়ে দেখি জুতো অদৃশ্য। বিশ্বনাথদা বলেছিলেন, তার মানে তোমাকে আবার এখানে আসতে হবে। আশ্রম থেকে চলে আসার দিন সমাধি সংলগ্ন ঘড়িটার নীচে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কেন জানিনা মনটা হু হু করে উঠলো, দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো। বিশ্বনাথদা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মন খারাপ কোরোনা আবার তো আসবে। সেই সান্ত্বনায় এক নিখাদ ভ্রাতৃস্নেহের পরশ ছিল।

বিশ্বনাথদার হাত ধরেই মা-শ্রীঅরবিন্দের পথে পথচলা শুরু হয়েছিল। আমার মতো আরো অনেকে ওনার হাত ধরেই এই পথে এসেছিল। ওনাকে কেউ কেউ মজা

করে ছেলেধরা বলতেন। সেটা উনি নিজেও জানতেন। বিশ্বনাথদার মধ্যে ছিল মানসিক শক্তি ও প্রাণশক্তির প্রাবল্য আর ছিল এক অপরিসীম কর্ম শক্তি। মা-শ্রীঅরবিন্দের বাণী ও ভাবধারা প্রচার ও প্রসারের কাজে ছিল ওনার অন্তহীন প্রচেষ্টা। উনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে মায়ের এক কর্মীসন্তান। হুগলী সেন্টারকে নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। বাস্তুকার না হওয়া সত্ত্বেও বাস্তুশিল্প সম্পর্কে ওনার এক পূর্ণাঙ্গ ধারণা ছিল। মনে আছে, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের সম্পাদকের ভার নেওয়ার দিনে হঠাৎ ওনার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওনার কাছে মা-শ্রীঅরবিন্দের কাজই সর্বদা প্রাধান্য পেত কিন্তু সাংসারিক কর্তব্যও সমানভাবে পালন করতেন। তাই বাবার চিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেই উনি কোলকাতার পাঠমন্দিরে গিয়েছিলেন সেখানকার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। কি অসম্ভব মনের জোর। সাধারণভাবে মানুষ এ কথা ভাবতেও পারে না। অনেক ঘটনা স্মৃতির পর্দায় ভেসে ভেসে উঠছে। উনি তরুণদের খুব ভালোবাসতেন, তাদের মা-শ্রীঅরবিন্দের কথা শোনাতেন, তারা ওনার কথায় নিজের অজান্তেই হয়তো অন্তর্জীবনের একটা সন্ধান পেত, মা-শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে আরো বেশি কিছু জানার অন্বেষা তাদের অন্তরে জেগে উঠত। বিভিন্ন আশ্রমিকদের জীবনকথা তরুণদের শোনাতেন। তারা কিভাবে আশ্রমে এসেছেন, মা তাদের কিভাবে সাধন জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন, সেই সব কথা। মনে পড়ে যাচ্ছে উনি একজন আশ্রমিকের কথা বলেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন। খুব ভালো গান গাইতেন। রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, মা তাঁকে গান শেখাবার কাজ দেবেন। কিন্তু মা তাঁকে পানীয় জল বিতরণের ঘরে কাজ দিয়েছিলেন। আশ্রমিকদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য মাটির পাত্র ছিল। আশ্রমিকরা সেই পাত্রগুলো ভরার জন্য কলের নীচে রাখলে, ওনার কাজ ছিল কল খোলা আর বন্ধ করা। মায়ের শর্ত ছিল, পাত্রের বাইরে যেন একটুও জল না পড়ে কিন্তু পাত্র যেন পুরোপুরি ভর্তি হয়। প্রথম প্রথম অসুবিধা হতো, বাইরে জল পড়ে যেত। কিন্তু কাজ করতে করতে এমন হলো যে পাত্র পূর্ণ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ওনার হাত কল বন্ধ করার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সচল হয়ে উঠত। তারপর থেকে আর কোনো ভুল হতো না। একটুও জল বাইরে পড়ত না আর জলের পাত্রও পুরোপুরি ভর্তি হয়ে যেত। সেই আশ্রম সাধিকা নিজে বিশ্বনাথদাকে এই ঘটনা বলেছিলেন। বিশ্বনাথদার ব্যাখ্যা ছিল, সাধিকা নিজে ভালো গান জানলেও গান শোনার ক্ষেত্রে হয়তো পুরোপুরি মনঃসংযোগ করতে পারতেন না। মা কাজের মাধ্যমে ওনাকে সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। এমন অনেক ঘটনা বিশ্বনাথদা আমাদের শোনাতেন আর সেগুলোর নিগূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। মা-শ্রীঅরবিন্দের বই, তাঁদের নিয়ে লেখা বই পড়তে বলতেন। উনি নিজেও প্রচুর পড়াশোনা করতেন। এইভাবে উনি মা-শ্রীঅরবিন্দকে জানার জন্য আমাদের বিশেষভাবে

আগ্রহান্বিত করে তুলেছিলেন। উনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন শিক্ষক, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শক।

চন্দননগরের সাথে বিশ্বনাথদার এক গভীর সংযোগ ছিল। লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারে শ্রীঅরবিন্দ কালচার সেন্টারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উনি প্রায়শই বক্তৃতা দিতে আসতেন। পরে যখন বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হলো, ওখানেও উনি বহুবার বক্তৃতা দিয়েছেন। দুটি সেন্টারের প্রতিই ওনার অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। নিজে নিরলস কর্মী ছিলেন, তাই সেন্টারের কর্মীদের খুব ভালোবাসতেন। চন্দননগর রেল স্টেশনে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠার এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে উনি উপস্থিত থেকে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। চন্দননগরে প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ের বাড়ির যে ঘরে শ্রীঅরবিন্দ কয়েকদিন ছিলেন, সেই ঘরে অনিমেষ আর আমি প্রায়ই গিয়ে বসে থাকতাম। বিশ্বনাথদাও চন্দননগরে এলেই ওই ঘরে আসতেন। প্রভুর স্পর্শধন্য সেই ঘরের চুন সুরকি দিয়ে পেটানো মেঝেতে ছিল এক স্নিগ্ধ শীতলতা। ঘরের মধ্যে ছিল এক অখণ্ড নীরবতা, এক দিব্য স্পন্দন। চন্দননগরেরই এক ভক্ত যখন সেই ঘরের মেঝে ভেঙে ফেলে সেখানে মার্বেল পাথর বসিয়ে দিলেন, বিশ্বনাথদা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন; বলেছিলেন, উনি এটা কি করে করলেন? প্রভুর দিব্য পরশ মুছে গেল। সেই ভাঙা মেঝের কিছু টুকরো সংগ্রহ করে রেখেছি, অনেক ভক্তকে দিয়েওছি। বিশ্বনাথদা আমার এবং অনিমেষের বাড়িতেও এসেছিলেন। ওনার মেয়ে পরমার বিবাহ অনুষ্ঠানেও আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। ওনার সাথে কেমন একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হুগলী ভবনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বহুবার গিয়েছি। যথেষ্ট আন্তরিক আপ্যায়নও পেয়েছি। একবার বিশ্বনাথদা অনুরোধ করলেন, ওখানকার বার্ষিক পত্রিকার জন্য কিছু বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দেবার জন্য। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, সফলও হয়েছি। সময় গেছে, বিশ্বনাথদার সাথে অন্তরঙ্গতাও উত্তরোত্তর বেড়েছে। ২০১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ কালচার সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় পণ্ডিচেরী থেকে চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র দেহাংশ নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কাজের জন্য সেন্টারের পক্ষ থেকে বিশ্বনাথদার সাহায্য প্রার্থনা করা হলে উনি সানন্দে রাজি হলেন। কালচার সেন্টারের নিজস্ব কোনো জায়গা না থাকায় একটা জমি কেনার প্রস্তাব নেওয়া হলো। কালচার সেন্টারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে একযোগে উনি বেশ কয়েকটা জায়গা দেখলেন। একটা জমির বায়নাও দেওয়া হলো। কিন্তু মায়ের অসীম কৃপায় অলৌকিকভাবে প্রবর্তক সঙ্ঘের যে ঘরে শ্রীঅরবিন্দ বাস করেছিলেন ঠিক তার পাশের বাড়িটাই পাওয়া গেলো। সে এক অলৌকিক ঘটনা। জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু হলো। বিশ্বনাথদা নিয়ম করে কালচার সেন্টারে আসতে লাগলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে লাগলেন। উনি পুরোভাগে থেকে সমস্ত ব্যবস্থা করতে লাগলেন। অন্য সেন্টারেও রেলিক্স আনার

ব্যাপারে ওনাকে প্রধান ভুমিকা পালন করতে দেখেছি। ঠিক হলো কালচার সেন্টারের সকলের সঙ্গে উনিও রেলিক্স আনতে পণ্ডিচেরী যাবেন। কোনো আভ্যন্তরীণ কারণে আমি পণ্ডিচেরী যেতে চাইনি। উনি একদিন ফোন করে বললেন, তোমার যাওয়া উচিৎ, কারণ তুমি একজন ট্রাস্টি। তা সত্ত্বেও আপত্তির কথা জানাতে উনি বললেন, দেখ, তোমাকে কিন্তু অন্য কেউ ট্রাস্টি করেনি, স্বয়ং মা তোমাকে ট্রাস্ট করেন, তাই তুমি ট্রাস্টি হতে পেরেছো। তুমি নিশ্চয়ই যাবে। শরীরে এক দিব্যস্পন্দন অনুভূত হলো। এর পরে আর কোনো কথা চলে না। আমাকে যেতে হলো। এই হলেন বিশ্বনাথদা। ওনার পরামর্শ যে বিধিনির্দ্দিষ্ট ছিল, সেটা পণ্ডিচেরীতে গিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম। ওনার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ, কারণ ওনার পরামর্শ অনুসরণ করেই আমার এই পার্থিব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ঘটেছিল, এ জীবন সার্থক হয়ে গিয়েছিল, ধন্য হয়ে গিয়েছিল। কোন জন্মের কোন পুণ্যফলে জানিনা, আশ্রম কর্তৃপক্ষ আমার মতো একজন অকৃতী অধমের হাতে প্রভুর দিব্য দেহাংশ তুলে দিয়েছিলেন। মা-শ্রীঅরবিন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অন্তর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মা-শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকৃপা অন্তরে অনুভূত হয়েছিল। কিছু ব্যক্তিগত ঘটনা উল্লেখ করতে হলো, যেগুলোর সাথে বিশ্বনাথদা ওতপ্রোত ছিলেন।

বিশ্বনাথদা একাধারে ছিলেন প্রখ্যাত ভাষ্যকার, গবেষক ও সাহিত্য সাধক। উনি ত্রিজ রায় ছদ্মনামে লিখতেন। সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ সন্তানদের দ্বিজ বলা হয়। মা-শ্রীঅরবিন্দের পথে আসার পরে ওনার হয়তো উপলব্ধি হয়েছিল যে উনি তৃতীয় জন্ম লাভ করেছেন, তাই ওই নাম। ওনার গবেষণামূলক দুটি গ্রন্থের কথা মনে পড়ছে। 'শ্রীঅরবিন্দ ও হুগলী' এবং 'শ্রীঅরবিন্দ ও চন্দননগর'। ওনার সংকলন ও গ্রন্থনায় কোলকাতার শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির থেকে শ্রীঅরবিন্দের নির্বাচিত রচনা সংকলন গ্রন্থ 'হে চিরদিনের' এবং শ্রীমায়ের নির্বাচিত রচনা সংকলন গ্রন্থ 'হে সবিতৃবাণী' প্রকাশিত হয়েছিল। পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে ওনার সম্পাদনায় কবি নিশিকান্তের কাব্য সংকলন 'চিরন্তনী' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে পদার্পণের দিনটি সম্পর্কে বিতর্ক ছিল। বিভিন্ন বইয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য ছিল। এই বিষয় নিয়ে বিশ্বনাথদার সাথে প্রায়ই আলোচনা হতো। উনি ওনার গবেষক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দিনটিকে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। সম্ভবত ২০১০ সালে একবার পণ্ডিচেরীর আনন্দ রেড্ডি আর বিশ্বনাথদার সাথে চুঁচুড়া থেকে চন্দননগরে আসার সময় ওই বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনার মাঝে বলেছিলাম, মতিলাল রায়ের যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ বইয়ে শ্রীঅরবিন্দের ১৯১০ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি চন্দননগরে আসার কথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে। বইটির ৩৩ নং পাতায় লেখা আছে যে, "শ্রীঅরবিন্দ ২১শে ফেব্রুয়ারী চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন।" বইটি বাংলা ১৩৭৬ সালে প্রবর্তক সঙ্ঘ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে শুনেছি আশ্রমের এক বক্তৃতায়

বিশ্বনাথদা ওই দিনটিকেই (২১-০২-১৯১০) শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে আসার দিন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যেহেতু শ্রীমায়ের জন্মদিনও ২১শে ফেব্রুয়ারি, তাই শ্রীমায়ের জন্মদিনের সাথে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে আসার দিনটির নিশচয়ই কোনো আধ্যাত্মিক সংযোগ ও তাৎপর্য আছে, যা আমাদের মতো সাধারণ মা-শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগীদের কাছে এক গভীর আনন্দের বিষয়। বইটির পুনর্মুদ্রণ হয় ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অধ্যাপক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায়। বিশ্বনাথদা নিজে লিখতেন এবং অন্যকেও লেখার কাজে উৎসাহিত করতেন। ওনারই অনুপ্রেরণায় শ্রীঅরবিন্দের কিছু সনেট বাংলায় অনুবাদ করার সুযোগ হয়েছিল। এর পরেও আরও কয়েকটি বইয়ের অনুবাদের কাজেও উনি নিরন্তর উৎসাহ দিতেন। ওনার উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির থেকে শ্রীঅরবিন্দের ‘Letters on Yoga’-র চারটি ভল্যুম বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ‘Letters on Yoga Volume III’ - এই ভল্যুমটি অনুবাদ করার ভার উনি আমার উপরে দিয়েছিলেন। সে কাজ এখনও চলছে।

একসময় বিশ্বনাথদাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। দেখেছি মা-শ্রীঅরবিন্দের কাজে ওনার অপরিসীম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। প্রবল প্রাণিক শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ওনার মধ্যে কোনোদিন অহংবোধ দেখিনি। চরম অপমানের মুহূর্তেও ওনাকে একেবারে ধীর, স্থির থাকতে দেখেছি। ওনার কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছি। বিশ্বনাথদা আমাদের সকলকে খুব স্নেহ করতেন, বন্ধুর মতো মিশতেন। উনি চাইতেন, তরুণ প্রজন্ম শ্রীমা এবং শ্রীঅরবিন্দকে জানুক, তাঁদের কথা বোঝার চেষ্টা করুক, তাঁদের পথে চলতে শিখুক। যতদুর জানি, উনি সরাসরি কাউকে এই পথে আসতে বলতেন না, কিন্তু বক্তৃতার মাধ্যমে, অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার মাধ্যমে সকলের অন্তরে শ্রীমা এবং শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা তৈরি করে দিতেন। মানুষকে অনুপ্রাণিত করতেন মা-শ্রীঅরবিন্দের পথ অনুসরণ করতে। ওনার অনুপ্রেরণাতেই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গেছি, শ্রীমা এবং শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানতে পেরেছি। জীবন পাল্টে গেছে, আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছি। উনি ছিলেন আমাদের প্রকৃত পথপ্রদর্শক। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে ওনার ছিল ব্যাপক পরিচিতি। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের দর্শন মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উনি ঝড়ের মতো ছুটে বেড়িয়েছেন। শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করেও বাংলার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় উনি ছুটে গিয়েছেন শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের কথা শোনাতে।

সাধারণভাবে আমি মন, প্রাণ ও শারীরিক বিকাশের অনুশীলনেই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু তাছাড়াও যে, চেতনার এক বিশাল জগত আছে, তার বিভিন্ন স্তর আছে, তার

বিবর্তন আছে, এসব কথা ওনার মুখেই প্রথম শুনেছি। ধর্মে আমার কোনোদিনই মতি ছিল না। কিন্তু বিশ্বাস ছিল ধর্মকে ছাড়িয়েও হয়তো কিছু আছে। সেটা যে আধ্যাত্মিকতা তা ওনার কাছ থেকেই প্রথম জেনেছি। আধ্যাত্মিকতা শব্দটার সাথেই কোনো পরিচয় ছিল না। আধ্যাত্মিকতা কি, সেই জীবনে কিভাবে প্রবেশ করতে হয়, কিভাবে সেই পথে এগিয়ে যেতে হয়, সেই সবকিছুর সন্ধান ওনার সাহচর্যেই পেয়েছি। উনি বেহালায় চলে যাবার পরে অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই ওনার সাথে সংযোগ কিছুটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল, তবে ওনার বেহালার বাড়িতেও গিয়েছি। পরের দিকে মাঝে মাঝে সভা সমিতিতে দেখা হলে কুশল বিনিময় হতো, সকলের খোঁজখবর নিতেন আর কাজে উৎসাহ দিতেন। আরও পরে একবার হুগলী ভবনেই ওনার স্বগতোক্তি শুনেছি, "যেন মায়ের কোলের শিশু হতে পারি।"

বিশ্বনাথদার এই স্মৃতিলেখায় আরো অনেকের কথা উঠে এসেছে, যা হয়তো প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়েছে। ভগবান জগতে কিছু কিছু মানুষকে পাঠান, যারা সাধারণ জীবনের গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে অন্য এক উৎকৃষ্টতর, মহত্তর এবং শ্রেয়তর জীবনের পথে এগিয়ে যাবার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং সেইসঙ্গে অন্য মানুষকেও সেই জীবনপথে এগিয়ে যাবার রসদ যোগান। বিশ্বনাথদা ছিলেন সেই মানুষ, যিনি শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের পরম কৃপাধন্য, যিনি আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে তাঁদের স্বর্ণালোকিত পথে চলার সন্ধান দিয়ে গেছেন। উনি মায়ের প্রকৃত সন্তান, আমাদের বিশ্বনাথদা। পরমাত্মার সাথে একাত্মতা লাভের উদ্দেশ্যে দেহান্তরের যাত্রাপথে ওনার অন্তরাত্মার ক্রমিক অগ্রগতির জন্য শ্রীমায়ের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানাই।

বিশ্বনাথদার কাছে যা শিখেছি

সোমা রায়চৌধুরী
হুগলী

১৯৯৭-এর ২৬শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পারিবারিক বন্ধু প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন বাড়িতে। একথা সেকথার পর বললেন একবার জগুদাসপাড়া যাবেন? একটা ক্লাসের ব্যাপারে কথা আছে। বললেন, একজন প্রফেসরের ক্লাস তিনি নিয়মিত করেন। সাহিত্যের ছাত্রী, বললাম, কি পড়াচ্ছেন এখন? শুনলাম, 'সাবিত্রী'। এর আগে কাকুর বইয়ের আলমারিতে বইটি শুধু বন্ধ কাঁচের দরজা দিয়ে দেখেছি। বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, যদিও জগুদাসপাড়া শ্রীঅরবিন্দ ভবনে কন্যা French class করেছে। বাড়ির অন্যান্যরা সেখানে গেছেন তাকে দিয়ে এবং নিয়ে আসতে। আমি কখনও উৎসাহ বোধ করিনি। যদিও ১৯৯৫-এর ২১শে ফেব্রুয়ারী আশ্রমে মায়ের ঘর দর্শন হয়ে গেছে শ্রদ্ধেয় দুর্গাদার (দুর্গাদাস মুখার্জী) চাপে পড়ে। সমুদ্র, উদার আকাশ আর ফুলের অপরূপ সজ্জা ছাড়া আর কিছুই তেমন ভালো লেগেছিল এমনটা নয়। কিন্তু যেটা হ'ল, প্রশান্তদার কাছে শুনে হুগলী শ্রীঅরবিন্দ ভবনে প্রতি সোমবার ক্লাসে যাওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে গেল।

প্রথম যেদিন ক্লাসের খবর নিতে ভবনে যাওয়া কোনদিন তা ভোলার নয়। বহু শ্রোতৃবৃন্দের মাঝে অনাহুত হয়ে এক দাদা এবং এক দিদির মাঝে বসে পড়া। সত্যদা আর অণিমাদির স্মিত হাসিতে প্রথম দিনেই আমার অতীত জীবনের কোন এক বন্ধন যেন মুক্ত হয়ে গেল। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নামলেন বিশ্বনাথদা। সত্যদা বলেছিলেন, "এ হলো বিশ্বনাথ, ক্লাসের শেষে আপনার সাথে কথা হবে।" সমাধিতে প্রণাম সেরে মেঝেতে নির্দিষ্ট আসনে বসে সামনের ছোট টেবিলটা টেনে নিলেন। আগে থেকেই 'সাবিত্রী' রাখা ছিল, বিশ্বনাথদা কাঁধের ব্যাগ থেকে কয়েকটা চিরকুট বের করে সবার দিকে আলতো চোখ বুলিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু থেমে বই খুললেন। আমার সঙ্গে আমার ছয় বছরের পুত্র। সত্যদা সস্নেহে তাকে এক পাশে বসিয়েছিলেন,

বললেন, “আজকের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রোতা।” কিছু বোঝার আগেই জীবনের যেন এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গেল।

Book II– The Book of the Traveler of the worlds– Canto I– The World-Stair– Page – 95.

“In a deep oneness of all things that are / The universe of the Unknown arose.

সাবিত্রীর পাঠক হতে পারার সৌভাগ্য যাঁর হাত ধরে তিনি এক বিরল ক্ষমতার অধিকারী। প্রফেসর, সুদক্ষ সংগঠক, অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী, নিমগ্ন পাঠক, লেখক, গবেষক, নাট্যকার, সুঅভিনেতা এবং চিত্রশিল্পী। কিন্তু তাঁর থেকে ব্যক্তিগতভাবে যে কয়েকটি দিক আমার ভিতর বিভিন্ন ধরণের বদল এনে দিয়েছে তার অন্যতম হল তাঁর বাগ্মীতা। জ্ঞানী, অল্প জ্ঞানসম্পন্ন এমনকি প্রায় অর্ধশিক্ষিত যে কোন ধরণের শ্রোতার কাছে তিনি যেভাবে ‘মা- শ্রীঅরবিন্দ’কে তুলে ধরতেন তা সত্যই আশ্চর্যের। প্রথম দিনের ক্লাসে যখন অণিমাদি তাঁর ‘সাবিত্রী’ বইটি আমাকে এগিয়ে দিলেন, মনে হয়েছিল অনেক পর থেকে শুরু করছি, হয়তো কিছুই বুঝে উঠতে পারবনা। কিন্তু বিশ্বনাথদা তো বিশ্বনাথদাই। মুখবন্ধটি প্রতি ক্লাসে এমনভাবে উপস্থাপিত হ’তো যাতে যে কোন নতুন মানুষ কিছুটা বুঝে নিতে পারে। সোমবারের ক্লাস চলতে লাগল আর বিশ্বনাথদার কথনে যেন আমার মতো সাধারণ মানুষের কাছেও তা মূর্ত হয়ে উঠতে থাকল। তবে আমার কাছে আজও যা বিস্ময়কর তা হ’লো , প্রশান্তদা, যে মানুষটি আমাকে ‘সাবিত্রী’র সাথে যুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাকে কোনদিন ভবনে আসতে দেখিনি। আর একদিন ক্লাসে এক দিদি ‘Mystic’ শব্দটি নিয়ে আলোচনা করতে অনুরোধ করেছিলেন, বিশ্বনাথদা বলেছিলেন পরের ক্লাসে তৈরি হয়ে আসবেন, এসেওছিলেন, সঙ্গে ছিল অনেক প্রস্তুতি। কিন্তু সেই দিদি আর কোনদিন ক্লাসে আসতে পারেননি। তবে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি শব্দটি প্রসঙ্গে। ক্লাস চলতে লাগল বছরের পর বছর ঘুরে। তেমন কথা হয় না, কেবল মৃদুস্বরে কয়েকটি সাধারণ কথা ব্যতিরেকে এবং সাবিত্রীর কথা।

দেখলাম, শিখলাম একজন সফল সংগঠক কেমন হন, একজন মায়ের নিঃস্বার্থ কর্মী কেমন হন। এক সন্ধ্যায় ক্লাসের শেষে ভবনের দোতলায় প্রথম অনেকক্ষণ কথা হ’ল। বললেন, ‘শুনেছি তুমি একটি স্কুল পরিচালনা করো, মায়ের কাজের জন্য ভবনকে যদি সময় দিতে পারো তবে তোমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমি ভেবেছি।’ বলেছিলাম, ‘দাদা, আমার মেয়ের Board Exam শুরু হবে, আমি কি পারবো?’ তিনি যা বলেছিলেন আজও তা আমার পাথেয় , বলেছিলেন, ‘তুমি মায়ের কাজ করো, মা তোমার সব কাজের ভার নেবেন।’

স্কুল শুরু হ'ল। স্কুল সেক্রেটারি করলেন, কিন্তু যে জায়গাটা উনি আমাকে দিয়েছিলেন আমি আজও হয়তো তার যোগ্য হয়ে উঠতে পারিনি। বলেছিলেন, 'তুমি স্কুলে রোজ এসো, তোমার উপস্থিতিটিই প্রয়োজন।' কাজ দিলে কোনদিন তার ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দিতেন না। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করেছি, শিখেছি কিভাবে শিশুদের অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করতে হয় মায়ের কথায়, মায়ের কাজে।

শিশুকাল থেকেই ভালো করে কিছু না বুঝেই যেকোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার যে কুঅভ্যাস আমার ছিল, বিশ্বনাথদার কাছ থেকে এক ধমকে তা অনেকটাই চলে গিয়েছে। সোমবারের ক্লাস সেরে বিশ্বনাথদার সঙ্গী হয়েছি ট্রেনে, বেশ ফাঁকা, দুজনে মুখোমুখি বসেছি। বিশ্বনাথদার একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি নিজে থেকে কোন প্রসঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। ক্লাসে পড়ে আসা বিষয়টি নিয়ে আর একটু শুনতে চাইলাম, মায়ের কথা বলতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছি। হঠাৎ চন্দননগর থেকে একজন যাত্রী উঠলেন। চোখে মুখে উদ্বেগ, বেশ কিছুটা বিধ্বস্ত। আমার পাশের সিটটিতে বসে আমাদের যেন জরিপ করতে লাগলেন। বিশ্বনাথদা পরিস্কার গলায় বললেন, 'এদিকে এসে বসো।' পুনরায় আলোচনা চলতে লাগল। হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা কি আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কথা বলছেন?' একটু যদি জোরে বলেন, আমার শোনাটা খুব জরুরি।' বিশ্বনাথদা জানালা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিলেন বাইরের অন্ধকারে আর উদ্গ্রীব আমি ক্রমাগত ভেবে চললাম ভদ্রলোকের হয়তো কোন সাহায্য প্রয়োজন, আমি আলাপ করতে লাগলাম। জানলাম, উনি সাংসারিক এমন এক পরিস্থিতির শিকার যে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন পথ তার কাছে খোলা নেই। বললাম, 'আপনাকে দাদা হয়তো সাহায্য করতে পারেন।' কিছুটা বিরক্ত বিশ্বনাথদা। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের আলোচনা আমার খুব ভালো লাগছে। যদি একটু জোরে বলেন!' আমাকে স্তম্ভিত করে বিশ্বনাথদা বললেন, 'তুমি বলো, তুমিই পারবে।' কি বলেছিলাম আজ আর মনে পড়ে না, কিন্তু ভদ্রলোক যেন কিছুটা স্বস্তি বোধ করছিলেন। উত্তরপাড়া আসতে করজোড়ে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে যেতেই বিশ্বনাথদা বললেন, 'কি হ'তো বলতো যদি ভদ্রলোক ট্রেনের মধ্যেই আমাদের সামনে কিছু দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতেন!'

বর্তমান বিজ্ঞানও বলছে চেতনার প্রয়োজনানুসারে আমাদের সঙ্গে সেই মানুষেরই দেখা হয় যাঁরা আমাদের কিছু না কিছু যুক্ত করেন জীবনপ্রবাহে। বিশ্বনাথদা এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাঁর সাথে যে কোন রকম অসুবিধার কথা ভাগ করে নেওয়া যেত। যদিও, অনেকেই হয়তো আমার সাথে সহমত প্রকাশ করবেন যে সব আলোচনার শেষে সার কথা থাকত - 'মা'কে বলে স্থির থাকো।

কখনও বিশ্বনাথদার কোন কাজে সম্মতি না থাকলে তা অনায়াসে বলা যেত আর

উনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চোখ বন্ধ করে সামান্য উষ্মা প্রকাশ করে বলতেন , ‘‘আহা, তুমি যদি বোধ কর এটা সঠিক নয় তো তুমি নিজে করে দেখ। তবে হ্যাঁ, তোমার কথা যে রাখা হবে এ ভাবনাকে প্রশ্রয় দিও না।’’ এ যে কত বড় শিক্ষা আমাদের জীবনে! বলতেন, ত্রুটি দেখে চুপ করে থাকাটাও মায়ের কাছে অপরাধ।

মায়ের কর্মী বিশ্বনাথদার আর একটা চমকপ্রদ দিক আমার কাছে বিস্ময়কর লাগত। স্কুলে হয়তো সেদিন ক্লাস শেষে মিটিং হবে টিচারদের নিয়ে। মিটিং শেষে আমরা যারা বাসে বাড়ি ফিরব রাস্তায় অপেক্ষা করছি বাসের জন্য। বিশ্বনাথদা একটি ব্যাগ কাঁধে গ্রীষ্মের দুপুরে হেঁটেই ভবনে যাবেন। একদিন বলেছিলেন, নিজের একটু স্বস্তির জন্য সময় নষ্ট করা যাবে না। উনি যেন কোন কিছুর জন্যই মায়ের কাজকে অপেক্ষায় রাখতেন না।

মায়ের কর্মী কেমন হন তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকবেন বিশ্বনাথদা আমার কাছে। একদিনের একটি অভিজ্ঞতা দিয়ে শেষ করব। আমাদের কসবার ফ্ল্যাটে সাতষট্টিটা সিঁড়ি ভেঙে বিশ্বনাথদা দু'বছর একটানা ক্লাস করেছেন। এলাকার বহু মানুষ তাঁর কাছে প্রথম মা- শ্রীঅরবিন্দের নাম শুনেছেন। এমনই এক ক্লাসের দিন। বাইরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, ফ্ল্যাটের নীচে কোমর-সমান জল। বেলার দিকে ফোন করলাম , ‘‘কি করবেন?’’ বললেন , ‘‘তোমার ওখানে অনেকে অনেকটা দূর থেকেও আসেন। যদি একজনও মায়ের কথা শুনতে আসেন, আমি যাব।’’ এবং আক্ষরিক অর্থে বিশ্বনাথদাকে সেদিন প্রায় পাঁজাকোলা করে নামাতে হয়েছিল সিঁড়িতে। আমার পুত্রের পাড়ার দুই বন্ধু বলেছিল , ‘জ্যেঠু, বড় হয়ে যেন তোমার মত কর্মী হতে পারি।’ বিশ্বনাথদা ছাদে বসে নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিয়েছিলেন , ‘মাকে বলো।’

একবার মাঝ-আকাশে আমাদের ফ্লাইট টার্বুলেন্সে পড়ায় আমি দীর্ঘদিন ট্রমাটাইজড ছিলাম। বিশ্বনাথদা আমাকে কলকাতা ভবনে ‘সাবিত্রী’ ক্লাসের দিন আসতে বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ Fear and Death নিয়ে আলোচনা করে শেষে SABDA থেকে নিজে বই কিনে নিয়ে এসে পাতা খুলে পড়িয়েছিলেন।

এসব ঋণ শোধ হবার নয়। যেভাবে চিরদিন মনে রাখব কৃতজ্ঞ চিত্তে, চলে যাবার আগে আমার ওপর ভরসা রেখে সুযোগ করে দিয়েছিলেন Jawaharlal Indoor Stadium– Cuttak এ বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করার।

শেষ কথা হয়েছিল ৫ই মে। ক্লান্ত শরীর, মজা করে বলেছিলাম , ‘আমি কি নাট্যকার বিশ্বনাথ রায়ের সাথে কথা বলছি?’ বুঝতে পারিনি তখনও, এই শেষ হ'ল আমার সাথে বিশ্বনাথদার এ জীবনের সংলাপ। কিন্তু, ঐ যে , ‘শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?’ আমাদের সম্পর্ক মায়ের মধ্যে শাশ্বত হয়ে থাকবে।

তবে হ্যাঁ, ফোনের কনট্যাক্ট লিস্টে আজও ৯৮৩৬XXX২০৮-টা ‘‘বড় জ্যেঠু’’ বলে সেভ করা আছে।

আচার্যের পদপ্রান্তে নতজানু এক শিক্ষার্থীর স্মৃতিচারণায় অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়

(১৬-০৪-১৯৪১— ২২-০৫-২০২৩)

ড. বুদ্ধদেব মণ্ডল

নৈহাটি

উনিশশো ছিয়াত্তর। হ্যাঁ সালটা উনিশশো ছিয়াত্তরই। বেলডাঙ্গা অঞ্চলের কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের প্রায় সব স্কুলেরই অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তখন হায়ার সেকেণ্ডারীর পর মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা কলেজেই ভর্তি হতো। সেবছরও হয়েছিল। বাসপথে, ট্রেনপথে বা হাঁটাপথে কিংবা সাইকেলে যেভাবেই তারা আসুক না কেন। আমিও ছিলাম সেবছর তাদের মধ্যে একজন। কলেজের পুরো নামটি প্রথম প্রথম কিছুতেই মনে রাখতে পারতাম না। সংক্ষিপ্তটিই মুখে মুখে চালু ছিল। বেলডাঙ্গা এস. আর. এফ কলেজ। পুরো নাম বেলডাঙ্গা শিউনারায়ণ রামেশ্বর ফতেপুরিয়া কলেজ। কেন এমন নাম? জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম ঐ নামের ব্যক্তিবর্গের আর্থিক আনুকূল্যেই কলেজটি গড়ে উঠেছে। তাই কলেজের ললাটে উনাদের নামই জ্বলজ্বল করছে। অবশ্য কলেজটি দেখলেই বোঝা যেত যে তার বয়স বেশি নয়। কোন কোন ঘরের মেঝেতে ইট পাতা; দেওয়াল প্লাস্টারের পোঁচ থেকে বঞ্চিত। আবার কয়েকটি ঘর ভিত পর্যন্ত হয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। কলেজটিতে পড়াশুনা যেমনই হোক সম্ভাব্য সব বিষয়ে অনার্সের কৌলিন্য জোটেনি। 'বাংলা', 'দর্শনশাস্ত্র' ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানেই একমাত্র অনার্স পড়ার সুযোগ ছিল সে সময়। সেই ছিয়াত্তরসালে আমি ছিলাম ঐ কলেজের ছাত্র—বাংলা অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি। প্রথম কয়েকদিন সব ক্লাসের রুটিন তৈরি না হওয়ায় শুধুমাত্র অনার্সের ক্লাসগুলিই হয়েছিল। স্কুলে পড়ার সময় কেবল প্রথম পিরিয়ডেই

মাস্টার মশায় নাম ডাকার খাতা নিয়ে ঢুকতেন। কলেজে এসে দেখলাম সব স্যারই সব ক্লাসে খাতা নিয়ে আসছেন। কোন স্যার এর কি নাম তখন জানা ছিল না। রুটিনে ইংরেজি আদ্যক্ষরে H.C, A.K.D, S.M. ও B.R.- এই চারজনের নাম-ছিল। তখন আমাদের কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন এই চারজনই। পরে ইংরেজি অক্ষরগুলি বিকশিত হয়ে নামরূপ ধারণ করেছিল H.C.= হিরণ্ময় চ্যাটার্জী, A.K.D.= অশোক কুমার দাস, S.M. শ্রীহরি মাইতি, এবং B.R.= বিশ্বনাথ রায় মানে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়।

কলেজটি ছিল দ্বিতলবিশিষ্ট ইউ (U) প্যাটার্নের। দোতলায় মাঝারি সাইজের একটি ঘরে বাংলা অনার্সের প্রথমবর্ষের প্রথম ক্লাস। জলচৌকির বিস্তৃত পাটাতনের উপর টেবিল ও চেয়ার পাতা। দ্বিতীয় কি তৃতীয় পিরিয়ডে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় এসেছিলেন। ধবধবে ফর্সা চেহারা, ততোধিক ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবী। যাকে বলে একেবারে গৌরকান্তি—নিটোল সুদর্শন চেহারা। নামডাকা খাতাটি টেবিলে রাখতে রাখতে সামনে কারা আছে তা একবার ভাল করে দেখে নিলেন। চেয়ারে বসে ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা হিসেবে রোল নম্বর না ডেকে নাম ধরে ধরে ডাকলেন। নাম ডাকার ফাঁকে চেহারার সাথে নামের মেলবন্ধন যেন ক্যামেরাবন্দী করে নিলেন। কিছুক্ষণ কথা শোনার পর বুঝলাম তাঁর কথা বলার স্টাইল অন্যদের থেকে আলাদা। আমাদের মতো 'গেলাম', 'করলাম', 'খেলাম', 'বললাম' না বলে, তিনি বলতেন-'গেলুম, করলুম, খেলুম, বললুম' ইত্যাদি-ক্রিয়াপদে রাঢ়ীবাংলার আদি কলকাতার ছাপ স্পষ্ট। আরো কিছুটা সময় গড়াতেই কণ্ঠস্বরের তীব্রতা, স্পষ্টতা ও মাধুর্যে আমরা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছিলাম।

আজো মনে আছে সেইকথা। প্রথম ক্লাসে নাম ডাকার পর উনার জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আমরা কে কোথায় থেকে এসেছি এবং কত নম্বর পেয়েছি জানালাম। তারপর ধেয়ে এল সেই অমোঘ প্রশ্ন 'তোমরা বাংলা অনার্স নিয়েছো কেন?' সে সময় এরকম প্রশ্ন করার একটি কারণ ছিল। বাংলা অনার্স পড়ে চাকরী পাওয়া ছিল দূর অস্ত। বাজারদর একেবারে পড়তির দিকে। স্বভাবসুলভ রসিকতায় যোগ করলেন, 'জানোতো একটা গল্প চালু আছে। উপরদিকে ঢিল ছুড়লে যার মাথায় এসে পড়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে অবলীলাক্রমে বলে সে বাংলা অনার্সের।" পরে অবশ্য আশ্বাসবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন 'এতে হতাশ হবার কিছু নেই। পড়াশুনা করে ভাল রেজাল্ট করতে পারলে চাকরীর দরজা সব সময়ই খোলা।' উত্তর তো একটা কিছু দিতেই হবে, প্রশ্নটি যখন করেছেন স্যার। লজ্জায় মাথা নীচু করে কেউ জানালো 'ফিলসফি, পলসায়েন্স পড়তে আমার ভাল লাগেনা, তাই বাংলা।' কেউ বললো 'সাহিত্যের প্রতি আমার আলাদা একটা আকর্ষণ আছে।' আমার পালা এলে বললাম, 'আমার কোন উপায় নেই তাই।' 'সেটি কিরকম? স্যারের জিজ্ঞাসা।

বললাম—'হায়ার স্টাডি করতে না পারলে পলসায়েন্স, ফিলসফিতে চাকরীর সম্ভাবনা কম, আমার বাড়ির যে অবস্থা তাতে আবার হায়ার স্টাডি-র সম্ভাবনা কম। অথচ একটা কিছুতে অনার্স না নিলে আত্মীয়-পরিজন বন্ধুমহলে প্রেস্টিজ থাকে না। তাই বাংলা অনার্স।' প্রথমদিন বিশেষ কিছু না পড়িয়ে কবে কি পড়াবেন তারই রুটিন জানিয়ে দিলেন স্যার। তারপর কি কারণে জানিনা, বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে আমাদের প্রশ্ন করলেন। তোমরা 'পুষ্প' কথার অর্থ জানো? আমার মতো ক্লাসের সবাই হয়তো তখন ভাবছিল—এ তো আমরা প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময় থেকে জানি। এর নিশ্চয় গভীরতর অন্য অর্থ আছে। স্যার নিশ্চয় এত সহজ উত্তরের প্রশ্ন করেননি! শ্রেণীকক্ষে একেবারে পিনপতনের স্তব্ধতা। টেবিল থেকে খাতাটি নিয়ে বেরনোর সময় স্যার হাসতে হাসতে বলে গেলেন ‘‘সে কী! তোমরা 'পুষ্প' মানে 'ফুল' এটিও জাননা?’’ অনেক অনেক নম্বর পেয়ে আমরা যারা অনার্স পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাদের গর্বের বেলুনটা একেবারে চুপসে গেল। 'এটিও জাননা?’’ এই কথা কটি সারাজীবন বিদ্রূপের বর্শা হয়ে আমাদের বিদ্ধ করেই গেল। এই সহজ উত্তরটা জেনেও আমরা কেউ উচ্চারণ করলাম না। 'পুষ্প' কথার অর্থ বলতে না পেরে আমরা সেদিন সত্যসত্যই ইংরেজি 'ফুল' (Fool) বনে গিয়েছিলাম।

বেলডাঙ্গা একটি মফস্‌সল শহর। শিয়ালদা-লালগোলা মেইন রেললাইন বেলডাঙ্গা স্টেশনের উপর দিয়ে গেছে। ৩৪ নং জাতীয় সড়কও যেন রেললাইনকে পাশে পাশে নিয়ে চলেছে। বহরমপুর থেকে রাধানগর ঘাট পর্যন্ত বাস রাস্তা বেলডাঙ্গা শহরের বুক চিরেই এগিয়েছে। এই বেলডাঙ্গাতেই একমাত্র কলেজ 'Beldanga S.R.F. College।'রেলপথে দেবগ্রাম, পাগলাচণ্ডী, পলাশী, রেজিনগর ভাবতা, সারগাছি স্টেশন হয়ে ছাত্র-ছাত্রী যেমন আসত, তেমনি আসত বাসপথে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী আন্ডিরণ, ভাদড়, বেগুনবাড়ি, কাজিশা, কালীতলা, এলিয়টনগর, ত্রিমোহিনী, ঝাউবনা, শব্দনগর, আমতলা, পাটকাবাড়ি প্রতি গ্রাম থেকে। আমার গ্রামের নাম ঝাউবনা। আমি আসতাম সেখান থেকে।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়-এর নামটি ছাত্রদের মধ্যে খুব সহজেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কারণ হিসেবে বলা যায় ঘন্টা বাজার সাথে সাথে ক্লাসরুমে উপস্থিত হওয়া; ছাত্র-ছাত্রীদের নামে চেনা ও নাম ধরে ডাকা; কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য ও মাধুর্য, উপস্থাপনাতেই সকলকে মুগ্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি। স্টুডেন্টমহলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে স্যারের ক্লাস করলে রেফারেন্স পড়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করার প্রয়োজন নেই। বাংলা অনার্সের ছাত্র হওয়ায় স্যারের সান্নিধ্য বেশি বেশি পাওয়ার গর্ব তো আমাদের ছিলই, সে সামনে থাকুন আর না থাকুন। মনেতে ছিল তাঁর নিত্য আসা যাওয়া।

এই আসা যাওয়ার মাত্রা ক্রমশ বেড়েই চললো। একটি অবশ্য কর্তব্য কর্মে আমরা

বিভোর হয়ে গেলাম। টেনইয়ার্স কোয়েশ্চান পেপার থেকে প্রশ্ন নির্বাচন করে, প্রস্তুত করা উত্তরপত্রটি স্যারকে দিয়ে মূল্যায়ন করিয়ে নেওয়ার কাজটি চলতেই থাকল অবলীলাক্রমে। বিশ্বনাথবাবু উত্তরপত্র পরীক্ষা করে প্রাপ্তব্য নম্বর লিখে দিতেন। ফলে কোন উত্তর তৈরিতে ঘাটতি থাকছে কি না তা আমরা আগাম জেনে যেতাম। থাকলে সংশোধিত উত্তরপত্র পুনরায় মূল্যায়িত হয়ে ফেরত আসত। আমরা এতটাই সহযোগিতা পেয়েছিলাম স্যারের কাছ থেকে।

প্রথমবর্ষের নির্বাচনী পরীক্ষা। অনার্স পরীক্ষার প্রথম মূল্যায়ন। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অবশ্য কলেজটিচাররাই করতেন। আমাদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। উদ্বেগ এবং কৌতূহল হাত ধরাধরি করে চলেছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পনের দিনের মাথায় যে স্যার যে খাতা দেখেছেন সেই সব খাতা দেখালেন। বিশ্বনাথবাবু ক্লাসে এলে উত্তরপত্র হাতে নিয়ে দেখলাম প্রায় সবাই আমার থেকে বেশি নম্বর পেয়েছে। গোল গোল লাল দাগে একেবারে রক্তাক্ত উত্তরাঞ্চল। (উত্তর অঞ্চল) ভালোভাবে লক্ষ করে দেখলাম, একই বানান তিন-তিনবার ভুল করেছি। বানানটা ছিল 'পশ্চাতে'। আমি লিখেছিলাম 'পশ্চাৎে'। আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না 'পশ্চাৎ' বানান যদি 'ৎ' (খণ্ড-ত) দিয়ে লেখা যায়, তবে এ-কার দিয়ে দিলে 'পশ্চাৎে' শুদ্ধ বানান হবে না কেন? মূর্খামি আর কাকে বলে? ফলে যা হবার তাই হল। স্যার বললেন 'উত্তর ঠিকই আছে কিন্তু এই ভুলের জন্য তুমি দশ পার্সেন্ট নম্বর কম পেয়েছো।' আরো সতর্ক করলেন : 'বুদ্ধ'। তোমার হাতের লেখা খুবই সুন্দর, কিন্তু অত্যন্ত ডেকোরেটেড। এই ডেকোরেশন কমাতে হবে।' সে সময় হাতের লেখা নিয়ে আমি জোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি। পেন ছুটিয়ে স্যারেদের ক্লাস লেকচার নোট করে ফেলছি। সেগুলি আবার বন্ধুদের দিয়ে প্রশংসা কুড়োচ্ছি। লেখা পাতায় চোখ বুলালে দেখা যেত কোথাও শব্দের শেষ অক্ষর পরবর্তী শব্দের আদ্যক্ষরের সঙ্গে হয় করমর্দন করছে না হয় লেজ দিয়ে নাক মুখে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। একদৃষ্টে পাতাটির দিকে তাকালে মনে হত এ যেন ভেরেণ্ডা গাছে আলোকলতার জটিল বিন্যাস!

স্যারেদের স্টাফরুম ছাত্রমহলে সব সময়ই একটা কৌতূহলের জায়গা। তবে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়কে সেখানে বেশিসময় পাওয়া যেত না। পাওয়া যেত না মানে উনি সেখানে খুব কম সময় থাকতেন। প্রথম কারণ কলেজ গেটের বিপরীতে তিরিশ সেকেণ্ড দূরত্বে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন স্যার। হয় সেই বাড়িতে যেতেন অথবা লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতেন। একটি নৈমিত্তিক ঘটনা আমাদের চোখসওয়া হয়ে গেছিল। প্রতিদিনই দেখতাম প্রথম বা দ্বিতীয় পিরিয়ডের পর ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত এক ভদ্রলোক, হাতে একটি ক্যান নিয়ে যে রাস্তাটি কলেজের পাশদিয়ে পেছন দিকের জনবসতিতে চলে গেছে সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অদৃশ্য হয়ে

যাচ্ছেন, আবার কিছুক্ষণ পর ফিরতি পথে দৃশ্যমান হচ্ছেন। পরে জেনেছি স্যার ঐ সময় অফ পিরিয়ডে আগে থেকে ঠিক করে রাখা এক বাড়িতে গরুর দুধ আনতে যেতেন। সে দৃশ্য আজও চোখে ভাসে!

বাসপথে বা ট্রেনপথে বেলডাঙ্গা কলেজে পৌঁছাতে হলে ছাপাখানা বাসস্ট্যান্ড হয়ে যেতে হয়। ঝাউবনা থেকে বেলডাঙ্গা পর্যন্ত সেসময় বাসভাড়া ছিল যাটপয়সা। স্টুডেন্ট কনসেশনে লাগত ওয়ান-থার্ড কুড়ি পয়সা। ফলে যেতে আসতে প্রতিদিন চল্লিশ পয়সা খরচ হত। কিন্তু এই চল্লিশ পয়সাই আমাদের মত অভাবী সংসারে একটা ধর্তব্যের বিষয় ছিল। টেক্সট বই কেনা যেখানে সাধ্যাতীত, সেখানে রেফারেন্স কিনতে চাওয়া দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কি? বিশ্বনাথবাবু আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানতেন। তিনি লাইব্রেরিয়ানকে বলে তাঁর নামে একসাথে তিন-চারটে বই নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। লেন্ডিং কার্ডে স্যার সই করে দিতেন। বই সম্পর্কিত সব দায়িত্ব তিনি বহন করতেন। বন্ধুদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি, অনার্স পড়াকালীন ঐ তিন বৎসর তিনি কীভাবে আমার ক্ষেত্রে 'গুরুদায়িত্ব' পালন করে গেছেন।

পার্টওয়ান অনার্সের রেজাল্ট আউটের পর আমার মনে অহং-এর একটু ছোঁয়া লেগেছিল। স্যার বাড়িতে ডেকে একটু বেশি প্রশ্রয় দেওয়া ছিল তার কারণ। সেসময় লিটারেচার-এ সিক্সটি পার্সেন্টের কাছাকাছি নম্বর পাওয়া একটু গৌরবের বলে গণ্য করা হত। আমরা চার-পাঁচজন গৌরবের সেই সীমানায় পৌঁছে কলেজে 'বিশেষ' তকমায় চিহ্নিত হয়েছিলাম। বিষয় নিয়েই তখন ভীষণ ব্যস্ত, বিষয়ান্তরের খোঁজ কে রাখে।

সে খোঁজ হঠাৎই একদিন এসে গেল। কমনরুমের হৈ হট্টগোল ঠেলে একটা তথ্য মাথায় ঢুকে প্রতিষ্ঠা পেল, তা হল কলেজ ছুটির পর আমাদের পরিচিত কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী স্যারের বাসায় হাজির হচ্ছে। বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠেছিল এই ভেবে, তাহলে আমাদেরই কেউ কেউ আরো ভালো রেজাল্টের জন্য গোপনে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। ফিলসফি অনার্সে আমার খুব ভালো এক বন্ধু ছিল। নাম তার অপূর্ব। সত্য উদ্ঘাটিত হল তার কাছ থেকেই। আশেপাশে থাকা বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী প্রাক্ সন্ধ্যায় স্যারের বাসায় উপস্থিত হয়ে একটি নতুন বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে-সেটির নাম 'মেডিটেশন'। নীরব অবস্থানে সমবেত আত্মানুসন্ধান। বিষয়ান্তরের সন্ধানে ডুব দেওয়া।

আমিও সেখানে যথারীতি যাওয়া শুরু করে দিলাম। একটু একটু করে বুঝলাম সিলেবাস ভিত্তিক পড়াশুনার বাইরে বেশ কিছু চর্চার বিষয় আছে। দেখতাম প্রতিদিন দু'জনের বাঁধানো ফটো অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পরিষ্কার করা হচ্ছে সে ফটো শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের। একথা স্বীকার করতেই হবে সে সময় অরবিন্দ ঘোষ নামের আগে 'শ্রী'

ব্যবহারের শ্রদ্ধা ও প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। সেটা এসেছিল পরে। স্যার মেডিটেশন, মূলগ্রন্থ থেকে পাঠ ও আলোচনার শেষে বাড়িতে পড়ার জন্য আমাদের হাতে ছোট ছোট বই তুলে দিতেন। আজও মনে আছে আমার হাতে প্রথম যে বইটি এসেছিল, যা পড়ে আমি বিষয়ান্তরের খোঁজ পেয়েছিলাম। সেটি 'শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের নূতন বার্তা।' আরো যেসব পুস্তিকা হাতে এসেছিল সেগুলি হ'ল-'শ্রীঅরবিন্দের যোগ', 'শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি', 'চৈত্যসত্তা,' 'শ্রীমায়ের জীবন ও সাধনা', 'দিব্যজীবনের সন্ধানে' ইত্যাদি।

ফ্রয়েড তখনও আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। সাধারণ ভাবনাচিন্তার বাইরে যে এতবড় জগৎ আছে তার ইঙ্গিত পেয়ে আমরা বিস্ময়ে 'থ' হয়ে গিয়েছিলাম। বিস্ময়ে আরো অভিভূত হয়েছিলাম এই ভেবে, যিনি অনার্সের ক্লাসে 'কাব্যজিজ্ঞাসা' পড়াতে গিয়ে বোঝাচ্ছেন 'যা শ্রেষ্ঠকাব্য তা বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে।' সেই বিষয়ান্তরের চর্চা যে তাঁর বাড়িতেই হচ্ছে, একথাটি কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও ক্লাসে বা কলেজ চত্বরে একবারের জন্যও উচ্চারণ করেননি। এমনই ছিল তাঁর জীবনশৈলী।

বিশ্বনাথবাবু কলেজের ছুটিতে বেলডাঙ্গায় না থেকে শুনেছিলাম পন্ডিচেরি চলে যেতেন। আরো জেনেছিলাম ছোট্ট ঐ একরত্তি মেয়েকে (পরমা যার নাম) তিনি পন্ডিচেরি আশ্রমস্কুলে ভর্তি করেছেন। যার জন্য স্যারের স্ত্রী সেখানে আশ্রমের কাছাকাছি কোন ভাড়াবাড়িতে থাকেন। ছুটিতে স্যার যখন যেতেন বেলডাঙ্গার সেই ভাড়াবাড়ির চাবি আমার সেই বন্ধু অপূর্বকে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। পরে জেনেছি সেটি শুধু নিছক বাসস্থান নয় এক অর্থে 'শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র'ও বটে।

কেন্দ্রটিকে যথাসময়ে খোলা ও বন্ধ করা, ঘরদোর ঝেড়ে মুছে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে রাখার ব্যাপারে অপূর্বকে সাহায্য করতে আমিও কখনো কখনো হাত লাগাতাম। একটি বিশেষ অন্যায় দুজনে মিলে তখন করেছিলাম, স্যারকে তা কোনদিন বলতেও পারিনি। ঘরের মধ্যে একটি বড় পুরনো আমলের গ্রামোফোন ছিল। ঘর বাড়ি পরিষ্কার করে ধূপ জ্বালিয়ে চোখ বন্ধ করে সেটিকে চালিয়ে রেকর্ডের গান শোনা ছিল আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাস। স্যারের অনুপস্থিতিতে লোকজন খুব একটা আসতো না। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে দু-চারটে রেকর্ড ছিল। একই গান রোজ শুনতাম। গভীর নীরবতায় আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে শব্দ ও সুর এক অনবদ্য ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করত। 'আধ্যাত্মিক' শব্দটি এখনকার প্রয়োগ, তখন সে জ্ঞান ছিল না। চোখ বন্ধ করে নিজের মধ্যে ডুবে যেতাম গভীর থেকে আরো গভীরে। স্মৃতির সরণী বেয়ে সেখানে পৌঁছে গেলে, আজও শুনতে পাই 'তোমারই দেওয়া প্রাণে তোমারই দেওয়া দুখ' 'ওরা চাহিতে জানেনা দয়াময়', 'কেন বঞ্চিত হব চরণে',

'জাগাও পথিকে ও যে ঘুমে অচেতন', 'আমি সকল কাজের পাই যে সময়...' ইত্যাদি গানগুলি যে বিষয়ান্তরের সদর দরজায় পৌঁছে দিত সে' বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

অনার্স পাশ করার পর স্যারের সঙ্গে যোগাযোগের স্বাভাবিক সূত্রটি ছিন্ন হয়ে গেল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. তে ভর্তি হওয়ার সুবাদে কলকাতাতেই থাকার কথা। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে এক বন্ধুর সহায়তায় আমার থাকার জায়গা জুটেছিল নৈহাটীর এক মেসে। মেসটির নাম 'কমার্শিয়াল মেস্'। নৈহাটী থেকে শিয়ালদা ট্রেনে, তারপর পায়ে হেঁটে ইউনিভার্সিটি। এইভাবে দুবছর চললো। মাস্টার ডিগ্রির কোর্সও শেষ হয়ে গেল। পি. এইচ. ডি. করার জন্য খোঁজ খবর নিতে ট্রেনে যাতায়াত একেবারে বন্ধ করা গেল না। হঠাৎ একদিন নৈহাটী স্টেশনে ২নং প্লাটফর্মে দেখলাম ধবধবে সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবী পরে বসে আছেন, আমাদের প্রিয় অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়। তাড়াতাড়ি গিয়ে মাথা নোয়াতেই

-'আরে বুদ্ধ। তুমি এখানে?'

- 'স্যার আমি নৈহাটীতেই থাকি। একটি মেসে। এখান থেকেই এম. এ. পড়াটা শেষ করেছি।'

-'এরপরে কি করবে ভাবছ?'

-'পি. এইচ. ডি. করার জন্য গাইডের সন্ধানে আছি। তার আগে মাদরালে বি. এড. করার কথা ভেবেছি।'

-'ঠিক আছে, এসব যা ভেবেছো করো। আগামী রবিবার যদি ফাঁকা থাক তাহলে বিকেলে লঞ্চ পেরিয়ে ওপারে রিক্‌শ করে পিপুলপাতির মোড় যাবে। সেখানে কাউকে জিজ্ঞেস করে নেবে জগুদাসপাড়াটা কোন দিকে? সেখানে তোমার কাজ হল ত্রিদিব বাবুর বাড়ি কোনটি চিনে নেওয়া। ওখানে আমি থাকব। অনেক কথা বলার আছে। অবশ্যই আসবে।'

স্যার বেলডাঙ্গা কলেজ ছেড়ে চলে এসেছেন কি না তখনও সেটা আমি জানি না। পরে শুনেছিলাম বেলডাঙ্গার আগে তিনি মুর্শিদাবাদের ঔরঙ্গাবাদ কলেজে বেশ কিছুদিন পড়িয়েছেন এবং চাকরীজীবনের শেষ দশ বছর (কমবেশি) পড়িয়েছেন কলকাতার দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজে। পূর্ব কথামতো রবিবার বিকেলে জগুদাসপাড়ায় ত্রিদিব বাবুর বাড়ি খুঁজে নিলাম। দেখলাম সামনের গ্যারেজ ঘরটিতে কয়েকজন বসে আছেন, আবার কেউ কেউ আছেন সামনে দাঁড়িয়ে। আমি একটু আগেই পৌঁছে ছিলাম। স্যার তখনও আসেননি। তিনি এলে বুঝতে পারলাম 'শ্রীঅরবিন্দ পাঠচক্রে' যোগ দিতে এই সমবেত উপস্থিতি। অনুষ্ঠান শেষে আমাকে আলাদা করে স্যার জানালেন 'আত্মিক উন্নতি করতে আন্তরিক হলে পাঠচক্রের বিকল্প নাই। কয়েকদিন নিয়মিত এলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।' গুরুবাক্য শিরোধার্য করে মাসের পর মাস পাঠচক্রে উপস্থিত

থেকে স্যারের বক্তৃতার একজন গুণমুগ্ধ শ্রোতা হয়ে গেলাম। ক্লাস লেকচার অনেক শুনেছি এখন বিষয় শুধু 'শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা'।

১৯৮৭/আগস্টে চাকরী পাওয়ার পর যখন তখন যত্রতত্র বেরিয়ে পড়ার সুযোগ ও স্বাধীনতা গেল হারিয়ে। স্যারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সম্ভাবনা অনেক গেল কমে। তাছাড়া টিকে থাকার জন্য সেসময় প্রচুর টিউশনি করতাম। চাকরী পেলেও সেসব সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া গেল না। ফলে স্যারের সঙ্গে সত্যিসত্যিই দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু সে ছিল সাময়িক। ১৯৮৯/ফেব্রুয়ারী মাসের কোন একসময় স্যারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নৈহাটীর সেই ২নং প্ল্যাটফর্মে। জলদগম্ভীর সেই কণ্ঠস্বর 'আরে বুদ্ধ! কি অদ্ভুত যোগাযোগ! মনে মনে তোমাকেই তো খুঁজছি। কোথায় ছিলে এতদিন?' চাকরী পাওয়ার কথা জানাতেই ভীষণ খুশি। চাকরীর জায়গাটি কোথায়, কোথায় থাকছি, খাওয়ার কি ব্যবস্থা করেছি সব জেনে নিলেন। পরে আমাকে খোঁজ করার আসল কারণটি বললেন ঃ

'চাকরী পেয়েছো, খুবই ভাল কথা। এখন তো টাকা পয়সার সে অভাব নেই? আমরা ৬০/৬৫ জন লোক একটি কামরা রিজার্ভ করে পন্ডিচেরি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাচ্ছি। এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। যেতে চাইলে এত টাকা এত তারিখের মধ্যে কলেজস্ট্রীট পাঠমন্দির অথবা আমার কাছে জমা দিও। অগ্রিম টিকিট কাটতে হবে।' জমা দেওয়ার তারিখ ও কত টাকা সেসব এখন আর মনে নেই। এতগুলো লোক একসঙ্গে কি জন্য যাচ্ছে সেসব নিয়ে মোটেই কৌতূহল দানা বাঁধেনি। একটি বাক্যই তখন মূল সুর বেঁধে দিয়েছিল 'এ সুযোগ কিন্তু জীবনে আর আসবে না'। 'স্যার বলছেন' আর 'স্যারের সঙ্গে যাচ্ছি' এই ভাবনা মথিত হয়ে অন্তরে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল।

১৯৮৯/২৪ শে আগস্ট। রাত্রি আটটা। হাওড়া স্টেশন থেকে মাদ্রাজ মেল। পুরো কামরাটাতেই আমাদের লোক। নিজের জায়গা খুঁজে নেওয়ার আগে নির্দেশ এসে গেল মহিলা ও বয়স্করা নীচে। স্যার আমাকে তাঁর কাছের একেবারে উল্টোদিকের আপারে উঠে যেতে বললেন। সেই রাত্রিটি দ্রুত কেটে গেল। মজা শুরু হল পরের দিন। তাও আবার আমাকে নিয়ে। ট্রেনপথে বেড়াতে যাওয়ার আমার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। বেলডাঙ্গা থেকে শিয়ালদা এবং শিয়ালদা থেকে বেলডাঙ্গা বা বড়জোর বহরমপুর কোর্ট-এই ছিল আমার বড় মাপের ট্রেনযাত্রা। জামাকাপড় ও প্রয়োজনীয় টুকিটাকি নিতে আমি নিয়েছিলাম ঢাউস এক ভি. আই. পি. লাগেজ-যা সহজে নড়ানো চড়ানো যায় না। ব্যাগের সাইজ দেখেই স্যার চমকে উঠলেন 'এটা কী? কী আছে এতে?' আমি জানালাম 'আমার যা আছে এতেই আছে।'

কামরার অন্যান্যদের দেখে মরমে মরে যাচ্ছি। সবার কাছেই ছোট ছোট ব্যাগ। খাবারের ব্যাগ, জল রাখার ব্যাগ, সব আলাদা আলাদা। আমার কাছে ছোট কোন

ব্যাগই নেই। এমনকি জল রাখার বোতল পর্যন্ত নেই। আমার সাধের ভি. আই. পি. টিকে জানলার ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ল। স্যার সেটিকে দেখিয়ে কৌতুক শুরু করলেন 'বুদ্ধ একা পন্ডিচেরি যাচ্ছে। এই দেখ একার ব্যাগ। সঙ্গে জলের বোতল পর্যন্ত নেই! তোমরা কেউ পারবে?' যারা এতক্ষণ আমাকে খেয়াল করেননি দেখলাম তারাও ঘাড় উঁচিয়ে আমাকে দেখতে থাকলেন। আমি তো লজ্জায় মরে গেলাম!

পাশ থেকে কেউ কেউ জানালেন, 'আমাদের কাছে প্রচুর জল। অসুবিধা হবে না।' মনে মনে ভাবলাম যা হবার তা তো হয়েই গেছে! এরপর তিন চার ঘণ্টা অন্তর স্যার নিজের ব্যাগ থেকে কিছু খাওয়ার সময় আমাকে একটি করে মিষ্টান্ন জুগিয়ে গেলেন। ভাবতে থাকলাম যে মানুষটি আমাকে নিয়ে হাসির ভিয়েন চড়ালেন তিনি আমার প্রতি কত যত্নশীল কত সচেতন। এটা অবশ্য কলেজ লাইফ থেকেই দেখে আসছি মজার ঘটনা আরো মজার করে বলতে তিনি ভালোবাসতেন। তবে সে পরিবেশনায় রসিকতা থাকলেও চটুলতা থাকত না।

পন্ডিচেরি পৌঁছে দু-একদিন থাকার পর জেনেছিলাম বেঙ্গল থেকে ৭০/৮০ জন অনুরাগী এসেছেন শ্রীঅরবিন্দের দেহাবশেষ নিয়ে যেতে। ফলে আশ্রমের পক্ষ থেকে অতিথি সৎকারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমি ছিলাম 'নিউ সুইট হোমের' চারতলায়। দলগতভাবেই সব কিছু অনুসরণ করেছিলাম। স্যারের সাথে মাঝে দেখা হলেও কথা বিশেষ হয়নি। ফেরার পথে কামরায় তাঁর ব্যস্ততা একেবারে তুঙ্গে। শ্রীঅরবিন্দ ফিরছেন স্বভূমে একেবারে রাজকীয় মর্যাদায়! অন্তত ভক্তের মুখে তেমনই শোনা।

পন্ডিচেরি যাওয়ার আগে নৈহাটী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে সান্ধ্যবিভাগে পার্টটাইম লেকচারার পদে ইন্টারভিউ দিয়ে জয়েন করবার কল লেটার পেয়েছিলাম। স্যার সেটি জানতেন। ট্রেন তীব্র গতিতে ছুটছে। গন্তব্য হাওড়া স্টেশন। ৩১শে আগস্ট রাত্রে স্যারের জিজ্ঞাসা -'তোমার জয়েনিং কবে যেন?

-'পয়লা সেপ্টেম্বর'। শুনে স্যার প্রতিক্রিয়া দিলেন—

-'১লা সেপ্টেম্বর? ও দারুণ দিন। মায়ের প্রসপারিটি-ডে।

মাকে স্মরণ করে কাজে লেগে যাও।'

১লা সেপ্টেম্বর একটু বেলার দিকে হাওড়া স্টেশনে শ্রীঅরবিন্দ রেলিক্স নামল। রেলবিভাগের পক্ষ থেকে এই আগমনবার্তা বার বার ঘোষিত হচ্ছিল। স্টেশন চত্বর লোকে লোকে ছয়লাপ। ভীড় ঠেলে স্যারের অমোঘ বাক্য অন্তরে নিয়ে কলেজে জয়েন করতে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম।

সময় বয়ে যেতে থাকল তার স্বাভাবিক ছন্দে। আমি স্কুল, কলেজ, সংসার নিয়ে কর্মব্যস্ততায় একেবারে ডুবে গেলাম। শ্রীঅরবিন্দ চর্চাও যেন মুখ থুবড়ে পড়ল।

একযুগেরও বেশি সময় স্যারের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা নেই। এবারেও দেখা হল সেই নৈহাটী রেলওয়ে স্টেশনে। মাঝখানের ওভার ব্রিজের উপর। যেটা এখন আর নেই। ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। স্যারের দাঁড়িয়ে থাকার কারণ নৈহাটী ব্যাণ্ডেল লোকাল, সেটি কখনো দুনম্বর কখনো পাঁচনম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে। ঘোষণা শোনার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। প্রণাম করে মাথা তুলতেই

-'কে-ও বুদ্ধ! তোমার সঙ্গে দেখা হবে এই আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম। কেউই তোমার খোঁজ দিতে পারে না। অবসরের বয়স আসতে তোমার আর কত বছর বাকি?'

-'কম করে দশ থেকে পনের বছর'- আমার উত্তর।

-'এখনই ঠিক করে নেওয়ার উপযুক্ত সময়। না হলে দেখবে সময় কাটতে চাইবে না। লেখালেখি শুরু কর। একটু আধটু বলা অভ্যেস কর। রবিবারগুলোতে তোমার সময় সুযোগ অনুযায়ী মোগলপুরা লেনে আমাদের যে স্কুল আছে সেখানে নিজের পছন্দমতো একটা কাজ বেছে নাও। পছন্দের জায়গা লাইব্রেরী হলে সেখানেই না হয় একটু সময় দাও। মোট কথা কিছু একটা কর।' সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে আমি অন্যপ্রসঙ্গ পাড়লাম।

-'স্যার আমার পি.এইচ.ডি. টা হয়ে গেছে। রামেশ্বরবাবু (অধ্যাপক ড. রামেশ্বর শ) গাইড ছিলেন।'

শুনে যথারীতি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন

-'রামেশ্বর তোমার গাইড ছিলেন? ও তো মা শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে খুব ভালো লিখছে।' কথা শেষ না হতেই আমার দিকে কথা ভাসিয়ে দিলেন

-'না-না-এখন থেকেই তুমি বলবে।

-'স্যার আমি কি পারব?'

-'পারতেই হবে। আজ থেকে পড়াশুনা শুরু কর। বইপত্তর যা লাগে আমি দেব। কিছুদিনের মধ্যে আমি তোমাকে কোথায় বলবে কি বিষয়ে বলবে সব জানিয়ে দিচ্ছি।' আমি তো প্রমাদ গুণতে থাকলাম। পরে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম 'তুমি কোনদিন ফ্রি থাক? সপ্তাহের কোনদিন তোমার কাজ কম? আমি জানালাম- 'রবিবার'।

- 'ঠিক আছে, এই মাসের শেষ রবিবার আমি তোমার বাড়িতে আসছি। কখন আসলে তোমার সুবিধা?

-'স্যার আসবেন যখন, সকাল সকাল আসবেন। আমার বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া করবেন।'

-'ঠিক আছে, তাই হবে। তবে খুব সকালে হবে না। সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ এই ওভারব্রিজেই দাঁড়াবে।' ইতিমধ্যে ট্রেনের ঘোষণা হতেই স্যার ধীরে ধীরে নেমে

গেলেন। আমি গমনপথে দৃষ্টি রেখে ভাবছি এইমাত্র যে-কথাগুলো শুনলাম তা কি সব সত্যি? স্যার সত্যিই আসবেন? তাও আবার আমার বাড়িতে? ফেরার পথে মনে হ'ল পা ঠিক মাটিতে পড়ছে কি না বুঝতে পারছি না।

নির্দিষ্ট দিনে স্যার মোটামুটি ঠিকসময়েই এসেছিলেন। রিক্সা করে দুজনে বাড়ি পৌঁছেছিলাম। পৌঁছেই তিনি ঘরের ভেতরটা বিশেষ করে বুকশেল্ফ খুব নিখুঁতভাবে দেখলেন। আমার বাড়িতে সেসময় শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বাঁধানো কোন ছবি ছিল না। ছিল শ্রীমায়ের পায়ের একটি বাঁধানো ছবি। বুক শেল্ফের কাঁচের ভেতরে সামনের দিকটায়। স্যার উঠে গিয়ে ঐ ছবিটা বের করে এনে ভালো করে মুছলেন। কথা বলতে বলতে জানালেন 'এভাবে ছবি রাখলেই শুধু হবে না। শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের চর্চা করতে হবে। বাড়িতে কিছু কিছু লোক নিয়ে শুরু করতে হবে সমবেত অনুশীলন। এবার বাড়িতে পাঠচক্র শুরু কর।' আমি কি বলব বুঝতে না পেরে চুপ করেই ছিলাম। হঠাৎ যেন শুনলাম 'বুদ্ধ! তোমার পি. এইচ, ডি.-র থিসিসটা একটু দেখাও দেখি?' সেটি ঐ ঘরেই অন্য আর একটি আলমারিতে ছিল।

উঠে গিয়ে পেড়ে এনে দিতেই তিনি অনেকক্ষণ ধরেই আদ্যোপান্ত নেড়ে চেড়ে দেখলেন। দুপুরে খেতে বসে আমার যেন মনে হ'ল তিনি আমার বাড়িতে পাঠচক্র চালু করার মতো পরিবেশ ও ঘরের সংস্থান আছে কি না সেটাই দেখতে এসেছেন। আমার মনেও সে বাসনা একেবারে ছিল না যে তা নয়। জানতে চেয়েছিলাম 'পাঠচক্র শুরু করতে হলে কি করতে হবে?' কথা শেষ না হতেই উত্তর এসেছিল 'কিছু না। আগ্রহী ও উৎসাহী আশপাশের এরকম দু-চারজনকে জানাবে। মাসে একদিন। মা শ্রীঅরবিন্দের ছবি থাকলে ভালো হয়। আগে থেকে একজন বক্তা ঠিক করে রাখবে। সেসব কিভাবে কি করতে হবে আমি বলে দেব। ফোন নম্বর দিয়ে দেব, যোগাযোগ করে নেবে। বক্তাদের প্যানেল ঠিক হয়েই আছে। তোমাকে দিন ও সময় আগে থেকে জানাতে হবে। ধার্য দিনে সঠিক সময়ে সমবেতভাবে ফটোর সামনে বসবে। নীরবে করবে প্রার্থনা। মা ও শ্রীঅরবিন্দের বই থেকে কিছু কিছু পাঠ করবে। গান করার কেউ থাকলে সে দু একটি গানও করতে পারে। এরপর বক্তার পালা। ঠিক করে দেওয়া বিষয়ের উপর সে বক্তব্য রাখবে। এইভাবে শুরু করে দাও। তারপর যা করবার মা'ই করবেন।' স্যার কথাগুলো একটানা ক্লাস নেওয়ার মতো বলে গেলেন। 'যা করবার মা-ই করবেন'- বাক্যবন্ধটি আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে চক্কর দিতে থাকল।

বিশ্বনাথ স্যার নৈহাটী ন্যাশনাল পার্ক-এর যে বাড়িটিতে এসেছিলেন, আমার সেই বাড়ির একতলাটি বছর চারেক আগে করা। জমি কিনে একেবারে নতুন করে করা। দোতলায় পিলার তুলে শুধু ছাদ ঢালাই করা হয়েছিল। ফলে দোতলা পুরো ফাঁকাই ছিল। কাছাকাছি একটি ভাল দিন খুঁজতে গিয়ে আমাদের পছন্দ হল ২০০৮-এর

২৯শে ফেব্রুয়ারি দিনটি। শ্রীঅরবিন্দ পরিমণ্ডলে যে দিনটি 'গোল্ডেন ডে' নামে সমধিক পরিচিত। ক্রমে সেই দিন এসে গেলে কাঞ্চনকান্তিতে বাড়ি একেবারে ঝল্‌মল্‌ করে উঠল। কৃত্রিম ফোয়ারাতে সোনালী আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বাড়ির শোভা দিল কয়েকগুণ বাড়িয়ে। উপরে ছাদের চারপাশে উড়তে থাকল বিজয় নিশান। সোনালী চাঁদোয়া টাঙিয়ে মা শ্রীঅরবিন্দের অস্থায়ী মন্দির গড়ে তোলা হয়েছিল দোতলায়। উৎসব মুখরিত জাঁকজমক পূর্ণ উদ্বোধন যাকে বলে! ভাটপাড়ার তপন মুখার্জীর বাড়ির পাঠচক্রের কয়েকজন এবং নৈহাটীর ডা. দেবাশীষ পালের বাড়ির পাঠচক্রের দু-চারজন এবং বন্ধুস্থানীয় কয়েকজন ছাড়া সবাই ভেবেছিলেন এটি গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান। রাত্রে পেটপুরে প্রসাদের ব্যবস্থা থাকায় সেই বিশ্বাসের পালে হাওয়া লেগেছিল জোরদার। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসঞ্জীব সরকার ও অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়।

সঞ্জীবদা বলেছিলেন 'শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণচেতনা' নিয়ে। সে বক্তব্যও হয়েছিল অসাধারণ। বিশ্বনাথ স্যার বলেছিলেন সামগ্রিকভাবে। দেড়শো'র উপরে দর্শক-শ্রোতা সেদিন বক্তা বিশ্বনাথ রায়কে চিনেছিলেন এক বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক পুরুষ হিসেবে। শ্রীঅরবিন্দের শৈশব থেকে শুরু করে, বিলেতফেরত হয়ে বরোদায় এবং বরোদা থেকে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনে ব্রিটিশের চোখে সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তিত্ব, একবছর আলিপুর কারাগারে কাটিয়ে উত্তরপাড়ার বিখ্যাতভাষণ শেষে পণ্ডিচেরীর তপস্যাতীর্থে কীভাবে রাজনৈতিক মুক্তি অতিক্রম করে সর্বমানবের আধ্যাত্মিক মুক্তির সংবেদ রচনা করলেন— বক্তব্য বিষয়ের সমস্তটা জুড়েই ছিল এই প্রসঙ্গ। পরিশেষে একথা বলতে ভুল করেননি, সে মুক্তির চাবিকাঠি রয়েছে শ্রীমায়ের হাতে; সেটি পেতে হলে চাই তাঁর কাছে নিঃশর্ত অকুণ্ঠ সমর্পণ। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠস্বরে সহজ ও সাবলীলভাবে রোঁমা রোল্যা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বাছাবাছা উদ্ধৃতি তুলে শব্দের এমন মায়াজাল তৈরি করলেন যে কিছুক্ষণের জন্য দর্শক শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ স্থির হয়ে রইলেন। এমনই বিষয়ের উপস্থাপনা ও কণ্ঠস্বরের জাদু! এখনো অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন 'আপনার স্যার আবার কবে আসবেন? আসলে জানাবেন। উনি কি আপনার গুরু?' জিজ্ঞাসু অন্য প্রতিষ্ঠানে দীক্ষিত হওয়ায় তার কাছে 'গুরু' শব্দ অন্য দ্যোতনা বহন করে, আমাদের সেসব বালাই নেই। বেশি কথা এড়াতে আমি শুধু বলি 'আমার শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু দুইই।' শুনে ভদ্রলোক কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে উচ্চারণ করলেন

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।'

আমার বিশ্বাস ইদানীং অনেকেই আমার মতো উপলব্ধি করেছেন, কোথাও নতুন শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র বা কোন বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ পাঠচক্র শুরু হতে যাচ্ছে শুনলে

বিশ্বনাথবাবুর আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকত না। শরীরের বাধা তাঁর কাছে কোন বাধাই নয়। ২০০৬ থেকে ভাটপাড়ায় শ্রীঅরবিন্দ পাঠচক্রে তপনদার বাড়িতে নিয়মিত যেমন আসতেন; নৈহাটীতে ডা. দেবাশীষ পালের বাড়িতেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। ২০০৭ সালে জুলাই মাসের প্রথম রবিবারে কাঁচরাপাড়ায় শ্রীদিলীপ দত্তের বাড়িতে পাঠচক্র শুরু হতে যাচ্ছে। স্যার নৈহাটীতে সকালে দেবাশীষ দার বাড়িতে এসেছেন। কথা হচ্ছে আমরাও যাব। দেবাশীষদা গাড়ি ঠিক করলেন। আমরা কয়েকজন মিলে সন্ধ্যায় হৈ হৈ করে পাঠচক্র উদ্বোধন করে এলাম। ২০০৮-এ শুরু করে আমার বাড়িতেও বেশ কয়েকবার এসেছেন। একইভাবে কোন্নগরের চন্দ্রিমার বাড়ির পাঠচক্রের বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁকে আসতেই হবে ! ক'জন উপস্থিত থাকছেন সেটা কোনদিনই বড় ব্যাপার ছিল না। তিনি বলতেন শ্রীমা একসময় বলেছেন কেউ আসে না, সকলকেই আনা হয়। 'None comes everyone is brought.'

প্রথমদিকে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় বই লেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাননি। আমি অনেকবার সেকথা মনে করিয়ে দিলে একটাই উত্তর দিতেন 'ও কাজ আমার নয়। মা আমাকে শুধু বলার দায়িত্ব দিয়েছেন।' একথা ঠিক শ্রীঅরবিন্দ মায়ের কথা জনমানসে তুলে ধরার ব্যাপারে তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন অতন্দ্র যোদ্ধা। পরের দিকে ব্রিজ রায় ছদ্মনামে বেশ কয়েকটি বই লিখে অবশ্য নিজেরই তৈরি বেড়া থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

স্মৃতির সরণী বেয়ে অনেক কথাই ভীড় করে আসছে। কোনটা বলব আর কোনটা বাদ দেব! ঠিক করতে পারছি না। শুধু একেবারে শেষপর্বের দু-চারটে কথা না বললেই নয়। শ্রীঅরবিন্দের জন্ম-জয়ন্তীর দেড়শো বছর ও ভারতের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রায় সব কেন্দ্রই তাদের সাধ্যমতো উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সেইরকম একটি অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের শ্রী আশিস কুমার রুদ্র আমাকে একটি কুইজ পরিচালনার জন্য স্যারের সঙ্গে সেখানে যেতে বলেছিলেন। উৎসবের দিন ৬ই ও ৭ই আগস্ট, ২০২২। আমার ও স্যারের মঞ্চযাপনের কথা ৬ই আগস্ট। ফলে আমাকে আগের দিন ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে রাত্রি দশটায় ট্রেন ধরতে হয়েছিল। উঠেই দেখেছিলাম সস্ত্রীক স্যার এবং ভয়েস অব ওয়ার্ল্ড এর ছেলেমেয়েরা ব্যাণ্ডেল থেকে কে উঠে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আশিস দা সবার জন্যই থাকা ও খাওয়ার সুন্দর বন্দোবস্ত করেছিলেন। ৬ই আগস্ট ভোরে আমরা পৌঁছেছিলাম। একটু বেলার দিকে স্যারকে ঔরঙ্গবাদে যে কলেজে পড়াতেন সেই কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হয়েছিল। ঐদিন ঐ কলেজের বাংলা বিভাগ স্যারকে সংবর্ধিত করেছিলেন। বিকেলে আমার পালা শেষ হলে তিনি উঠেছিলেন বক্তৃতা দিতে। অনুপম শব্দ চয়ন ও সুরতরঙ্গের (Intonation) প্রক্ষেপণে খুব সহজেই

দর্শক শ্রোতার হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। মঞ্চে দৃষ্টি ফেলতেই চোখে পড়ল পেছনে এসে বসেছেন পরবর্তী বক্তা শ্রদ্ধেয় জয়দীপ মহারাজ। মাথায় উষ্ণীষ বেঁধে একেবারে রাজকীয় মহিমায়! পাশাপাশি স্যারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম, চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। সেই পারিপাট্য নন্দিত ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবী নেই, পরে আছেন পাজামা ও ফতুয়া টাইপের হাফহাতা পাঞ্জাবী। কিছুদিন থেকে তাঁকে এই ধরনের পোষাকেই মঞ্চে উঠতে দেখা যাচ্ছে। ধুতি সামলানোর পরিশ্রম তিনি হয়তো আর নিতে পারছেন না। প্রতিদিন এত প্রোগ্রাম! এত পরিশ্রম! দিনে দুটো তো থাকছেই; কোন কোন দিন তিনটে। অথচ জায়গাগুলি খুব কাছাকাছিও নয়। এমন যার রোজনামচা গুছিয়ে ধুতি পরার তাঁর অবসর কোথায়?

স্যারের বক্তৃতা শেষ হতেই আগে থেকে ঠিক করা গাড়িতে রবীন্দ্রভবন থেকে আমরা বহরমপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলাম। গাড়িতে আসতে আসতে তিনি প্রায়ই বলছিলেন বেলডাঙ্গায় একটি 'শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র' খোলার কথা। তিনি নাকি ফোনে ফোনে অনেকের সাথে কথা বলে রেখেছেন। একজন বাড়ি দিতে রাজীও হয়েছেন। এবারে বাড়ি গেলে স্যারের সঙ্গে ঠিকানা নিয়ে তার সাথে আমার যোগাযোগ করার কথা। এই ইচ্ছেটা অপূর্ণই থেকে গেল! বহরমপুর যখন পৌঁছোলাম তখন রাত্রি ন'টা। স্যার পাঠমন্দিরে উঠলেন। আমি চলে গেলাম আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। 'বহরমপুর শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির'-এর সুপ্রতীকদা সাত তারিখ সকাল আটটায় বিশ্বনাথবাবুর উপস্থিতি জানিয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের ডেকেছিলেন। ছুটির দিন হওয়ায় অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি কিছুটা দেরিতে পৌঁছে দেখলাম স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে স্যার চেয়ারে বসে অন্যদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। প্রশ্নের কোন শেষ নেই। তাতে অবশ্য তিনি মোটেই বিরক্ত নন। কিন্তু বেলা প্রায় ন'টার কাছাকাছি সময়ে স্যারের প্রতিক্রিয়া 'আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না, দেরি হয়ে যাবে।' একথা বলার কারণ তাঁকে গাড়ি করে বহরমপুর থেকে রাণাঘাটের আগে তাহেরপুর বীরনগর সংলগ্ন ঊষাগ্রামে পৌঁছতে হবে। সেটা কম দূর নয়! বিকেল তিনটে থেকে সেখানে আবার অনুষ্ঠান শুরু ২৮শে আগস্ট/২০২২ রবিবার নৈহাটীর কল্যাণী হাইওয়ে সংলগ্ন দোগাছিয়ায়, শ্রী বাদল চক্রবর্তীর শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যাপীঠ-এ নৈহাটী 'বাক্'-এর পক্ষ থেকে, শ্রীঅরবিন্দের জন্ম-জয়ন্তীর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারাদিনের একটি স্বাধ্যায়-এর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে রাণাঘাটের শ্রীমনোরঞ্জন দেবনাথ আমন্ত্রিত ছিলেন। এই উপস্থিতি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসেবে। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের শেষদিকে অপূর্ব সমাপতন। ভাস্কর (মুখার্জি) অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়কে নিয়ে যখন অনুষ্ঠানে ঢুকছে, ঠিক সেইসময় মনোরঞ্জন দা দরাজ গলায় গান ধরেছেন, 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।' কথায় কথায় শোনা গেল, আগের

রাতে বিশ্বনাথবাবু ফোনে নাকি বলেছিলেন, 'মনোরঞ্জন, আমি ওখানে গিয়ে যেন তোমার গান শুনতে পাই।' সেই প্রস্তাব ও পরিবেশনা মিলে যাওয়ায় খেতে বসে দুজনের মধ্যে কী হাসাহাসি; কী অন্তরঙ্গ ভাববিনিময়। সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে যারা স্যারকে প্রথম দেখেছেন তারা সত্যই তাঁর 'সঙ্গলাভে' ধন্য হয়েছেন এবং বক্তব্যে পেয়েছেন বিষয়ের অন্তরালে বিষয়ান্তরের ইঙ্গিত।

আমাদের বাড়িতে পাঠচক্র শুরু হওয়ার দুমাসের মধ্যে আমার কাছে প্রস্তাব এসেছিল; 'আগামী মে মাসে তোমাকে হুগলী-চুঁচুড়া ভবনে বলতে হবে। বিষয় শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ।' বিষয় শুনে আমি তো চমকে উঠেছিলাম। কিছু একটা বলতে যাচ্ছি তার আগেই যোগ করলেন, 'তুমি তো স্কুল কলেজে পড়াচ্ছো, তোমার কোন অসুবিধা হবে না।' আমি আমতা আমতা করে রাজী হলাম। ভাবতে থাকলাম স্কুলে-কলেজে পড়ানো আর শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বলা—একি চাট্টিখানি কথা!

স্যারের উদ্দেশ্য সফল হল। বিভিন্ন কেন্দ্রে, পাঠচক্রে বক্তা হিসেবে আমার উপস্থিতি বাড়তেই থাকল। বিশ্বনাথবাবুর কাছ থেকে পরবর্তী প্রস্তাব ''শ্রীঅরবিন্দের 'দুর্গাস্তোত্র'-এর শতবর্ষ উপলক্ষে কলেজ স্ট্রিট পাঠমন্দিরে তোমাকে বলতে হবে''। —'কিন্তু আমি তো স্যার এ বিষয়ে তেমন কিছুই জানিনা?' আমার সঙ্কটমুক্তির প্রয়াস ব্যর্থ হল। জিজ্ঞাসা করলেন :

—'তুমি তো ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছ? তুমি দুর্গাস্তোত্রের ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বলবে। একদম অসুবিধা হবে না। ও তুমি পারবে। ৩০/৪০ মিনিট বলবে। এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে থাক।' বুঝলাম স্যারের মুখ থেকে একবার যখন কথাটা বেরিয়েছে, তখন কার সাধ্য আর তা অন্যথা করে। নির্দিষ্ট দিনে বক্তৃতা হয়ে গেল। উপস্থিত অনেকেই জানিয়ে গেলেন তাদের খুবই ভালো লেগেছে। স্যার বললেন ঃ

—'অসাধারণ!' এত ভালো হবে তা তো আমার ধারণা-ই ছিল না। যাই হোক তুমি এটিকে 'বর্তিকা'য় বেরনোর উপযোগী কপি করে পাঠমন্দিরে জমা দিয়ে দাও। সেটিও করা হল—পরের 'বর্তিকা'তে বেরিয়েও গেল। তখন কে জানত বিগত ৭৫ বছরের নির্বাচিত লেখা নিয়ে পাঠমন্দির বর্তিকার একটি সংকলন প্রকাশ করতে চলেছে। সেই সংকলনে সৌভাগ্যবশত আমার লেখাটি শ্রীঅরবিন্দের 'দুর্গাস্তোত্র: একটি ভাষা—বিজ্ঞানগত সমীক্ষা' এই শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এসবের বিন্দু বিসর্গও আমি তখন জানি না। জানার কথাও নয়। হঠাৎ একদিন রাত দশটায় স্যার ফোন করে আমাকে জানাচ্ছেন!

—'বর্তিকা'য় তোমার একটিমাত্র লেখা বেরিয়েছে। আর সেটি কিনা পঁচাত্তর বছরের সংকলনেও স্থান পেয়েছে। ভাবতে পারছো?' আমি তো কি বলা উচিত কিছুই

বুঝতে পারছি না। চুপ করে আছি। অন্যপ্রান্ত থেকে স্যার অনেক কিছু বলে গেলেন। আমি শুধু অনুভব করলাম ছাত্রের সাফল্যে শিক্ষকের কী আনন্দ! কী গর্ব! কী উচ্ছ্বাস!

আরো বুঝলাম স্যার এবারে চাইছেন আমাকে দিয়ে লেখাতে। সেই ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে হুগলী-চুঁচুড়া ভবনের 'স্মরণিকা'-য় কিছু কিছু ছাপও পড়তে থাকল। স্যার কিন্তু বৎসরান্তে এই একটি লেখায় মোটেই সন্তুষ্ট নন। সেটা বোঝা গেল চুঁচুড়া ভবনের চারতলায় গোলটেবিলে মুখোমুখি বসে তাঁরই দেওয়া একটি প্রস্তাবে

—'বুদ্ধ! অনেকদিন তো হল। শ্রীঅরবিন্দের 'বাংলা রচনা'-র উপর তুমি একটি একাডেমিক কাজ কর। দরকার হলে বই করে আরও উচ্চতর প্রয়োজন সিদ্ধ করতে জায়গামতো জমা দেওয়া হবে। ছাপানোর জন্য চিন্তা কোরো না। ও পাঠমন্দির থেকে আমি করিয়ে দেব।' সুচিন্তিত পরামর্শ দিলেন

—'প্রথমে দুটি সংখ্যায় বেরনোর মতো লেখা রেডি করে নাও। একটি জমা দেবে—আর একটি যেন সব সময় হাতে থাকে। তাহলে দেখবে কোন সমস্যা হবে না। লেখার শীর্ষনাম তুমিই ঠিক করবে। দেরি না করে লেখা শুরু করে দাও।' সেই লেখাই বর্তিকা'য় এখন ধারাবাহিক বেরুচ্ছে।

ছাত্র-শিক্ষকের শেষ কথা হল ফোনে শরীর ছাড়ার মাসদেড়েক আগে। রাত্রিবেলায়। 'বুদ্ধ! তোমার লেখা তো ভালোই চলছে। মঞ্জুদি তো তোমার লেখার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জানালেন তুমি ঠিক সময়েই লেখা দিতে পারছো। এটা খুবই ভালো কথা'। প্রত্যুত্তরে আমি জানালাম 'মঞ্জুশ্রীদি আমি যা তার থেকে একটু বেশিই বলেন।' স্যার চলে যাবার পর এখন ভাবছি সবেমাত্র এক তৃতীয়াংশ লেখা শেষ হয়েছে। বাকি বড় অংশটা শেষ করতে পারব কিনা জানি না। তাড়া দিয়ে লিখিয়ে নেওয়ার 'মানুষ'টি আজ আর নেই। উৎসাহ হারিয়ে পথভ্রষ্ট হলে আলোক বর্তিকা নিয়ে এগিয়ে এসে কেউ বলবে না 'কাজে লেগে পড়, আমি আছি।' তাঁকে হারিয়ে আমরা সত্যিই বাক্‌রুদ্ধ, হতোদ্যম, উদ্‌ভ্রান্ত, দিশাহীন। তাঁর বলে যাওয়া কথাগুলি তো শুধু কথার কথা নয়, চলার পথের পাথেয়, অমোঘ বাণী। রবিঠাকুর যাকে বলেছেন...:'সত্যের অয়মহং ভো-কালের শঙ্খকুহরে অসীমের নিশ্বাস,'।' ...সাধনাটাকে ফাঁকি দিয়ে' আমরা যারা— 'সিদ্ধিকে সিঁধ কেটে নিতে' অতি উৎসাহী—তাদের কাছে তাঁর আসঙ্গ ও প্রসঙ্গ দিনেদিনে যে হয়ে উঠবে অন্তহীন অফুরান, সেকথা অস্বীকার করবে কে?'

চিরসখা হে...

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়
নৈহাটি

শিরোনাম দেখে মনে হতে পারে এটি আবেগমিশ্রিত অতিশয়োক্তি। একথা সত্য যে আবেগ অবশ্যই আছে এবং সেটি স্বাভাবিক, কারণ এ লেখার উদ্দেশ্য এবং উৎস এক ব্যক্তি মানুষের স্মৃতিচারণ যিনি রয়েছেন 'আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে'—আমার হৃদয় জুড়ে—এটি সরল স্বীকারোক্তি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটিও মনে রাখা প্রয়োজন, নিছক স্মৃতিচারণ নয়, কীভাবে সেই মানুষটি ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন প্রকৃত অর্থে 'friend philosopher and guide' তার একটি বিশ্লেষণ বা বিবরণ আমার নিজের কাছেও যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে অনেকের কাছে, যাদের সুযোগ হয়েছে মা-শ্রীঅরবিন্দের আলোকে জীবন যাপনের। সম আদর্শে যাপিত এক জীবনের আলেখ্য আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। প্রশ্ন তবু থেকে যায় 'চিরসখা' কি কোনও ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেন? বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের যে গানটি থেকে এই শব্দটি চয়ন করা হয়েছে, সেই গানের পরবর্তী অংশে আছে— 'সংসারগহনে নির্ভয়নির্ভর, নির্জনসজনে সঙ্গে রহো...'—এই সখা হয়ে ওঠা কি ব্যক্তিজীবনে সম্ভব? এর উত্তর অন্বেষণই হয়তো এ লেখার উৎস। যাঁর যাপিত জীবনের অংশবিশেষ এ লেখার বিষয়বস্তু, বলাবাহুল্য তিনি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, শরীর ছেড়ে যিনি রয়েছেন নয়নের মাঝখানে। আমার কাছে তাঁর জীবন ছিল এক 'হয়ে ওঠার' সাধনা। তাঁর অতি প্রিয় একটি বাণী ছিল: To know is good, to live is better, to be that is perfect—জানা ভালো, তাতে বাস করা আরও ভালো, হয়ে ওঠা পূর্ণ সাধনা। সুতরাং এই being থেকে becoming হয়ে ওঠার যে প্রায়োগিক দিকটি আমার চোখে ধরা পড়েছে

সেখানে ব্যক্তিগত আবেগ যতই থাকুক, তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে।

মাস্টার মশাই থেকে বিশ্বনাথদা হয়ে আবার মাস্টার মশাই, এই পরিক্রমায় আমাদের সম্পর্ক। আর সম্বোধনে 'আপনি' থেকে তুমি তে নেমে আসা নয়, হার্দিক উত্তরণ। প্রথম আলাপের বর্ণনা নিছকই ক্লিশে, তবু সেটির উল্লেখ প্রয়োজন কারণ ওখানেই লুকিয়ে আছে friend, philosopher and guide হয়ে ওঠার প্রথম ধাপটি, সম্পর্ক সেতুবন্ধনের প্রথম পদক্ষেপ। সঠিক মনে পড়ে না—সেটি '৮২ বা '৮৩ সাল হবে, আমাদের বাড়িতে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে আমার ছোটকাকা তপনকুমার মুখোপাধ্যায় ওঁকে নিয়ে এলেন, মা-শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে কিছু বলার জন্য। আমি জন্মাবধি বাড়িতে মা-শ্রীঅরবিন্দের ছবি দেখেছি, কিন্তু সেদিন এমনভাবেই উনি বিষয়টা উপস্থাপনা করলেন যে নয়-দশ বছরের বালকও আগ্রহী হয়ে উঠল এবং কিছু প্রশ্ন করে ফেলল এবং আশ্চর্যের বিষয় হল, মাস্টারমশাই মন দিয়ে সব প্রশ্ন শুনলেন ও উত্তর দিলেন। হ্যাঁ, মাস্টারমশাই কারণ ঐ নামেই তাঁকে সম্বোধিত হতে দেখেছি আমি আর 'আপনি'—সে তো স্বাভাবিক সৌজন্য, পারিবারিক শিক্ষা বা বন্ধন এমনটাই শিখিয়েছিল। ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি (যদিও 'ভুল যদি না বলি' পরবর্তীকালে তুলনায় বেশি ধবধবে সুতির পাঞ্জাবি বা হাফ পাঞ্জাবিতে দেখেছি আর ধুতির পাড়ও বোধহয় বেশি সরু—নরুন পাড় হয়ে গিয়েছিল; আর শেষের দিকে পাজামাও পরতেন, যেটা আগে দূরপাল্লার ট্রেন যাত্রার বেশ ছিল) পরিহিত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকের, তাঁর পাণ্ডিত্য আর পোশাকের গাম্ভীর্য নির্দ্বিধায় সরিয়ে ফেলে এক শিশুর সমমনস্ক হয়ে ওঠা, পরবর্তীকালেও দেখেছি, দুর্লভ। শুধু সেইসময়ই নয়, পরবর্তীকালে কত অর্বাচীনের মতো মত প্রকাশ করেছি, ওঁকে প্রায় কখনোই ধৈর্য হারাতে দেখিনি। শত ব্যস্ততার মাঝেও ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা শুনেছেন মন দিয়ে, সমাধানসূত্র দিয়েছেন বাস্তববোধকে সঙ্গী করে আর অবশ্যই 'মাকে জানিয়ে দাও'—এই সর্বরোগহর ওষধির সন্ধান দিয়ে, প্রতিবার, বারংবার; সে কারণেই উল্লেখ করেছিলাম...'সংসারগহনে নির্ভয়নির্ভর...'

অথচ কখনো নিজের মত বা আদর্শকে কারোর ওপর চাপিয়ে দেননি। সামান্যতম আগ্রহ বা সম্ভাবনা দেখলেও যেমন সাধ্যমতো (নাকি সাধ্যাতীত ? !) সহায়তা করেছেন পরামর্শ, বই, বক্তব্য, সাহচর্য দিয়ে, তেমনি বিরুদ্ধ মত শুনেছেন ধৈর্য সহকারে। আপাত বিরোধী আদর্শকেও শ্রদ্ধা করেছেন, যদি সেই আদর্শ পালনে সততা, একনিষ্ঠতা লক্ষ করেছেন এবং সেই আপাত বিরোধী আদর্শের সঙ্গে যৌথভাবে, সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তুলনায় সাময়িকভাবে আবেগাশ্রিত হয়ে মা-শ্রীঅরবিন্দের পথে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলে, ধীরে চলার পরামর্শ দিয়েছেন, বারংবার নিজেকে প্রশ্ন করে ভাবের গভীরতাকে বিচার করার কথা বলেছেন, স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'ভাব যেন ভাবালুতা না হয়'। [তাঁর রচিত শেষ নাটক-এর সংলাপ]।

সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা যখন বেড়েছে তখন সম্বোধন কিছুদিনের জন্য পালটে গিয়ে হয়েছিল 'বিশ্বনাথদা', শ্রীঅরবিন্দ পরিমণ্ডলের অধিকাংশ মানুষ তাঁকে যে নামে ডেকেছেন। তিনি কিন্তু আমার পরিবর্তিত সম্বোধনে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হননি, আপত্তি তো দূরের কথা। বরং বলতেন আশ্রমে তো নামের পাশে দাদা দিয়েই সম্বোধন প্রচলিত। তাঁর সঙ্গে নৈকট্য ক্রমশ প্রকাশ করে ধরল আদর্শে সমর্পিত একজন ব্যক্তি কীভাবে সাধক হয়ে উঠতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি বিরোধী মতের প্রতি তাঁর সহিষ্ণুতা, তেমনি লক্ষণীয় ছিল মা-শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ মনোভাব। কোথাও কখনও তাঁদের মতকে বিকৃত হতে দেখলে, স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে দেখলে তিনি তার প্রতিবাদ করতেন সাধ্যমতো। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যখনই তাঁর মনে হয়েছে তিনি কখনো বিচ্যুত হয়েছেন, খুব ঘনিষ্ঠ মহলে স্বীকার করেছেন, আবার কখনো কখনো সেই স্বীকারোক্তি যেন নবীন পথিককে আশাভরসা জোগানোর জন্যও মনে হয়েছে। কৈশোর পেরিয়ে যখন যৌবনের দোরগোড়ায় পৌঁছলাম, বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণে আসে, তাঁর সাহচর্য একই রকম আকর্ষণীয় ছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু পালটে গেল, কিন্তু লক্ষণীয় ছিল প্রতি পর্বেই তিনি ব্যক্তিগত জীবনের ভালোমন্দের খোঁজ রাখতেন, সর্বোপরি বাস্তবোচিত পরামর্শ দিতেন—এটিই কি যথার্থ Counsellor হয়ে ওঠা নয়? বক্তা হিসেবে তো তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেনই, মা-শ্রীঅরবিন্দ পরিমণ্ডলে একটু কাজ করার সুযোগ পেয়ে আবিষ্কার করলাম গবেষক বিশ্বনাথ রায় (ত্রিজ রায়) কে। ব্যবহারিক জীবনে তিনি পি. এইচ. ডি ছিলেন না, কিন্তু কী তন্নিষ্ঠ গবেষণার কাজ তিনি করেছেন সমগ্র জীবন ধরে। প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থগুলি (কয়েকটি তো আকারে পুস্তিকা, যথা, শ্রীঅরবিন্দ ও হুগলী অধিবেশন, শ্রীঅরবিন্দ ও চন্দননগর, কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের শেষ আবাস) আকারে প্রায় ক্ষুদ্রই বলা চলে কিন্তু প্রতিটি গ্রন্থ (একেকটি গবেষণাপত্র নিশ্চিত) রচনা করতে কী অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন, তা বইয়ের শেষে Reference বইয়ের তালিকা দেখলেই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ব্যক্তিগতভাবে জানি, দিনের পর দিন আশ্রম আর্কাইভস-এ পড়ে থেকেছেন, সূত্রসন্ধানে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে গিয়েছেন সশরীরে।

তাঁর এই পরিচয়ই, বলা যায়, পুনর্বার আমাকে তাঁকে মাস্টারমশাই সম্বোধনে ফিরিয়ে আনল—এই সম্বোধন তখন হৃদয় উৎসারিত শ্রদ্ধায় আর ভক্তিতে, আর ভালোবাসায় তিনি আরও কাছে এসে হয়ে উঠলেন—'আপনি' থেকে 'তুমি'। এই তন্নিষ্ঠ গবেষকের লেখার বিষয়বস্তু যতই তাত্ত্বিক এবং তথ্যমূলক হোক না কেন, লেখার ভাষাটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল। "শ্রীঅরবিন্দ—বেদান্তের পথে তন্ত্রের লক্ষ্যে"-এমন একটি আপাত দুরূহ বিষয় কী প্রাঞ্জল ভাষায় যে ব্যক্ত করেছিলেন তা এখনো স্মৃতিতে সজীব।

মা-শ্রীঅরবিন্দের পথে সমর্পিত এই মানুষটি আমাকে বিস্মিত করলেন আরেক রকমভাবে। এই পথে যখন কিছু কাজ করার সুযোগ পেলাম, তিনি কিন্তু কোনও বিশেষ ক্ষেত্র নির্বাচন করে দেননি; বরং বলা যায় নিহিত কিছু সম্ভাবনা দেখিয়ে দিয়েছেন। কখনো এমনও হয়েছে যে আমার অন্তরের সে সম্ভাবনা আমার নজরে আসেনি বা তাকে প্রকাশ করার বিষয়ে আমি সন্দিহান, তিনি কিন্তু যথার্থভাবে দিকটি নির্দেশ করেছেন আর সে সম্ভাবনা প্রকাশে যথাসম্ভব সহায়তা করেছেন। শিক্ষাদর্শে শ্রীঅরবিন্দ তো শিক্ষকের এই ভূমিকাটির কথাই বলেছেন—শিক্ষক task master নয়—facilitator— যথার্থ শিক্ষক দেখিয়েছেন জ্ঞানের উৎস। এমনকি বক্তা বা লেখক হিসেবে যখন কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, তিনি বিষয় নির্বাচনেও কখনোই প্রায় নিজের মত চাপিয়ে দেননি, প্রয়োজনে সহায়তা করেছেন, ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু নজর রেখেছেন উপস্থাপনার দিকে, খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, মূল সুর ধরিয়ে দিয়েছেন আর জোর দিয়েছেন অন্তরের সাড়ার প্রতি বারংবার, প্রতিবার। পরবর্তীকালে '**সহায় চতুষ্টয়**' (Four Aids)-এ উল্লেখ পেয়েছি গুরু তাঁর প্রভাব দিয়ে আর দৃষ্টান্ত দিয়ে পথিককে, সাধককে, অনুগামীকে সহায়তা করেন, উপলব্ধি যখন হয়েছে তখন চিরসখা ছাড়া কীই বা বলা যায় এহেন গুরুকে। বন্ধু হয়ে, তাঁর দর্শন দিয়ে, অনুগামীকে যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন।

সংগঠক রূপে তাঁর ভূমিকা সর্বজনবিদিত। শুধু বাংলায় নয়, ওড়িশাতেও শ্রীঅরবিন্দের প্রসারে তিনি অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন, প্রায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁর শেষ ওড়িশা সফরে, রাজগাংপুরে তিনি ব্যক্তিগত পরিসরে জানিয়েছিলেন—এসময় তাঁর হাসপাতালে থাকার কথা। অসুস্থতার প্রবল বিরোধী এই মানুষটির এই উক্তি আমাদের বুঝিয়ে দেয়, নিজেকে কতদূর অতিক্রম করে তিনি ওড়িশাতে পৌঁছেছিলেন শুধু, তাঁর কথায়, 'মায়ের কাছে আমি Commit করেছি যে'—এই আদর্শকে ধরে রাখতে)। বাংলায় বিভিন্ন কেন্দ্রে, বিভিন্ন প্রান্তে, যখনই কোনো সাংগঠনিক সমস্যা হয়েছে, তিনি তার সমাধানে ছুটে গেছেন এবং উল্লেখ্য, প্রয়োজনে কঠোর হয়েছেন যথেষ্ট, কিন্তু সেই কেন্দ্রের কর্মীদের স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্বে আঘাত পড়ে এমন কোনো সিদ্ধান্ত বা কর্মপন্থা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। কোনো কেন্দ্রের সাময়িক প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার অভাবে সেই কেন্দ্রের হাল ধরেছেন এবং আশ্চর্যের বিষয় স্থিতিশীলতার পরেই সেই পদ থেকে স্বেচ্ছায় সরে এসেছেন, শত অনুরোধেও তিনি আদর্শচ্যুত হননি; তিনি যে দায়বদ্ধ ছিলেন শুধু মা-শ্রীঅরবিন্দের প্রতি। তাঁর নিজের শহর হুগলীতে যখন তিনি শ্রীঅরবিন্দ চর্চার প্রয়োজনে স্থায়ী কেন্দ্রের কথা পরিকল্পনা করেছেন, অনেকেই মনে করতেন সেটি অলীক কল্পনা। দিনের পর দিন সহযাত্রী শ্রীত্রিদিবঞ্জন সরকারের সাইকেলের পিছনে বসে খুঁজে বেড়িয়েছেন

এক চিলতে জমি। রাজনৈতিক কর্মীদের মতনই প্রায় সাইক্লোস্টাইল করা কাগজ বিলি করেছেন শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ রূপায়ণের আহ্বান জানিয়ে। আগ্রহী চোখে চিহ্নিত করেছেন কোনো দোকানের (অরোফার্মেসী) সাইনবোর্ড এবং সেই দোকানের মালিকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যোগসূত্র আর শ্রীঅরবিন্দের কর্মধারায় সেই ব্যক্তি ও তার সমগ্র পরিবারকে প্রায় গেঁথে নিয়েছেন। বিভিন্ন কেন্দ্রের কত আপাত বিবাদের নিষ্পত্তি হয়েছে তাঁর মধ্যস্থতায়, তাঁর প্রভাবে। কত কেন্দ্র গড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেছে তাঁকে ঘিরে, তিনি সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন, কিন্তু সেসবই ছিল বাস্তব বুদ্ধিকে ধরে রেখে। ধারণা করার মস্তিষ্ক, অনুভব করার হৃদয় আর কাজ করার হাতের যথার্থ মেলবন্ধন ছিলেন মাস্টারমশাই। এহেন গবেষক, সুবক্তা, পণ্ডিত সাধক মানুষটি কেন্দ্রের প্রয়োজনে কত তথাকথিত সামান্য কাজে হাত লাগিয়েছেন, যা বিশ্বাস করা শক্ত। এটি সম্ভব হয়েছিল কারণ যথার্থ ভাবেই তিনি মা-শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে তাঁর কর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে তৈরি করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শুধু নয়, প্রয়োগ করতেন এই তত্ত্ব যে, কাজের গুণগত মান নির্ভর করে কী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তার ওপর, ছোট কাজ, বড় কাজ বলে কিছু হয় না। এ হেন কর্মবীর মানুষটির বড়ো প্রিয় ছিল ''কর্মী'' এই পরিচয়টি—দীর্ঘদিন তাই ত্রিজ রায় এই ছদ্মনামের পাশেই লিখে এসেছেন ভবনকর্মী নামে হুগলী-চুঁচুড়া শ্রীঅরবিন্দ ভবনের স্যুভেনিরে। সেই 'ভবনকর্মীর কথা' এক অসামান্য ইতিহাস শুধু এক কেন্দ্র গঠনের নয়, শ্রীঅরবিন্দ চর্চার অমূল্য সম্পদ যা ভবিষ্যৎ গবেষণায় সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

মোট কথা বোধহয় স্মরণে রাখা প্রয়োজন—অধ্যাপক রায় প্রায় তিনপ্রজন্মের মানুষের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং সমান স্বাচ্ছন্দ্যে। কী অসম্ভব নমনীয়তা, গ্রহণযোগ্যতা থাকলে এ কাজটি করা সম্ভব, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, তা কল্পনারও অতীত। পন্ডিচেরিতেও তিনি সমান গ্রহণযোগ্য ছিলেন, Hall of Harmony তে নিয়মিত বক্তৃতা করেছেন, সাহানা দেবীর সঙ্গে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছেন; উদ্ধার করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের প্রয়োজনীয় যোগসূত্র অথচ যখন প্রয়োজন বোধ করেছেন কোনো একটি কাজ সেই মুহূর্তে তাঁর সাধ্যের বাইরে, সবিনয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন—আপাতভাবে সেই কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীঅরবিন্দের স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও। আধার প্রস্তুতিকরণের এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বাইরে শ্রীঅরবিন্দ-মায়ের আদর্শ প্রসারে এমন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তিত্ব, যিনি পন্ডিচেরিতেও স্বীকৃত, প্রকৃত অর্থেই দুর্লভ। কলকাতা শ্রীঅরবিন্দ ভবনের শ্রদ্ধেয় শ্রীবিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন,বিশ্বনাথদা একটি প্রতীক বা Symbol– যাঁকে দেখলে মা-শ্রীঅরবিন্দকে চেনা যায় বা যাঁকে দেখলে বোঝা যায় মা-শ্রীঅরবিন্দের যোগে কীভাবে কাজ করতে হয়।

মাস্টারমশাই-এর জীবন আসলে এক হয়ে ওঠার উপাখ্যান—being থেকে becoming-এর একটা journey। সমগ্রজীবন জুড়েই যিনি পূর্ণতার সন্ধান করেছেন, পূর্ণ হয়ে ওঠার আস্পৃহাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করেছেন, পরিত্যাগ করার চেষ্টা করেছেন অতীত জীবনকে যা দিব্যের বিরোধী, দুর্বলতাকে স্থান দিতে অস্বীকার করেছেন, হতে চেয়েছেন নলিনীদার কথায় মায়ের শিশু। আর সে কারণেই সমগ্র জীবনকে সমর্পিত করেছেন মায়ের চরণে। সমগ্র জীবন ধরে জেনেছেন 'আমার যে সব দিতে হবে...'। এমনকি শরীরটাও.........

তাঁকে পার্থিব জীবনের একদম শেষ পর্বে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা লক্ষ করেছেন তিনি নিজেকে withdraw করে নিলেন যা চিকিৎসকদের কাছেও বিস্ময়কর। জীবনের চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় তিনি অ্যালোপ্যাথি ওষুধ গ্রহণ করেননি; কিন্তু সেটি গ্রহণেও সম্মতি দিয়েছিলেন— একটিমাত্র শর্তেই—যদি শরীর মায়ের কাজে সক্ষম হয়ে ওঠে। চিকিৎসকরা যখন তাঁকে সে বিষয়ে আশ্বাস দিতে অক্ষম হয়েছেন, তিনি সেই শরীর রাখার আর প্রয়োজন বোধ করেননি।

আমি বিশ্বাস করি—

।। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।

আবার তিনি আসবেন, নতুন শরীরে, আসতে তাঁকে হবেই—মায়ের কাজ করার জন্যই। এখন কিছুদিনের বিশ্রাম—প্রার্থনা শুধু

'...জরাভারাতুরে নবীন করো ওহে সুধাসাগর।। চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না...'

আমাদের বিশ্বনাথ রায়

গৌরাঙ্গ শেঠ
চন্দননগর

ভাবতে গেলে মনে পড়ে যায় আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে চন্দননগরের এক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্ম মুহুর্তের কথা — চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, বর্তমানে যার কর্মকেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে। যেখানে দুই মা সারদা মা এবং শ্রীমা মঞ্চের দুই ধারে অন্নপূর্ণা রূপে বিরাজ করছেন।

এই নিলয়ের জন্ম লগ্ন থেকেই বক্তা বিশ্বনাথ রায়ের সঙ্গে আলাপ। বছরের নানা স্মরণ-মনন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর নিলয়ে আসা এবং ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে গভীর আলাপ এবং কিছু দিনের মধ্যেই এক গভীর স্নেহের সম্পর্কের সাথী হয়ে ওঠা। শুধু তো নিলয়ের নয় শ্রীঅরবিন্দ কালচার সেন্টারে প্রতি মাসে তাঁর সঙ্গে দেখা এবং কিছুক্ষণের জন্য হলেও বেশ কিছু কথা হত। নিলয়ে তিনি শুধু শ্রীমা অরবিন্দ নিয়েই বলেননি, শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা, স্বামীজি, রবীন্দ্রনাথ-কে নিয়েও ভাবগম্ভীর সুমধুর বক্তব্যে সকলকে মুগ্ধ করে রাখতেন এবং অনুষ্ঠানের শেষেই সকলের প্রশ্ন উনি আবার কবে আসছেন। সকলের সঙ্গে আমারও ভীষণ অবাক লাগত বক্তৃতার সময় নিয়ে, ঘড়িও বিশ্বনাথদার কাছে বোধহয় লজ্জা পেত। কোনও কিছু বিষয়ে বলার জন্য ঠিক যতটা তার জন্য নির্ধারিত থাকত তার দু মিনিট আগে শেষ হত, পরে নয়। কিন্তু বিষয়বস্তু থেকে একটুও বাইরে নয়, যেটা বহু বক্তার কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

এই নিলয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা বারবার ভীষণভাবে মনে করিয়ে দেয় যখন দেখি প্রখর রৌদ্রের দুপুরে নিলয়ে এসে নিজেই নিলয়ের গেট খুলে ভবনের চৌকাঠে প্রণাম করে চলে যেতেন। যদি কখনও কারও সাথে দেখা হয়ে গেল একটাই কথা ‘এই একটু এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই একটু প্রণাম করে গেলাম’।

নিলয়ের শুরুতে যখন বিশ্বনাথদাকে দেখতাম তখন মনে হতো উনি হুগলি ভবনের

লোক, কারণ তিনি তখন হুগলিতেই থাকতেন। তারপর বারবার শ্রীঅরবিন্দ কালচার সেন্টার, শ্রীঅরবিন্দ ভবন কোলকাতা, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, উত্তরপাড়া শ্রীঅরবিন্দ পরিষদ, শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতিতীর্থ যেখানেই যাই না কেন সব জায়গাতেই বিশ্বনাথদা, শুধু বক্তা হিসাবেই নয়, বন্ধু হিসাবে, অভিভাবক হিসাবে। পশ্চিমবঙ্গের যতগুলি মা-শ্রীঅরবিন্দের সেন্টার আছে সবার সঙ্গে তিনি গভীরভাবে যুক্ত। আর তখনই মনে হয় তিনি শুধু হুগলি ভবনের নয়, তিনি সকলের...।

আজ বিশেষভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের রজতজয়ন্তী বর্ষের কথা। অনেক সাজানো গোছানো অনুষ্ঠানের মধ্যমণি অবশ্যই বিশ্বনাথদা। দিনটা ছিল ১৫ এপ্রিল ২০১৬। সেই দিন তাঁর হাতে নিলয়ের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছিল ‘‘নিলয় ও বিশ্বনাথদা’’র গত ২৫ বছরের নানা অনুষ্ঠানের একটি ছবির অ্যালবাম। অনুষ্ঠানের পরে বাইরে এসে আমাকে বললেন ‘আমাকে বারবার এই অ্যালবামের পাতাগুলি উল্টাতে হবে, আর সুন্দর স্মৃতিগুলি ফিরে ফিরে আসবে। এই অ্যালবামটি আমার কাছে এক বিরাট প্রাপ্তি...’।

কোভিডের ভয়াবহতার পর ২৬ফেব্রুয়ারি ২০২২ শ্রীমার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান, বক্তা অবশ্যই বিশ্বনাথদা। অনেকটা দিন বাদে অনেক মানুষের সমাগম। তিনি নিলয়ে এসে সবকিছু সুন্দর সাজানো গোছানো দেখে খুব খুশি। মাকে নিয়ে প্রচুর কথা। তারপর সকলের সাথে নানা কথা বলার পর কলকাতায় ফিরে যাওয়া। এবং এটাই তাঁর নিলয়ে শেষ পদার্পণ।

তারপরেও তিনি এলেন, কিন্তু সশরীরে নয়...

মনে পড়ছে আজ অনেক কিছু, কিন্তু একদম একটা ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা বলে শেষ করবো। আমার প্রথম পণ্ডিচেরি যাওয়ার স্মৃতি...

২১ ফেব্রুয়ারি মার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আশ্রমে যাওয়া...। কৃষ্ণকিশোর ঘোষাল আমার জামাইবাবু এবং এই পথের আমার প্রথম বন্ধু ও তার সঙ্গে মেজদি ও দুই দিদি ও সঞ্জয়দা। প্রথম পণ্ডিচেরির মাটিতে পা দেওয়া, প্রথম আশ্রম দেখা, মা-শ্রীঅরবিন্দের সমাধি দর্শন ও স্পর্শ গ্রহণ এবং সর্বোপরি মা-শ্রীঅরবিন্দের ঘরে পদার্পণ। সব খুব সুন্দরভাবে হল। জামাইবাবু সাথে থাকার ফলে মা- শ্রীঅরবিন্দের অনেক কথা ও তাঁর নিজের অনেক অভিজ্ঞতার কথায় মন প্রাণ ভরে উঠল। ঘরে ফেরার দুই দিন আগে আমি জামাইবাবু ও তিন দিদি মিলে দেখতে গেলাম অরোভিল মাতৃমন্দির দর্শনে। তখনকার তাদের নিয়ম অনুযায়ী আমরা সবাই ধীরে ধীরে চারিদিকের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম কক্ষের দিকে। ঘরের দিকে আমরা মূল ধ্যান ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছোলাম, অসাধারণ...। মন প্রাণ ভরে উঠল, কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দিলনা কর্তৃপক্ষ। মনে ভীষণ কষ্ট নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলাম। মা তাঁর

ঘরের দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়েও ঘরে ঢুকতে দিলেন না। রাতে ডাইনিং হল থেকে খেয়ে সমুদ্রের ধারে এসে বসলাম এবং রাতে খাবার পর সকলের মিলিত হবার মূল স্থান ছিল সমুদ্রের ধারে। সেখানে তখনই উপস্থিত বিশ্বনাথদা, বৌদি, পরমা ও কোলকাতা ভবনের অনেকেই। বিশ্বনাথদা আমাকে ডেকে বললেন কি খবর, কেমন লাগলো প্রথম পণ্ডিচেরি ভ্রমণ, আর কতদিন আছো? তখন আমি আজ দুপুরের অরোভিলের মার ঘরে ঢুকতে না দেওয়ার কষ্টটা বললাম আর দু'দিন পরে ফিরে যাব তাও বললাম। তখন বিশ্বনাথদা আমার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন একবার এসেই সবকিছু পেয়ে গেলে কি করে হবে? এই খিদেটা নিয়েই ঘরে ফিরতে হবে, পরের বার আসার জন্য। এখন যাও আশ্রমে, সমাধিতে মাকে সব কিছু জানাও, আর যতক্ষণ আছো ততক্ষণ আশ্রমকে দেখে নাও মনপ্রাণ ভরে। কত বছরের আগের কথা...। কিন্তু আজও ঐদিনের প্রতিটি কথা কানের মধ্যে বাজছে। আর এই নিয়েই বারবার মার কাছে যাওয়া আর পথ চলা...। এই স্মৃতিচারণাই বিশ্বনাথদার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন।

[বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোশিয়েশন মুখপত্র 'সমর্পন'
(আগস্ট ২০২৩) এ প্রকাশিত; পুনর্মুদ্রণ]

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়

শুধু একটি নাম নয় ...

অধীতী বন্দ্যোপাধ্যায়,
কোলকাতা

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় শুধু একটি নাম নয়, তিনি আমাদের মত দিশাহীন বহু যুবক যুবতীর উজ্জ্বল আলোকময় জীবনপথের দিশারী। আমাদের চিন্তা, চেতনা, কর্মধারার সঙ্গে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছেন। তাঁর কথা বলতে গেলে মনে ভেসে আসে সেই ছেলেবেলার ছোটগল্পের অনুভূতি—, যে গল্প শেষ হয়েও শেষ হয় না, পরিশেষের অতৃপ্তির মধ্যে রেখে যায় অসীমের সম্ভাবনা।

২২শে মে, ২০২৩ সেই দিন, যেদিন তিনি তাঁর কর্মবিরতি গ্রহণ করেছেন। তিনি হয়ত হারিয়ে গেছেন আমাদের মানুষী এই জগৎ থেকে, কিন্তু, আরও বেশি প্রগাঢ় ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছেন আমাদের জীবনযাত্রায়, কর্মধারায়। আমরা আমাদের ব্যক্তি পরিচয়কে দূরে সরিয়ে হয়ে উঠতে পেরেছি শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির যুববিভাগের কর্মীবৃন্দ। ২০০২ সালে মুষ্টিমেয় কিছু যুবক-যুবতী ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে সূচনা করে যুববিভাগ। কিন্তু, এখানেও সেই মানুষটি, যিনি কারুর বিশ্বনাথদা কিংবা কারুর বিশ্বনাথ জ্যেঠু, তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এই যুবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সময়ে নানান বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, স্বয়ং শ্রী অরবিন্দ যেমন বলেছিলেন , ‘দেখিতেছি, আমরা দেশকে পুরাতনের কারাগার ভাঙিয়া নূতনকে সৃষ্টি করিবার জন্য ডাকিতেছি বলিয়া অনেকের মনে ক্রোধ, ভীতি ও আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে।’ পাঠমন্দিরের বাতাবরণও এর ব্যতিক্রম ছিল না। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সংঘাত সর্বত্র, সর্বকালের। কিন্তু, তিনি (বিশ্বনাথ জ্যেঠু) ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সত্তা, চিরযুবা , তাঁর মন্ত্রই হল মা-এর সকল শিক্ষা, তাঁর দিশারী হল মা-এর শক্তি-ভালোবাসা। মা বলেছিলেন , “যা কিছু অপূরণীয় তা কখনই মেনে না নেওয়াই হবে তারুণ্য।” আর আমাদের সকলের প্রিয় ওই মানুষটি ছিলেন সেই তারুণ্যের প্রতীক। নানান বিরোধ সত্ত্বেও

কখনই তিনি অস্তমিত হতে দেননি ভবিষ্যতের নবসূর্যোদয়ের সম্ভাবনা। সকল প্রতিকূলতার চারাগাছগুলিকে শিখিয়েছিলেন সযত্নে বেড়া দিতে, যাতে একদিন তারা মহীরুহ হয়ে উঠতে পারে। মা-এর শক্তিকে পাথেয় করে চিরন্তন সংগ্রাম করে গেছেন প্রবীণ ও নবীনের মেলবন্ধনের প্রচেষ্টায়। প্রবীণদের কাছে উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন নবীনদের আশা, চিন্তা, চেতনা-ভাবধারা, নবীনদের শেখাতে চেয়েছেন ধৈর্য্যশীল হতে, পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে। নবীনরা যখনই বিমর্ষ হয়েছে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, ভুলেছে তাদের পথ তখনই তিনি আলোকদিশারী হয়েছেন , বার্তা দিয়েছেন ধুনী জ্বালিয়ে রাখার। তিনিই ছিলেন আমাদের সেই সঞ্জীবনী সুধা , গহন, গহীন আঁধার, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে, অপশক্তির বারংবার আঘাতে যিনি আমাদের বিলীন হতে দেননি, প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়েছেন , তোমরা আলোর পথযাত্রী, এই তমসাবৃত রাত্রি সাময়িক, মা-এর উপর ভরসা রাখো, মাকে কাণ্ডারী করে স্রোতে এগিয়ে চলো তিনিই গন্তব্যে পৌঁছে দেবেন, জয় সুনিশ্চিত।

মা এক জায়গায় বলেছিলেন , "আমি কুড়ি বছরের বৃদ্ধ ও সত্তর বছরের তরুণদের দেখেছি।" বিশ্বনাথ জ্যেঠু ছিলেন সেই সত্তর বছরের তরুণ, যিনি মাঘ মাসের প্রবল শীতে কোন্নগরের মুক্তমঞ্চে বলে যাচ্ছেন মা-এর কথা, শ্রী অরবিন্দের কথা, আর আমরা কফির কাপে চুমুক দিয়ে বাড়িতে বসে শুনছি সেই বক্তৃতার রেকর্ডিং। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি, ভরসা হারাননি। যখন তাঁকে বলেছিলাম, তাঁর উত্তর ছিল , "ওটা তো তোদের কাজ নয়, ওটা আমার কাজ ছিল। তোরা তোদের মা যে কাজ দিয়েছেন সেটা করবি।" এমনই মানুষ আমাদের বিশ্বনাথ জ্যেঠু। আমাদের আলস্য, কপটতা, অক্ষমতাকে উপহাস না করে, গুরুত্ব প্রদান না করে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আমাদের উদ্যম, ইচ্ছাশক্তিকে আরও আরও প্রগাঢ় করে তুলতে। প্রতিমুহূর্তে কেমনভাবে নবজন্মলাভ করতে হয় সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন তাঁর সমগ্র জীবনে। বারংবার তিনি স্মরণ করাতেন মা-এর সেই অভয়বাণী , "কখনও পিছনের দিকে ফিরে তাকাবে না। দৃষ্টি যেন সামনের দিকে থাকে, সর্বদা সামনের দিকে। আর সর্বদা এগিয়ে চলবে।" আর তাই বার্ধক্য, জরা তাঁকে কখনই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে পারেনি। তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি যুববিভাগের কিছু কর্মীকে জানিয়ে গেছেন , "কোন সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র, কী মন্ত্র হবে গাওয়া।"

আজ দুই বছর অতিক্রান্ত। জীবনের এমন কোনও মুহূর্ত নেই যেখানে তাঁর কথা আমরা স্মরণ করিনি। বিস্মৃতির প্রদোষে তিনি হয়েছেন জ্যোতি। বর্তমানে পাঠমন্দিরে যে বিপুল কর্মযজ্ঞে আমরা অংশগ্রহণ করেছি সেখানে কখনও কখনও অনুভব করেছি আমরা অভিভাবকহীন, পৌরোহিত্যহীন। তখনই অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, "কি হবে আমার কল্পান্তের প্রলয়ের প্রশ্বাসে? তুমি মোরে আছ ধরি।" এই 'তুমি' আর কেউ নন , বিশ্বজননী, মধুময়ী মা। জীবনের সকল সংকটে, দ্বন্দ্বে ব্যক্তিনির্ভর না হয়ে মাতৃনির্ভর হয়ে ওঠার শিক্ষাই আমাদের দিয়েছিলেন ঐ মানুষটি:

"মা ভগবতীর করুণার "স্পর্শে সংকট সুযোগে পরিণত হয়, ব্যর্থতা সার্থকতায়, দুর্বলতা অমোঘ সামর্থ্যে পরিবর্তিত হয়।" দীর্ঘদিন শ্রী অরবিন্দের 'মা' গ্রন্থ অবলম্বনে সাধনার ক্লাস করতেন জ্যেঠু। বর্তমান যুগে যখন চারদিকে ধর্মের প্রহসন, কিশোর থেকে প্রবীণ সমগ্র সমাজ যখন ধর্মবিকারগ্রস্ত তখন শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দিরে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীঅরবিন্দের যোগ তথা প্রকৃত আধ্যাত্মিক সত্য উন্মোচনের এই ক্লাসটি আমাদের মত তরুণ-তরুণীর মনে এই আশ্বাস জাগাত ধর্মকারার প্রাচীরে নিশ্চয়ই বজ্রপাত হবে আর এই অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোকও একদিন নিশ্চিতরূপে প্রজ্জ্বলিত হবে। আর ঠিক সেই ক্ষণেই জ্যেঠু দৃপ্ত কণ্ঠে বলতেন , "ভারত সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখাবে— শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" সারাদিনের অতৃপ্তি, ক্লান্তিময়, তৃষ্ণার্ত জীবনযাত্রার উপর সার্বিক পূর্ণতার শীলমোহর ছিল জ্যেঠুর ওই কথাগুলো। তাই, আশ্রমের একজন বিশিষ্ট প্রবীণ সাধকের কাছে জ্যেঠুর প্রশংসায় শুনেছিলাম , He is a magnificent orator. হ্যাঁ, সত্যিই এই মানুষটির নানান পরিচয় , কখনও সুবক্তা, কখনও পথপ্রদর্শক, কখনও কর্মী, কখনও সুদক্ষ সংগঠক ও নেতা। প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত জীবন আমরা তাঁকে পেয়েছি নানা ভূমিকায়। তাই আজ তাঁর অভাব অনুভূ ত হলেও পরিলক্ষিত হয় না। প্রবহমান জীবনে প্রতিষ্ঠানের কর্ম এগিয়ে চলে সুনির্দিষ্ট সফলতার লক্ষ্যে, সেখানে আসে না কোনও যতিচিহ্ন, বিরতি। পূর্ণ পরিণতির জন্যই থাকে আমাদের ব্যাকুলতা। আর ওই মানুষটির জীবন ছিল সেই পূর্ণতার লক্ষ্যে বলিপ্রদত্ত। শ্রীঅরবিন্দের কথায় , "যদি তুমি দিব্য কর্মের সত্য কর্মী হতে চাও, তবে তোমার লক্ষ্য প্রথমেই হবে সকল বাসনা থেকে, আত্মসর্বস্ব অহংকার থেকে নিজেকে নিঃশেষে মুক্ত করা। তোমার সমস্ত জীবন হবে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি ও বলি। কর্মে তোমার একমাত্র লক্ষ্য হবে ভাগবতী শক্তির লীলায় সেবা করা, তাঁকে ধারণ করা, সার্থক করা, তাঁর প্রকাশের যন্ত্র হয়ে ওঠা।" সত্যিই তিনি ছিলেন মা-এর বিপুল কর্মকাণ্ডের এক অতন্দ্র প্রহরী, অজেয় যন্ত্র। আজও তাই আমাদের মর্মে স্পন্দিত হয় তাঁর ছন্দ,

"উছলি তুলুক কাল-ঊর্মিলা আঁধার-আলোকরাশি
জন্মমৃত্যুলীনা,
সবার উপরে তব শাশ্বত আনন্দে উদ্ভাসি'
বাজিল আমার বীণা।"

— নিশিকান্ত

চিরন্তনী,পৃ-২৮

বিশ্বনাথদার কিছু স্মৃতি

মনোরঞ্জন দেবনাথ
রাণাঘাট

বিশ্বনাথদার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ০৪.০৬.১৯৭৮ সালে পন্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম গেটে, দিনটা ছিল রবিবার। আমি তখন আশ্রমে থাকি। আমার বন্ধু স্মরজিত বিশ্বাস আমাকে পত্র লিখে জানাল যে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় প্রথমবার আশ্রমে যাচ্ছেন, তুমি তাঁকে তোমার সাধ্যমত একটু সাহায্য করো। আমি বিশ্বনাথদাকে চিনতাম না। স্মরজিত আমাকে পত্রে জানাল যে তিনি ধুতি-পাঞ্জাবী অথবা পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত থাকবেন। আর তুমি ফুল প্যান্ট হাফ সার্ট পরে আশ্রমে মেন গেটে সকালে ডাইনিং হলে খাওয়ার পরে দাঁড়িয়ে থাকবে। যথা সময়ে আমি আশ্রম গেটে দাঁড়িয়ে আছি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। ভদ্রলোক একটি তিন চার বছরের বাচ্চা মেয়ে এবং একজন ভদ্রমহিলা সহ আশ্রম গেটে এলেন। তখন আমার দেখে মনে হল এই ভদ্রলোকই আমার বন্ধু স্মরজিৎ কথিত অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় হবেন। তিনি এসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মনোরঞ্জন দেবনাথ? আমি বল্লাম, আপনি কি অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়? আমরা উভয়েই বল্লাম, হ্যাঁ আমিই সেই ব্যক্তি। তিনি বললেন, আমার এই কন্যাকে আশ্রম স্কুলে ভর্তি করতে চাই, তুমি কি এই ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করতে পার? আমি উত্তরে বললাম, আপনারা সমাধি প্রণাম করে আসুন, আমি এখানে অপেক্ষা করছি, পরে শুনছি।

বিশ্বনাথদারা সমাধি প্রণাম করে ফিরে এলেন। এই দিনটি রবিবার হওয়ায় আমার দিক থেকে কোনও তাড়া ছিল না। আমি প্রেসে কাজ করি। রবিবার ছুটি। আমি বললাম, এবার বলুন আপনার মেয়ের আশ্রমে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে আমি কি সাহায্য করতে পারি। বিশ্বনাথদা আমায় উত্তরে বললেন, আমার মেয়ে পরমার আশ্রম স্কুলে ভর্তির জন্য একজন আশ্রমের কাউকে স্থানীয় অভিভাবক লাগবে। তোমার কি কোন

আশ্রমের সাধকের সাথে পরিচয় আছে যিনি আমার মেয়ের স্থানীয় অভিভাবক, Local Guardian হতে রাজি হবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ একজন আছেন যিনি ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন। তার নাম, বীরেন্দ্র শেখর। তিনি একজন কবি। বীরেনদা আমাকে খুবই স্নেহ করেন, তাঁকে বলে দেখতে পারি। বললাম, আপনারা আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে ঠিক এই আশ্রম গেটেই আসবেন। আগামীকাল আমার ডির্পাটমেন্ট খোলা, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবনা। এই বলে, আমি সেখান থেকে চলে এলাম।

পরের দিন অর্থাৎ সোমবার আবার বিশ্বনাথদার সাথে ঠিক সকাল সাড়ে সাতটায় আশ্রম গেটে সাক্ষাৎ হল। ইতিমধ্যে আমি বীরেনদার সাথে দেখা করে বিশ্বনাথদার মেয়ের আশ্রম স্কুলে ভর্তির বিষয়ে কথা বলেছিলাম। আমি বিশ্বনাথদাকে বললাম, আপনার মেয়ের লোকাল গার্জিয়ান হওয়ার জন্য আমি বীরেনদাকে অনুরোধ করেছি। বীরেনদা বলেছেন আমি যেন আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই তিনি এ ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চান। আপনি আজ বিকেল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় এই আশ্রম গেটে অপেক্ষা করবেন, আমি তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাব।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আমি বিশ্বনাথদাকে বীরেনদার কাছে নিয়ে গেলাম। বিশ্বনাথদা সপরিবারে বীরেনদার কাছে গেলেন। প্রায় ঘন্টাখানেক আলাপ আলোচনার পরে বিশ্বনাথদারা এপ্লিকেশন ফর্মে লোকাল গার্জিয়ান হিসাবে বীরেনদা সই করে দিলেন। এর পরে বিশ্বনাথদারা আশ্রমে কয়েকদিন ছিলেন। এরপর যতদিন বিশ্বনাথদারা আশ্রমে ছিলেন ততদিন প্রতিদিনই প্রায় বিশ্বনাথদার কন্যা পরমাকে রাজভবনের সামনের পার্কে নিয়ে খেলা করতাম।

আমিও ১৯৭৮ সালের আগষ্ট দর্শনের পর আরও পড়াশুনা করার জন্য আশ্রম ছেড়ে বাড়ীতে চলে আসি। কিন্তু বিশ্বনাথদার সাথে মাঝে মাঝে পত্রালাপে যোগাযোগ ছিল।

এরপর বিশ্বনাথদা যখন রাণাঘাটে তাঁর কলেজ বেলডাঙা আসা যাওয়ার পথে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটিতে, রেলষ্টেশনের অতি কাছে, মাঝে মাঝেই আসতেন এবং কিছুক্ষণ থাকতেন তখন তাঁর সঙ্গলাভ করার জন্য আমি দেখা করতাম। বিশ্বনাথদা খুব সুন্দর, প্রাঞ্জলভাবে মা ও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু বলতেন। বিশ্বনাথদার কথা শোনার জন্য ধীরে ধীরে অনেকেই আসতে থাকলেন এবং অল্পকিছুদিনের মধ্যেই মা-শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁর কথা শোনার জন্য সোসাইটির পরিচালন কর্তৃপক্ষ তাঁকে মাসে একদিন নিয়ম করে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলে বিশ্বনাথদা আসতে লাগলেন। বেশীরভাগই ছিল কোনও ছুটির দিনে অথবা মা-শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের দিনে। খুব শীঘ্রই বিশ্বনাথদার

রাণাঘাটে খুব ভাল বক্তা হিসাবে খ্যাতি হল। বিশ্বনাথদা সকলেরই আপনার লোক হলেন।

এরপরে ২০০৬ সালে বিশ্বনাথদার সাথে খুবই নিবিড় যোগাযোগ হল। বিশ্বনাথদা শ্রীঅরবিন্দস্ অ্যাকশন নামে সংগঠন করার প্রস্তাব রাখলেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন, মনোরঞ্জন আগামী জানুয়ারী ২০০৬-এর প্রথম রবিবারে কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দ ভবনে এসো, কয়েকজনকে বলেছি আসার জন্য। একটা বিশেষ বিষয়ে একটু কথা বলব। সময়টা ছিল দুপুরের পরে। আমিও রাণাঘাট থেকে আরো দু-একজনকে নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ভবন কলকাতায় গেলাম। রবিবার শ্রীঅরবিন্দ ভবন বন্ধ থাকায় মাঠে ঘাসের উপর বসা হল। মোট বারোজন উপস্থিত ছিলেন। এই বারোজনার মধ্যে সুব্রত সেনও ছিলেন। সিদ্ধান্ত হল এই বিষয়ে আরো আলাপ আলোচনা হবে। তবে একটা ব্যাপারে উপস্থিত সকলেই সহমত হল যে এই ধরণের সংগঠন বাংলায় করা হবে। পরে আবার কোথায় বসা হবে তা যোগাযোগ করার জন্য সুব্রত সেনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হল।

এরপর রাণাঘাটে আমার উৎসাহে এবং সক্রিয় উদ্যোগে আমার বন্ধু স্মরজিৎ বিশ্বাসের বাড়ীতে বসা হল। 'শ্রীঅরবিন্দস্ অ্যাকশন ট্রাষ্ট বোর্ড' গঠিত হল। আমি হলাম এই ট্রাষ্ট বোর্ডের সেটলার (Settler) এবং একজন ট্রাষ্টি। সবই বিশ্বনাথদার পরামর্শে। কারণ সবাই বিশ্বনাথদার উপর দায়িত্ব দিয়েছিল ট্রাষ্টি নির্বাচন করার। মোট পাঁচজন ট্রাষ্টি। বিশ্বনাথদা কোনও ট্রাষ্টি হলেন না। কিন্তু বিশ্বনাথদা সমস্ত কাজেই পরামর্শ দিতেন। তাঁরই পরামর্শে একটাকা মূল্যের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হল। সুব্রত সেন সম্পাদক। আমি তার প্রকাশক। বিভিন্ন জায়গায় শ্রীঅরবিন্দ পাঠচক্র গঠিত হল। এই পাঠচক্র করার ব্যাপারে একবার নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম বর্ডার এলাকায় বিশ্বনাথদাকে নিয়ে গেলাম। বিশ্বনাথদা এই শ্রীঅরবিন্দ কর্মধারার কাজে প্রায় চড়কির মতো বিভিন্ন জায়গায় গেছেন। তাঁর সাথে প্রায় সব জায়গায়ই আমিও গেছি।

বিশ্বনাথদার মৃত্যুর তিন চারদিন আগে পর্যন্ত আমার সাথে ফোনে প্রায় প্রতিদিনই কথা হতো। যখন তাঁর চলে যাওয়ার খবর শুনলাম তখন আমি একেবারেই ভেঙে পড়েছিলাম। তাঁর কথা বলে শেষ করতে পারব না। বিশ্বনাথদার কথায় বা আচরণে কখনো কোন আক্ষেপ বা হতাশা দেখিনি। বিশ্বনাথদাকে বন্ধুর মত সব কথা বলতাম। তাঁর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে এক বিশাল শূন্যতা নিয়ে এল। জানি না তাঁর জায়গা আর পূরণ হবে কিনা!

অনন্য বিশ্বনাথদা

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
কোলকাতা

বছর দশেক আগেকার কথা। জনা পনেরো সদ্যোত্তীর্ণ-কৈশোর ছেলেমেয়ে , যারা তখনও তাদের প্রথাগত পড়াশোনার ব্যস্ততার মধ্যেই রয়েছে,আমার কাছে এক অসচরাচর প্রস্তাব রাখল। তারা বলল, পড়াশোনার প্রবল চাপ এবং সফলভাবে তা শেষ করে পেশাগত ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার বাধ্যতার উদ্বেগ সময়ের সবটুকুকে দখল করে রাখবার পরেও, ভেতরের কোনো কোনো হঠাৎ ভেসে ওঠা প্রসঙ্গ বা প্রশ্ন তাদের ব্যাকুল না করলেও কিঞ্চিত অস্বস্তিতে রাখে। এসবের নিরাকরণার্থে তারা নিজেদের পড়াশোনার বাইরের সামান্য যে সময়, তাকে হাসি, মজা, বিচিত্র বিনোদনে ভরিয়ে রেখেও খুব সফল হয়নি। তাদের মনে হয়েছিল এইসব ভেতরের জিজ্ঞাসাগুলোর উত্তর হয়ত, ঠিক প্রথাগত ধর্মাচরণ না হলেও চর্চিত আধ্যাত্মিকতার অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে সব পথে হেঁটেও খুব সুবিধে হয়নি। এরা, অতএব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অনিয়মিতভাবে হলেও একত্রিত হবে পূর্বনির্ধারিত কোন জায়গায়, নিজেদের ভেতরের প্রশ্ন বা প্রসঙ্গগুলোকে অন্যদের সামনে উপস্থাপিত করবে এবং এভাবে একে অপরকে উত্তর খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। এই পর্যন্ত, তবু ভাবতে পেরেছিলুম যখন ওদের সঙ্গে এ'বিষয়ে, ওদের আগ্রহেই, আমার প্রথম কথাবার্তা হচ্ছিল। ওদের পরবর্তী বক্তব্য আমাকে কিঞ্চিত বিস্মিত না ক'রে পারেনি। সে বক্তব্য ছিল, আমাকে, ওদের সেই প্রস্তাবিত মিলিত আলাপে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ। বিস্মিত হলেও, সেই মূহুর্তে আমার মাথায় শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ দা'র নামটি এসে গেল। আমি প্রস্তাব করলুম, আমি তো থাকবই, তবে যদি এই ধরণের সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনটিতে এমন একজন উপস্থিত থাকেন, যাঁর প্রাথমিক বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক আলাপের সূত্রপাত হয় এবং যিনি তাদের থেকে বয়সের বিচারে অনেকটা

বড় হয়েও এ'বিষয়ে তাদের কিঞ্চিত সহায়তা প্রদান করতে পারবেন বলেই আমার মনে হচ্ছিল। প্রস্তাবটি দেওয়ার সময়েও যে আমার মধ্যে দ্বিধা ছিল না তা নয়, তবু আমার মনে হয়েছিল অনেকটা বড় হয়েও বিশ্বনাথদা'ই একমাত্র (অবশ্যই আমার অবহিতির সীমার অন্তর্গত ক্ষেত্রের মধ্যে) যিনি ওদের সঙ্গে সার্থকভাবে আলাপের সূচনায় যুক্ত থাকতে পারবেন। মায়ের অশেষ কৃপায়, ছেলেমেয়েগুলো রাজি হয়ে গেল। আমি এবার বিশ্বনাথদা'র কাছে প্রস্তাব পেশ করলুম। উত্তর, "কাল বললে কালই বসব গৌতম।" সেই সময়ে মানুষটির চুয়াত্তর অতিক্রান্ত , তবু তাঁর তরুণসমাজের সঙ্গে যুক্ত হবার আগ্রহ ও উৎসাহ আমাকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

যেদিন তিনি এলেন, এমনই এক হৈমন্তিক অপরাহ্নে, শহরতলীর এক নিতান্তই সাদামাটা শতরঞ্চি বিছোনো ঘরে, তাঁকে শোনবার জন্য সেদিন মাত্র জনা কুড়ি সদ্যতরুণ মানুষ উপস্থিত এবং অবশ্যই প্রস্তাবক হিসেবে আমি। সেই বিশ্বনাথ রায় নন, যাঁকে শোনবার জন্যে সব আসন ভরে যাবার পরেও মানুষ দাঁড়িয়ে থাকেন। এমন 'সফল' ও 'জনপ্রিয়' মানুষটি যখন স্বেচ্ছায় এ'রকম এক 'অনুষ্ঠানে' উপস্থিত হতে সম্মত হন, যে অনুষ্ঠানের সংবাদ পূর্বে ও পরে নানা 'মাধ্যমে' সম্প্রচারিত হবে না , তখন যেন তাঁর একটি ভিন্নতর পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রায় চল্লিশ মিনিটের বক্তব্য। না ভাষণ নয়, ক্লাস নয়, একেবারেই কথা , যেমনটা আত্মজনের উদ্দেশ্যে আমরা বলে থাকি। তবে, সংহত, বিষয়ানুগ, অবশ্যই সহজ-সরল এবং সচেতনভাবে শ্রীমা বা শ্রীঅরবিন্দের উল্লেখবর্জিত, যদিও মূলগতভাবে তাঁদের কথাই, একেবারে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের উপযুক্ত করে। প্রসঙ্গে এসেছিল শ্রীমার আশ্রম পরিচালনার অভিনবত্বের বিষয়। তিনি বলেছিলেন, মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যার তথাকথিত সাধারণ অনুপুঙ্খতার প্রতিটি স্তরের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার স্পন্দন—যা প্রকাশিত হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। তাদের এই উন্মুখরতার প্রকাশ হল তথাকথিত সফল, সার্থক, স্বচ্ছন্দপ্রবাহী জীবনেও জেগে উঠতে থাকা নানা প্রশ্ন, বিচিত্র অস্বস্তি, চেতনাগত সব গ্রন্থিসমূহ। এসবের সূত্র ধরে যদি চেতনার গভীরে নিমজ্জিত হবার চেষ্টা করা যায় তাহলে দৈনন্দিনতার যান্ত্রিকতার মধ্যে থেকেও এমন এক আনন্দময় উৎসারের সন্ধান মেলে যা জীবনকে ভিন্নতর এক অভিমুখের দিকে এগিয়ে চলবার প্রেরণা যোগায়। কথাগুলি বা তাদের অন্তরের মূলগত প্রেরণা অবশ্যই শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের কিন্তু জীবনে তাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রটিকে খুঁজে বের করা; কিম্বা যাদের জন্যে বলা হচ্ছে , তাদের প্রয়োজনানুগভাবে বিষয়সমূহকে উত্থাপন ও বিন্যস্ত করা , এ'সব বক্তার একেবারে নিজস্ব। কতটা গভীরভাবে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে বয়সের এতখানি ব্যবধান সত্ত্বেও চল্লিশ মিনিট ধরে সদ্যতরুণদের কাছে বক্তব্যকে এতখানি কার্যকরীভাবে উপস্থাপিত করা যায় , সেদিন একেবারে

সামনে থেকে দেখতে পেয়েছিলুম। যখন প্রশ্নোত্তরের পালা এল তখন এমন অনায়াসে তারা তাদের নানা ব্যক্তিগত সমস্যা বা বোধগত অস্বাচ্ছন্দের কথা বলছিল; সামাজিক, পারিবারিক, পারস্পরিক সম্পর্কগত যে সব মনস্তাত্বিক জটিলতায় আজকালকার কিশোর বা তরুণসমাজ নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত থেকেও নিরাকরণের পথ খুঁজে পায় না , সে সব জটিলতার বিষয় এমন বিশ্বাসভরে তারা প্রবীণ মানুষটির কাছে উপস্থাপিত করছিল এবং এমন আন্তরিকতায়, অভিভাবকসুলভ ভালবাসায় বিশ্বনাথদা সে'সব ধৈর্য ধরে শুনছিলেন ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পথ বলে দিচ্ছিলেন যে, সেই পর্বটি হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও কার্যকরী।

অনেক সংশয় ও সন্দেহের ক্ষেত্রে উত্তর বলতে ঠিক যা বোঝায় তা' পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে বিশ্বনাথদা যে পথটি বলে দিচ্ছিলেন তা' একেবারেই অভিনব। প্রথমতঃ তিনি বলছিলেন তরুণ সমাজ এক নতুন ভবিষ্যতের অভিমুখিনতা অন্তরে নিয়ে বিকশিত হচ্ছে , অথচ বিকাশের পথটি হল চর্চিত ও পুনরাবৃত্ত। অন্তরের নব সম্ভাবনার প্রকাশোন্মুখ দ্যোতনা আর বাইরের পুরাতন অভ্যস্ততার অনুসরণের দ্বন্দ্বের প্রকাশ হিসেবে তাদের মনে জেগে থাকছে এমন প্রশ্ন ও সংশয় যার উত্তর কিংবা সমাধান অপ্রাপ্ত থেকে যাচ্ছে। এখানে প্রয়োজন অন্তর থেকেই উৎসারিত হতে থাকা এমন এক প্রেরণার যার উৎস মানুষী সত্ত্বার অভ্যন্তরে হলেও যা আসলে মানুষী নয়। এর প্রকৃতি উচ্চতর, উদারতর ও সূক্ষ্মতর। এই প্রেরণার সন্ধান যেমন অধ্যাত্মসাধক পান, যেমন উচ্চস্তরের সঙ্গীতসাধক পান, যেমন মহান বিজ্ঞানী পান , একই রকম ভাবে সকল মানুষই পেতে পারেন যদি তিনি একটু আত্মগত হতে প্রয়াসী হন। তখন সেই প্রেরণা তাঁর বাহ্য কর্মকে করে তুলবে আনন্দময়।

একেবারেই শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের কথা। কিন্তু বিশ্বনাথদার উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে ছেলেমেয়েদের একাগ্র অভিনিবেশ নিয়ে বসিয়ে রেখেছিল সমস্ত সময়টা। এরপর প্রায় নিয়মিতভাবে তারা বসত আমার সঙ্গে তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে। বিশ্বনাথদা নিয়মিত খবর রাখতেন তাদের, আমার মাধ্যমে। বার তিনেক বিশ্বনাথদা বসেছিলেন এদের সঙ্গে। তারপর চাকরী বা উচ্চতর পাঠের উদ্দেশ্যে এরা ছড়িয়ে পড়ল দেশে-বিদেশে, কিন্তু এখনও তাদের সঙ্গে কথা হলে বিশ্বনাথদা'র প্রসঙ্গ অবধারিতভাবে এসে যায়।

প্রায় চল্লিশ বছরের পরিচয় শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথদা'র সঙ্গে। আমার অশেষ সৌভাগ্য নানা জায়গায় তাঁর কথা শুনেছি, 'বর্তিকা'র পাঠমন্দির সংবাদ পড়েছি মুগ্ধতার সঙ্গে। তাঁর গবেষণামূলক কাজগুলির গভীরতা ও পরিশ্রম বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত করেছে আমাকে। তবু এই অভিজ্ঞতাটি বিশিষ্ট হয়ে আছে আমার কাছে।

বিশ্বনাথদা

অতনু চট্টোপাধ্যায়
বেহালা,কলকাতা

আপনারা সবাই জানেন ইংরাজিতে একটা কথা আছে Hunger of Success. তাই আমি যখন শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের আলোতে প্রথম প্রবেশ করি তখন আমার ভেতরে একটা জিনিষ ভীষণভাবে কাজ করত, সেটা অবশ্য এখনও করে, সেটাকে আমি বলতে পারি Hunger of Knowledge, আর এই Knowledge- এর মূল বিষয়বস্তু ছিল কি করে ও কি ভাবে শ্রীঅরবিন্দ ও মাকে আরও বেশি করে জানা যায় এবং তাঁদের যোগের পথে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়। আমার এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য মা আমাকে এমন একজন মাস্টারমশাই-এর কাছে পাঠালেন, যাঁর কাছে এসে আমার এই প্রশ্নের সব সমাধান পেয়ে গেলাম, তিনি হলেন আমার ও আমাদের সবার প্রিয় বিশ্বনাথদা (রায়)।

তাহলে এবার শুরু করা যাক সেই দিনটির কথা দিয়ে যেদিন প্রথম আমার জীবনে বিশ্বনাথদা এলেন এবং আমার অন্তরে সারা জীবনের জন্য থেকে গেলেন। এইটুকু আমি জোর গলায় বলতে পারি যে আমার জীবনের শেষ দিন অবধি বিশ্বনাথদাকে আমি ভুলতে পারব না। ওনার স্নেহ ও ভালবাসা এতটাই অকৃত্রিম যা আজকের দিনে যে কোন মানুষের কাছে পাওয়া খুবই দুর্লভ।

ঘটনাটা ঘটেছিল তুহিনদার (চট্টোপাধ্যায়) বাড়িতে সখের বাজারে। সেই সময় বিশ্বনাথদা মাসে একদিন রবিবার করে আমাদের বেহালার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভক্তদের বাড়িতে সবাইকে নিয়ে এক ঘন্টার একটা পাঠচক্র করতেন, আর সেইখান থেকেই বহু মানুষ উপকৃত হতে পারতেন শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের বিষয়ে জানতে। এই পাঠচক্রের দিনগুলি স্থির করা হত বিশ্বনাথদার অনুমতিক্রমে। সেদিন আমি প্রথম বিশ্বনাথদাকে দেখি এবং আমার মনের মধ্যে এক তীব্র ইচ্ছা জাগে যে আমার বাড়িতে

একদিন যদি বিশ্বনাথদাকে নিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে কি দারুণ হত। কারণ আমি তখন একটু একটু করে শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের সম্পর্কে জানছি তাই আমার খুব আগ্রহ যে ওনাদের বিষয়ে আরও বিশদে জানতে হবে এবং তাই আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে জানানোর জন্য এমন এক বিশেষ ব্যক্তির প্রয়োজন যার অভাব পূর্ণ করতে পারেন একমাত্র বিশ্বনাথদা।

যাই হোক, সেদিনকার পাঠচক্রের শেষে বিশ্বনাথদা ওনার পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী আমার পাশে বসে থাকা এক বয়স্ক ভদ্রলোককে বললেন, 'তাহলে ননীবাবু, সামনের মাসের রবিবার আপনার বাড়িতে আমরা বসছি?'

আমার পাশে বসা ননীবাবু দেখলাম একটু কেমন যেন ইতস্ততঃ বোধ করে বললেন, 'না, আসলে বিশ্বনাথদা, ব্যাপারটা কি হয়েছে, আমার ঘরে মিস্তিরির কাজ হচ্ছে তাই সামনের মাসে আমার বাড়িতে করা সম্ভব হবে না।'

ননীবাবুর এই কথাটা শুনে কেন জানিনা আমার মনে প্রশ্ন জাগলো যে আমি যদি চাই সামনের মাসে আমার বাড়িতে পাঠচক্র করতে, তাহলে কি উনি যাবেন? কিন্তু অসুবিধাটা হল আমার সাথে তখনও বিশ্বনাথদার সেইরকম কোন পরিচয় ঘটেনি এবং ওনার ওই ব্যক্তিত্বপূর্ণ অসাধারণ গাম্ভীর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমার কথা বলার সাহসও তখন হয়নি, তাই তুহিনদাকে প্রশ্ন করলাম, দাদা, সামনের রবিবার যদি ওনাকে আমার বাড়িতে যেতে বলি উনি কি যাবেন? তুহিনদা আমায় বললেন, হ্যাঁ, আপনি নিজেই বলে দেখুন না, বিশ্বনাথদাকে ভয় কিসের?

আমি খুব দুরুদুরু বুকে বিশ্বনাথদাকে প্রশ্ন করলাম দাদা, আপনি কি আমার বাড়িতে আগামী ৫ই আগস্ট যেতে পারবেন? সাথে সাথে বিশ্বনাথদা বলে উঠলেন কেন নয়? নিশ্চয়ই যেতে পারব, ননীদার বাড়িতে যখন হবে না তখন তোমার বাড়িতেই যাব। সত্যি কথা বলতে, মায়ের এই অসীম কৃপা যে আমার উপর এইভাবে ঝরে পড়বে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, কারণ এই পথে যারাই এসেছেন তাদের কাছে বিশ্বনাথদাকে পাওয়া এবং ওনার সাথে ওঠাবসা করা এক বিশাল সৌভাগ্য বলা যেতে পারে। আর সেই সৌভাগ্য আমার জীবনে নেমে আসবার জন্য মায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার সেই অনুভূতি আমি একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর লাইন ধার করেই বলতে পারি,

He feels the sweetness of her mastering touch,
In all experience meets her blissful hands ; (P-66)

অবশ্য তখনও আমি জানতাম না যে আমার জন্য মা আরও কিছু রহস্য তৈরি করে রেখেছিলেন।

দিনটা ছিল রবিবার, ৫ই আগস্ট, আমি আমার পরিচিত সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম যে ঐদিন আমাদের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বিষয়ে বলতে একজন

আসবেন, আপনারা সবাই আসবেন। পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী আমি সাড়ে চারটের সময় ট্রাম ডিপো গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বিশ্বনাথদা ও তুহিনদাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য। যথারীতি একটা সংগীত পরিবেশন করে শুরু হ'ল অনুষ্ঠান। এবং তার পরেই বিশ্বনাথদা শুরু করলেন শ্রীমায়ের বেশ কিছু কথা যেটা মা বলেছিলেন আমাদের জন্মদিন সম্পর্কে। বিশ্বনাথদা যতক্ষণ বলে গেলেন সবাই হাঁ করে ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে শুনতে লাগলেন। কারণ যারা সেইদিন উপস্থিত ছিলেন তারা কেউই মা ও শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

তাই তারা এত সুন্দর একটা ঘটনা জানতে পেরে সবাই অবাক হলেন; কিন্তু সবচেয়ে অবাক হবার পালা হ'ল আমার, কারণ, আমি কখনোই বিশ্বনাথদাকে বলিনি যে সেইদিন আমার জন্মদিন। অথচ তিনি কি করে আজকের এই অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র জন্মদিনের উপরই আলোচনা করলেন! সেইদিন আমার খুবই অবাক লেগেছিল ঘটনাটা কিন্তু আজ এতদিন পর বুঝতে পারি ও অনুভব করতে পারি মা সবসময় যে আমাদের সাথে আছেন এটাই তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।

আর সেইদিন থেকেই আমি হয়ে গেলাম বিশ্বনাথদার একান্ত অনুগত ভক্ত। এবং উনিও আমাকে এতটাই স্নেহ করতেন যে তারপর থেকে আমি 'মাদার্স ভিশন' নামের ব্যানারে বছরে দুবার শ্রীমায়ের জন্মদিন ও শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনের অনুষ্ঠানগুলি করতাম। প্রতিটি অনুষ্ঠানে তিনি নিজে আনন্দ সহকারে এসে ভাষণ দিতেন এবং উপস্থিত সবাইকে মায়ের সম্পর্কে ও শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্কে জানিয়ে সমৃদ্ধ করতেন। এছাড়া, প্রতিবছর মালা গ্রাম ও দলনঘাটাতে যে বাৎসরিক অনুষ্ঠান হ'ত, সেখানে বিশ্বনাথদাকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমার উপর বর্তাত। তাই সেইসব দিনগুলি ছিল আমার কাছে এক গৌরবময় দিন, কারণ, অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা যেভাবে বিশ্বনাথদাকে আপ্যায়ন করতেন আমাকেও তারা সমান মর্যাদা দিতেন, এবং এটা সম্ভব হ'ত বিশ্বনাথদার স্নেহ ও ভালবাসার জন্য। আমিও মনে করি আমি জীবনে যদি কোন সেরা কাজ করে থাকি সেটা হল বিশ্বনাথদাকে এইসব অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া।

স্মৃতিতে অনেক কিছুই ভিড় করে আসে। বিশ্বনাথদার সাথে যারা মেলামেশা করতেন তারা সবাই জানেন যে বিশ্বনাথদা প্রত্যেককে যেমন লক্ষ্য রাখতেন তেমন ভালোওবাসতেন। সেবার বিশ্বনাথদাকে নিয়ে গেছিলাম বাঁকুড়া স্বাধ্যায় শিবির, প্রতি বছর ১১ই ফেব্রুয়ারী দিনটিতে ওখানে অনুষ্ঠান হয়। আমরা রাত্রে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে সকালবেলা পৌঁছে গেলাম। বিশ্বনাথদার সুবাদে আমারও যত্নআত্তি কম করলেন না অনুষ্ঠানের আয়োজনকারীরা। সকাল সকাল স্নান সেরে প্রাতরাশ সেরে সবে একটু বসেছি, বিশ্বনাথদা আমাকে ডেকে বললেন, অতনু, যাও, তোমার তো ছবি তোলার শখ, যাও, ক্যামেরাটা নিয়ে একটু ঘুরে এসো। ওনার যে আমার পছন্দের

বিষয়টা এতটা জানা ছিল সেটা আমার জানা ছিল না। কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ নিয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম একজন মানুষের ভেতরে কতখানি ভালবাসা থাকলে সে অন্য লোকের খুঁটিনাটি বিষয়েও খেয়াল রাখে।

একটা কথা আপনাদের জানা বিশেষ প্রয়োজন যে আমাদের এই পশ্চিমবাংলার বুকে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দকে প্রতিটি মানুষের সামনে তুলে ধরার কাজ হয়তো অনেকেই করেছেন; কিন্তু বিশ্বনাথদার মত একের পর এক তথ্য সমৃদ্ধ করে যেভাবে ওনার সেই উদাত্ত গলায় উনি বলে যেতেন ও দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পারতেন, সেটা কিন্তু আমি আর কারোর মধ্যে দেখতে পাইনি। সত্যি কথা বলতে আমি যদি বিশ্বনাথদার সাথে না যুক্ত হতে পারতাম তাহলে, মায়ের ও শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতাম না। বিশ্বনাথদার এক একটা ভাষণের মধ্যে দিয়ে আমি এমন এমন সূত্র পেয়েছি যা আমার জীবনকে অনেক সমৃদ্ধ করে তুলেছে। যেমন একবার বেহালা বিবেকানন্দ কলেজ অফ উওম্যান-এ বিশ্বনাথদাকে নিয়ে অনুষ্ঠান করছি, সেইদিন তিনি তাঁর ভাষণের মধ্যে এমন একটি বইয়ের নাম উল্লেখ করেছিলেন যেটা আমার এই পথে আসার পর বিরাট উপকারে লেগেছিল। এবং এখনও পর্যন্ত সেই বইটা আমার কাছে সবচাইতে একটা মূল্যবান বই; বইটার নাম হ'ল K. R. Srinivasa Iyenger – 'On The Mother'.

এত তথ্য সমৃদ্ধ বই আর আছে কিনা আমার বিশেষ জানা নেই। তাই বিশ্বনাথদাকে আমার জীবনে না পেলে আমি সত্যি কথা বলতে 'মা'কে পেতাম না, আর 'মা' আছেন বলেই বিশ্বনাথদাকে আমি পেয়েছিলাম একথাটাই বা অস্বীকার করি কি করে?

বিশ্বনাথদার আত্মার শান্তি কামনা করে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের চরণে আমার প্রণাম জানাই।

বিশ্বনাথদা ও সখের বাজার কেন্দ্রের স্মৃতি

সর্বাণী ভৌমিক
সখের বাজার,কোলকাতা

আমি বেহালা সখের বাজার কেন্দ্রের একজন সদস্য। যদিও এই মানুষটির সান্নিধ্য আমি খুব বেশীদিন পাইনি, তবুও তিনি আমার জীবনে এক উল্লেখযোগ্য মানুষ। সখের বাজার কেন্দ্রের জন্ম ওনার হাত ধরে যা আমাদের আবাসন থেকে খুব বেশী দূরে নয়। আমাদের জন্য একটি আস্তানা, যা তিনি দিয়েছেন তা একজন মানুষের পক্ষে কতখানি অমানুষিক কাজ, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। এই বয়সে এত পরিশ্রম করতে দেখেছি শ্রদ্ধেয় দাদাকে যে ভাবলে লজ্জা হোত। তিনি প্রতিদিন বলতেন, কেন্দ্র যেন প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় খোলা থাকে। বলতেন যে নির্দিষ্ট সময় খোলা থাকার কথা তার থেকে ১ মিনিট দেরীও যেন না হয়। আজও কেন্দ্র সেই ধারা বজায় রেখে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যে ৬টা থেকে ৭টা খোলা থাকে। বিশ্বনাথদা বলতেন 'মায়ের কাছে এসে একটু কাঁদবার জায়গাও তো চাই'। তখন হয়তো সবটা বুঝিনি। তিনি ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আজ আমরা তা অনুভব করতে পারি। তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম যেদিন তিনি 'মা' (The Mother) গ্রন্থ পড়াচ্ছিলেন। ক্লাসের শেষে তাঁকে প্রণাম করার ইচ্ছেটা দমন করতে পারিনি। অনুমতি চাইতেই তিনি বললেন, আমি প্রণামে বিশ্বাসী নই। এত বড় মানুষ হয়েও এই কথা! আমি শ্রদ্ধায় সেদিন আরও নত হয়েছিলাম। প্রশ্ন-উত্তর সেশনে বিশ্বনাথদাকে যে কোনো প্রশ্ন করা যেত। তাঁর হাত ধরেই মায়ের কাছাকাছি আসতে পেরেছি। এক কথায় বলতে গেলে তিনি আমাকে 'মা' কে ভালবাসতে শিখিয়েছেন, মায়ের দিকে ফিরতে শিখিয়েছেন। প্রতিনিয়ত তাঁর কাছে উৎসাহ পেতাম প্রতিটি বিষয়ে। তিনি আমাকে সাবিত্রী পড়তে শিখিয়েছেন। সাহস দিয়েছেন। দর্শনদিন গুলিতে তিনি আমাকে দিয়েই সাবিত্রী পড়াতেন। আমি বলতাম আমি তো বিশেষ কিছুই বুঝিনা দাদা। তাঁর উত্তর ছিল, বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বিষয় নয় সাবিত্রী। পড়ে যাও

আনন্দ পাবে। সেই সাহসে ভর করে আজও সাবিত্রী পড়ি। সময়ানুবর্তিতা আমি তাঁকে দেখেই শিখেছি। কোন বিষয়ে বলার জন্য তিন মিনিট সময় ধার্য হলে তিনি তিন মিনিটের আগেই শেষ করতেন।

আমার জীবনে বিশ্বনাথদার প্রভাব আমাকে পথ চলতে সাহায্য করে। জীবিত অবস্থায় তাঁকে কোনোদিন প্রণাম করতে পারিনি। আজ তাঁকে আমি আমার শতকোটি প্রণাম জানাই। শ্বেতশুভ্র বসন পরিহিত বিশ্বনাথদাকে যে দেখেছি এবং তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি, তা আমার পরবর্তী জীবনের পাথেয়। তিনি আমার মধ্যে আছেন এবং সারাজীবন থাকবেন। যখন তাঁর সম্পর্কে লেখার প্রস্তাবটা এল, আমি তা গ্রহণ করে নিলাম, কারণ এই সুযোগ নষ্ট করতে চাইনি।

সূর্যালোকিত পথে আমাদের বিশ্বনাথদা

সরস্বতী ভৌমিক
লেকটাউন,কলকাতা

আমাদের শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা স্বতোৎসারিত ভালবাসার সম্পর্ক দিয়ে বরাবর যে মানুষটিকে অগ্রজের ভূমিকায় দেখেছিলাম তিনি শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ রায়।

তিনি ছিলেন একনিষ্ঠতায় এবং অন্তর্মুখীনতায় ভাস্বর, আন্তঃপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ়মূল। তাই বলতে ইচ্ছে করে ,

অন্তরে যার জ্বলছে আলো
বাইরে যদি ঘনায় কালো
কি বা ক্ষতি বল?
পথিক, তুমি পথের প্রেমে দিশার পানে চল।

প্রথমেই যে কথাটা মনে আসছে বিশ্বনাথদা এত উঁচু মাপের মানুষ ছিলেন যে আমাদের মতো মানুষের কাছে নীচু হতে তাঁর অসুবিধা হতো না। কতো আত্মত্যাগ, কতো মনের প্রসারতা, কতো সাধারণ মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে টেনে তোলার চেষ্টা, এই যে মহৎপ্রাপ্তি আমাদের ঘটেছে সেটা বলতে গেলে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে যায়। তাঁর মতো মানুষের কাছে এতো অপার স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছি এ জীবনে সেটুকু আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই বলি তিনি কিভাবে আমারও চলার পথে দিশারী হয়ে উঠেছিলেন সেই প্রসঙ্গে আমার পূর্ব কথা কিছু স্মরণ করি।

প্রথম যখন অন্তরের অন্তঃস্থল অনুভব করলাম মায়ের কাজ করব তখন পণ্ডিচেরীতে নীরদদার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘নীরদদা, মায়ের কাজ কিভাবে করব?’ তখন তিনি বলেছিলেন, ‘অনিমাদির হাত ধরে থেকো।’ আর অনিমাদির নির্দেশ ছিল প্রয়োজনমত প্রতিষ্ঠানে কিংবা ব্যক্তিজীবনে বিশ্বনাথদার

পরামর্শমত চলবে। বরাবরই তাঁর ক্লাসের প্রতি ছিল আমার বিশেষ আকর্ষণ। ইনটিগ্র্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পাঠচক্রে নিয়মিত তাঁর ক্লাসে অংশগ্রহণ আর পাঠমন্দিরের ছোট ছোট কাজে তাঁর নির্দেশমত চলাই ছিল আমার আর একরকম দিশার পানে চলা। একদিন প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বনাথদা বলেছিলেন, 'এই পথ আত্মদানের পথ, এখানে কিছু পাওয়ার আশা কোর না। মান, সম্মান, যশ, প্রতিপত্তি, অর্থলাভ, আশা করলে এপথে এসো না।' বর্তমানেও তাঁর সাবধানবাণীটি স্মরণে রাখার চেষ্টা করি।

মনে পড়ে ১৯৯৩ সালে পাঠমন্দিরে School of Sri Aurobindo's Studies', এর ক্লাস শুরু করলেন বিশ্বনাথদা, তাতে আমরা চারজন অন্তর্ভুক্ত হলাম। সে সময় কিছুদিন ক্লাস চলার পর উনি একদিন আমাদের কাছে জানতে চাইলেন কতটুকু আমরা অধিগত করতে পেরেছি। প্রত্যেকেই যে যার মত উত্তর দিলেন, কিন্তু আমি নিরুত্তর রইলাম , বললাম, আমি খুবই চঞ্চল প্রকৃতির, পড়াশুনো করার চেয়ে অন্তঃপ্রকৃতির ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু হতাশ হই বারে বারে তা ফিরে আসে। বিশ্বনাথদা তখন বললেন তাহলে তুমি দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছ। এক, পড়াশোনায় মনঃসংযোগ নেই; দুই, নিজেকে ব্যালেন্সের মধ্যে রাখতে পারছ না। এর উত্তরে বলি পড়াশোনা তোমাকে নিয়মিত করতেই হবে, না করলে কিছুই বোধগম্য হবে না। অন্ততঃ মেসেজ ক্যালেণ্ডারে মেসেজগুলি নিয়মিত পাঠ করে সারাদিন ধরে মনন করবে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণের কথা প্রতি মূহুর্তে মায়ের চরণে জানাবে। তোমার যে ত্রুটি দেখার কথা বলছ সেগুলো সকলেই প্রায় দেখে বিশেষতঃ যারা নিজের সম্পর্কে সচেতন। এ যেন ঠিক কুকুরের লেজের মত, ভাববে আমি মুক্ত হয়ে গেছি, তখনই আবার তোমার মধ্যে প্রবেশ করে বিভ্রান্ত করবে , সতর্ক থেকে মায়ের চরণে সমর্পন করে যাও।

রেলের হিসাবরক্ষক বিভাগে চাকরির সুবাদে অনেক পরিচিত/অপরিচিত জনের টিকিট ও আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাকে প্রায়শঃই ভূমিকা নিতে হত, এর ধাক্কা সামলাতে না পেরে একদিন বিশ্বনাথদার কাছে বিরক্তি প্রকাশ করে ফেললাম , তিনি বললেন, ভাই, চাকরিটা মা তোমাকে দিয়েছেন, এই কাজের মাধ্যমে মা তোমার Tolerance পরীক্ষা করছেন সেটা মনে রেখো। মা-এর কাছেই বলবে , 'তুমি আমাকে পারাও', তাঁকেই সব জানাবে।

আমার নিজের পিতৃদেব দেহান্তরের আগে আমাদের আবাসগৃহ বন্টনের ব্যবস্থা করেছিলেন ভাইদের মধ্যে, তাতে আমি একটু আহত হয়েছিলাম। যে বাড়িতে জন্মেছি, বড় হয়েছি সেখানে আমার কোন ভূমিকা থাকবে না এটা মেনে নিতে পারছিলাম না আবার অন্তরের মধ্যে দ্বন্দও হচ্ছিল এই ভেবে, 'আমি তো মায়ের পথে চলেছি তাহলে কেন আমার এমন ভাব আসবে?' এই নিয়ে বিশ্বনাথদাকে জানাতে তিনি

উত্তর দিয়েছিলেন , 'এই ভাবটা তোমার আসক্তি থেকে আসছে, সেটিকে বর্জন করতে হবে। মায়ের কাছে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রার্থনা কর।'

ইনটিগ্র্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত একাদিক্রমে এগারোটি বছর তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের কথাগুলিকে আমাদের কাছে জীবন্ত করে তুলে ধরেছিলেন। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিকুলের ক্রমপ্রবহমান ধারায় বর্তমান যুগের অধ্যাত্ম পথের দিশারীর অবস্থান সম্পর্কে তিনি আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা দিয়েছিলেন। তপস্যা আমাদের বহিঃনির্ভর নয়। কবিগুরুর কথায়, "সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে", কবিগুরুর গান ও কবিতা ছিল তাঁর কন্ঠস্থ। প্রায়ই বলতেন শ্রীঅরবিন্দ পড়তে গেলে রবীন্দ্রনাথের রচনার উল্লেখ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে যায়। "জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর পেতে হবে তব পরিচয়", যে সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাঁকে জীবনচর্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

অফিসে আমাদের পাঠচক্রের মহিলা সদস্যদের নিয়ে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদেরকে একান্তভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। সেই মায়ের দেওয়া কাজটি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে সকলেই অবগত আছেন। এর পূর্বকথা কিছু স্মরণ করি। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বনাথদা পাঠমন্দিরে ডেকে নিয়ে আমাকে বললেন, সরস্বতী, তোমার এই স্বল্প পরিসরে থাকলে চলবে না, তোমাকে বড় ক্ষেত্রে, বাইরের জগতে এসে কাজ করতে হবে। আমি বললাম, আমি তো কিছুই জানি না, কিভাবে কাজ করব? তিনি বললেন, আমার মনে হয়েছে বাইরের জগতে তোমার কাজ করার সময় হয়েছে, তুমি ভেবে দেখো , এবার মায়ের যা ইচ্ছে। হঠাৎ সাত দিন পর ফোন করে বললেন, সরস্বতী, উড়িষ্যায় একটা সম্মেলন হচ্ছে, ওরা বাংলার মেয়েদের উপস্থিতি চায়, ভেবে দেখ যেতে পারবে কিনা? যদি যেতে পারো আমাকে জানাও আমি ওদের জানিয়ে দেব। গেলে দেখবে উড়িষ্যায় মেয়েরা কিভাবে কাজ করছে। একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পারবে। সেইমতো আমরা ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে কটকে শ্রীঅরবিন্দের ১৫০ তম জন্মজয়ন্তীতে প্রথম জাতীয় মহিলা পাঠচক্র সম্মেলনে যোগ দিই এবং সেখান থেকে ফিরে এসে পূর্ণ উদ্যম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকজন উৎসাহী মহিলাদের নিয়ে একটি ট্রাস্ট গঠন করে দ্বিতীয় মহিলা পাঠচক্র সম্মেলনটি সংগঠিত করার প্রয়াসে তৎপর হয়ে উঠি। সেইসময় তিনি আমাকে একটি সাবধানবাণীও দিয়েছিলেন, তোমরা এই কাজ করতে যাচ্ছ কিন্তু মনে রেখো, অসচেতনভাবে কাজ করলে সামান্য ভুলেও তোমাদের অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে। সেইটে সহ্য করার ক্ষমতা রেখো। তাঁরই উৎসাহে, প্রধানতঃ তাঁরই অনুপ্রেরণায় এই কাজে আমরা ব্রতী হয়েছিলাম। এই কাজটির পিছনে তাঁর বরাভয়

ভূমিকা ছিল আমাদের কাছে একটি বিশেষ শক্তি। সেজন্য আমরা অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতায় আবারও তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি পশ্চিমবঙ্গের মহিলা পাঠচক্র ট্রাস্টের পক্ষ থেকে। অবশ্যই সেই সঙ্গে স্বীকার্য এই কাজ সংঘটিত হতে পেরেছে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কেন্দ্রের সাহায্যে ও সক্রিয় সহযোগিতায়। সেজন্য তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

পাঠচক্র করার প্রসঙ্গে গীতার একটি উক্তি তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে, সেটি উল্লেখ করি,'স্বল্পমস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' , অর্থাৎ এই নিষ্কাম কর্মযোগরূপ ধর্মের স্বল্প অনুষ্ঠানও জন্মমৃত্যুরূপ মহাভয় হতে রক্ষা করে।

বর্তমানে আমাদের কাজ হল পাঠচক্রের প্রচার ও প্রসারণ। শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় করে শ্রী বিশ্বনাথ রায় যে সুদৃঢ় কর্মময় জীবনের পতাকা বহন করে গিয়েছেন প্রায় দেহান্তরের অব্যবহিত কাল পর্যন্ত তার যথার্থ উত্তরাধিকারে আমরা যেন অধিকারী হতে পারি 'মা'এর কাছে এই প্রার্থনা রাখি। তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তিনি ছিলেন যেন আমাদের কাছে আলোর স্তম্ভ। যখন তিনি হাসতেন, কথা বলতেন তখন মনে হতো তিনি আমাদের সহযাত্রী, সতীর্থ, পরম বন্ধু এবং দিশারী যাঁর হাত ধরে চলতে কোন কষ্ট হয় না।

স্মৃতির আয়নায় অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়

গোবিন্দলাল চক্রবর্তী
হাবরা

১৯৭২ সালের শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকীর উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে, ১৯৭৩ সালে তিনি শ্রীঅরবিন্দ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আশির দশকে নিজেকে বিকশিত করে তুলে ধরেছিলেন। কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের শ্রদ্ধেয় হিমাংশু কুমার নিয়োগীর স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন। ক্রমে পাঠমন্দিরের দায়িত্বভারও তাঁর উপরে এসে পড়েছিল। তিনি পাঠমন্দিরের খোল-নলচে বদল করে এক নতুন রূপ দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছিলেন।

পাঠমন্দিরের দায়িত্বভার নেওয়ার পরেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যা রাজ্যেও অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় সুবক্তা হিসেবে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রতি বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় উড়িষ্যাতে বক্তৃতা দিতে যেতেন। তাঁর বাংলা ভাষণ উড়িষ্যাতেও খুবই সমাদৃত হয়েছিল। সেখানেও তিনি বাংলাতেই বক্তব্য রাখতেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন বাংলা ভাষার সুদক্ষ অধ্যাপক। ফলে বাংলা ভাষায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন তুখোড় বক্তা, বিশেষত শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা সম্বন্ধে অদ্বিতীয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল কেন্দ্রগুলিতেই অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় তাঁর সুললিত বক্তব্য রেখেছেন এবং ভীষণ জনপ্রিয় বক্তা হয়ে উঠেছিলেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁর ভাষণ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মা ও শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে তাঁর বক্তৃতার সমতুল্য অন্য কোন বক্তা তাঁর সময়ে ছিল না, আজও নেই। তিনি একটা সুন্দর আবহ সৃষ্টি করে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ আদর্শকে তুলে ধরতেন। সকল শ্রোতা ও ভক্তরা অনুভব করতেন একটা দিব্য পরিবেশ, দিব্য অনুভূতি। বক্তৃতার মাধ্যমে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা সহজ নয়। এর জন্য চাই দিব্য অনুভূতি। সেটা তিনি লাভ করেছিলেন। তারই

বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল , পাঠমন্দিরের কিছুটা বদ্ধ পরিবেশে তিনি নিয়ে এলেন খোলা হাওয়ার পরিবেশ। বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে তিনি এক সুন্দর সহজ সম্পর্ক স্থাপন করে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারাকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি করেছেন নিষ্ঠাভরে।

পঞ্চাশের দশকে এই বাংলায় শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে যে বিশেষ আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার পুরোধা ছিলেন 'শৃণ্বন্তু' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক প্রমোদ সেন। সেটা ছিল 'নবজীবন আন্দোলন'। এই বাংলায় প্রথম শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র দেহ-চিহ্ন (Relics) এসেছিল ১৯৫৯ সালে। তার আগে দিল্লী কেন্দ্রে শ্রীমা সর্বপ্রথম Relics (পবিত্র দেহ-চিহ্ন) দিয়েছিলেন। তখন অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় শ্রীঅরবিন্দ ভাবধারায় যুক্ত ছিলেন না।

পরবর্ত্তীকালে তৎকালীন পাঠমন্দির সভাপতি শ্রদ্ধেয় হিমাংশু কুমার নিয়োগীর স্নেহচ্ছায়ায় অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের সাথে যুক্ত হয়েছেন। আরও পরে হিমাংশুদার স্থলে তিনিই পাঠমন্দিরের হাল ধরেন। তাঁর আমলেই পাঠমন্দিরের পরিবেশে আমূল পরিবর্তনের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় কেবলমাত্র সুবক্তাই ছিলেন না, তিনি একজন সুগবেষকও ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ভাবধারাকে কেবল তিনি সকলের কাছে তুলেই ধরেননি, বিশ্লেষণও করেছেন সুন্দরভাবে।

এবারে বিশ্বনাথদার সাথে আমার অন্তরঙ্গতার সামান্য দু-চার কথা বলেই এই লেখার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই। বিশ্বনাথদা বঙ্গবাসী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। একই সময়ে আমিও বঙ্গবাসীর ছাত্র ছিলাম (নৈশ বিভাগে)। তখন আমাদের পরিচয়ের সুযোগ ছিল না। একবার আমাদের এক আলোচনায় হিসেব করে দেখা গেল আমি বিশ্বনাথদার থেকে বয়সে বড়। কিন্তু আমি তাঁকে বরাবরই বিশ্বনাথদা বলে সম্বোধন করতাম। বয়েসটা জানার পরেও গৌরবার্থে আমি তাঁকে বিশ্বনাথদা বলেই আজীবন ডেকেছি।

তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা ১৮ই মার্চ। ২০২৩-এ 'শিশির মঞ্চে'র এক অনুষ্ঠানে। আমি সেখানে বিশ্বনাথদার পরেই গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে দেখেই প্রথম সারির মাঝখানে তাঁর পাশের চেয়ার থেকে ব্যাগটি তুলে নিয়ে আমাকে বসার জন্য ডাকলেন, আমিও সাড়া দিয়ে তাঁর পাশেই বসলাম। জানলাম সেদিন তাঁর শরীর ভাল ছিল না। অনুষ্ঠান শেষের অল্প আগে আমাকে বলে উঠে পড়লেন। এটাই ছিল শেষ সাক্ষাৎ।

বেশিরভাগ সময়েই বিশ্বনাথদা কোনও বিশেষ আলোচনা অথবা পরামর্শের জন্য আমাকে ফোন করতেন রাত দশটার পরে, ঐ সময়ে সাধারণত অন্য কোন ফোন বড় একটা আসত না।

আমার মনে হয় বিশ্বনাথদার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ছিল আশ্রমের অনুমতি নিয়ে পাঠমন্দিরের তিনতলার ভাড়া বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র দেহ-চিহ্ন (Relics) প্রতিষ্ঠা করা। সত্যি-ই এই মহান কর্মের কোন তুলনাই হয় না।

তাঁর সাথে ফোনে শেষবার কথা হয়েছে মৃত্যুর ক'দিন আগে। রক্ত নিয়ে আসার পরে। এর পরে শেষের দিকে তাঁর খবর জেনেছি ফোনে, ভবনের বিশ্বজিত গাঙ্গুলীর থেকে। সুব্রত সেনের সাথেও কথা হয়েছে, কারও থেকেই ভাল খবর কিছু পাইনি। তার পরে সব শেষ। তিনি চলে গেলেন ২০২৩-এর ২২ শে মে, রাত ৯-১০-এ।

Prof.Biswanath Ray—Our Biswanath da

Saswati Bhattacharya
Picnic Garden,Kolkata

It is a joy and privilege for me to speak about Prof. Biswanath Ray — a soul deeply committed to the work of the Mother and Sri Aurobindo, a true friend of seekers and a light-bearer in Bengal. For many years he has walked his path with sincerity and humility, sharing the teachings of Sri Aurobindo and the Mother in his talk, in his life, and through his writings. In Bengal, Prof. Ray has been a tireless worker. He taught in colleges (he retired from Dinabandhu Andrews College) and served as President of Sri Aurobindo Pathamandir — the first public institute outside Pondicherry dedicated to the study and practice of their teachings. In his voice, many have experienced the warmth of the message, the depth of the yoga, and the invitation to live with higher consciousness. He was also a prolific writer and researcher. Under his pen-name "Trija Roy", he has authored several Bengali books such as Bakta Sri Aurobindo, Sri Aurobindo-er Karakahini Prasange, Sri Aurobindo: Bangaparba—Kichu Katha, Kichu Asha, Sri Aurobindo O Chandernagore, Sri Aurobindo-er Pondicherry Yatra, Sri Aurobindo Pathamandir, Swagata Sri Aurobindo, and others. In 2004 he was honoured with the "Sri Aurobindo Puraskar" by the Sri Aurobindo Bhavan, Kolkata for his contribution. These writings are not just academic — they pulse with devotion. They imbibe the reader gently into the living presence of Sri Aurobindo and the Mother, and invite us to respond inwardly. Bengal has been enriched by his efforts — he has helped many younger seekers, students and devo-

tees to absorb the message in their mother-tongue, to feel at home with the teachings, and to let them reflect in life.

There are two outstanding compilations from among the voluminous works of Sri Aurobindo and The Mother namely,Hey Chiradiner and Hey Savitribani,containing and focusing all the fundamental issues which can provide the necessary guidelines to realise the life-changing Integral Yoga.

প্রয়াত অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়-এর স্মরণে

দিলীপ কুমার রায়
কলকাতা

গত কয়েকদিন ধরে ভেবেছি, প্রয়াত অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ের স্মরণে কি ধরণের লেখা লিখলে তা তাঁর প্রতি আমার পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে (শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে তিনি 'বিশ্বনাথদা' বলে পরিচিত ছিলেন)। এটা ঠিক যে, আমরা (বিশ্বনাথদা ও আমি) উক্ত বলয়ে দীর্ঘকাল কাটিয়েছি; এটাও ঠিক যে, আমরা বিভিন্ন কেন্দ্রে (যেমন হাবরায় শ্রীঅরবিন্দ কর্মী সঙ্ঘে বা কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে বা শ্রীঅরবিন্দ ভবনে), বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে, একত্রে উপস্থিত থেকেছি এবং শ্রীঅরবিন্দের উপর আলোচনা-সভায় নিজের নিজের বক্তব্য শ্রোতাদের সম্মুখে তুলে ধরেছি; আবার, এমনও হয়েছে যে কোন কেন্দ্রে আলোচনা-সভায় বিশ্বনাথদা সভাপতি, আর আমি বক্তা, - এসব ব্যাপার হতে কেউ হয়ত ভাবতে পারে যে আমাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল গভীর; কিন্তু আসলে তা নয়। আসল কথা হল, আমাদের দুজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল, তবে তা কোনদিনই গভীর বা অন্তরঙ্গ সম্পর্কে পরিণত হয়নি।

বিশ্বনাথদাকে আমি সুবক্তা-রূপে দেখেছি। যথাযথ শব্দচয়নের মাধ্যমে সাবলীলভাবে যখন তিনি কোন কিছুর উপর ভাষণ দিতেন, তখন তা আমার কাছে এক কথায় 'অপূর্ব' বলে মনে হত।

শ্রীমা- শ্রীঅরবিন্দকে একনিষ্ঠভাবে সেবা করা ছিল বিশ্বনাথদার কাছে একমাত্র ধর্ম, একমাত্র মন্ত্র, যার সাধনা তিনি তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন।

আজ তাঁর দৈহিক উপস্থিতি আমাদের মাঝে না থাকলেও, তিনি আছেন আমাদের মনে এক প্রবল প্রেরণা রূপে। তাঁর স্মরণে রইল কৃতজ্ঞতা সহ আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।

অপূরণীয়

উত্তম কুমার ভৌমিক

হে বঙ্গ-সাধক-বীর, দিশারী মহান,
পূর্ণযোগ-পথে তুমি ছিলে আগুয়ান।
পরম অগ্রজ তুমি দাদা সকলের,
কর্ম তব ঘোষিয়াছে সুনাম বঙ্গের
তব স্নেহচ্ছায়ে তুমি সকল অনুজে
আগলি রাখিতে সদা স্বীয় বক্ষমাঝে।
সঙ্গ তব আনন্দের ছিল স্রোতস্বতী,
স্পর্শে ধন্য হত যার জীবনের গতি।
মা'র কথা তব মুখে অমৃত সমান,
জুড়াইত মন-প্রাণ শুনি সে বাখান।
শ্রীঅরবিন্দের বাণী, মহাপুণ্য গাথা,
তব কণ্ঠে নিঃসৃত যেন নির্ঝর সুধা।
অনর্গল কহিতে যবে সুধী সজ্জনে,
যোগ-পথে নবদিশা মিলিত শ্রবণে।
খ্যাতি-মান-নাম-যশ দলি পদতলে,
রূপান্তর যোগ তুমি সানন্দে বরিলে।
সংসার তোমার তরে সাধন-সমর,
পেতেছিলে আসন সেথা চিরভাস্বর।
লোভ-মোহ রিপু আদি আসি তব দ্বারে
নির্বিষ ভুজঙ্গ সম পলাইত দূরে।

একনিষ্ঠ ভক্ত তুমি মায়ের সন্তান
এ নহে মুখের কথা রেখেছ প্রমাণ।
শিশু সম ধরি সদা মায়ের আঁচল
বাধাবিঘ্ন অপসারি রহিতে বিভোল।
মার কথা তব মুখে শুনিবার লাগি,
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হত তার ভাগি।
অহৈতুকী কৃপা লভি জননী শ্রীমা'র
বিপদ হয়েছে শেষে সম্পদ অপার।
সঙ্কটেরে নাহি গণি শত্রু-মহাবল,
গিরিশৃঙ্গ সম স্থির রহিতে অটল।
মা'র বরাভয় লভি জীবনের পথে
চলিয়াছ নির্ভয় আরোহী স্বর্ণরথে।
অমৃত পথিক তুমি মৃত্যুরে না ডরি,
ঠাঁই নিলে মাতৃলোকে কর্ম শেষ করি।
স্মৃতি তব উজলিছে তুমি গেছ চলে,
স্বাক্ষর অঙ্কিত তব কালের কপোলে।
দূরে কাছে রহ যেথা অথবা অজর,
তোমার কর্মের মাঝে তুমি যে অমর।
যতদিন না আসিবে নব কলেবরে,
তোমার আসন রবে শূন্য তোমা তরে।

আমার দৃষ্টিতে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়

সঞ্জীবন সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ "ধর্ম"[1] প্রবন্ধে বলেছেন ভারতবর্ষের সরলতম, বিরাটতম আদর্শের কথা, যাহা সত্য, যাহা নিত্য, যাহা ধ্রুব, যাহা চিরকালের আকর তারসঙ্গে মেলবন্ধনেই আমাদের মুক্তি

"যাহা নাই তাহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না— ছুটাছুটিই যে চরম সার্থকতা, এ কথা ভারতবর্ষের নহে। যাহা অন্তরে বাহিরে চারিদিকেই আছে যাহা অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়—কারণ, তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য।

কিছু কল্পনা করা নহে, রচনা করা নহে আহরণ করা নহে, জাগরিত হওয়া, বিকশিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া—যাহা আছে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত সরল হওয়া। যাহা সত্য তাহা সত্য বলিয়াই আমাদের নিকটতম, সত্য বলিয়াই তাহা দিবালোকের ন্যায় আমাদের সকলেরই প্রাপ্য।

.... আজ আমরা ভারতবর্ষের সেই উপদেশ ভুলিয়াছি, তাহার অকলঙ্ক সরলতম বিরাটতম একনিষ্ঠ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শতধাবিভক্ত খর্বতা-খণ্ডতার দুর্গম গহনমধ্যে মায়ামৃগীর অনুধাবন করিয়া ফিরিতেছি।"

এমন পথের দিশারি কখনও কখনও ধ্রুবতারা হয়ে পৃথিবীতে আসেন যারা তাদের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান,ভক্তি, প্রেম, জীবনান্ত নিরলস প্রয়াস দিয়ে মানুষকে সত্য, সুন্দর ও দিব্য ঊষার পথ দেখিয়ে যান; তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব প্রণম্য অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়। একজন কৃতী ছাত্র, স্বনামধন্য অধ্যাপক, আদর্শ গৃহী হয়েই কেবলমাত্র সন্তুষ্ট থাকতে চান নি তিনি, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের পথে যন্ত্রবৎ যন্ত্রীর নির্দেশিত পথে হেঁটেছেন, অন্যকে নিরলস প্রোৎসাহিত করেছেন আদর্শ সাধকের মতন। তাঁকে আমরা দেখেছি একজন সুবক্তা, সুসংগঠক, নিষ্ঠাবান্ সেবকরূপে বোধকরি, এ

বিশেষণগুলি তাঁর ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্পূর্ণ নয়, আরও গভীরে তাঁর স্থিতি।

কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের ছটায় সকলে যখন মোহগ্রস্ত; তখন অনুভূত হয় তাঁর বাক্যবিন্যাস কেবলমাত্র চিন্তনের সফল প্রকাশ নয়; হয় তা অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ অথবা উপর হতে আবাহন করে আনা অতলস্পর্শী ব্যঞ্জনা, যা গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়, নতুনভাবে গড়তে শেখায়। একটুও অত্যুক্তি নয়, কারণ আজও বহুমানুষের অন্তরে সত্যসত্যই ঝংকৃত হয় সেই বহুবছর পূর্বের চন্দননগরের সুদীর্ঘ বক্তব্য "ফেব্রুয়ারী মায়ের মাস" বা অন্যান্য স্বতোৎসারিত বক্তব্যগুলি। ফেব্রুয়ারী মাসে বিশেষতঃ শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের বহু সেন্টারে আজও নিয়মিতভাবে তা শোনার জন্য মানুষজন ব্যাকুল থাকেন । মানুষ যখন দিশাহীন, অবিন্যস্ত, একাকী বসে শোনেন তাঁর বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যগুলি। পাণ্ডিত্যের প্রকাশগৌরবের জন্য নয়, রয়েছে সেখানে শ্রীমায়ের আশীর্বাদধন্য শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের তথা দিব্যজীবনের পথে চলার সুষম প্রকাশ।

বিশ্বকবি যার জীবনের প্রেরণা, শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ যার আশ্রয়স্থল তাকে কি আটকে রাখা যায় শুধুমাত্র বাংলা কিম্বা পণ্ডিচেরীতে বিহার, উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ডের মানুষজন তাঁর পথ চেয়ে বসে থাকতেন কবে আসবে সেদিন যেদিন শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের কথা তাঁর কাছ থেকে শুনতে পাবেন তারা সামনে বসে, উপলব্ধি করবেন দিব্যজীবনের পূর্ণপ্রকাশ।

আমরাও তাঁকে পেয়েছি, গ্রহন করেছি শুধুমাত্র ভারতীয় দর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানের ভাণ্ডারিরূপে নয়, শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের প্রদর্শিত পথের নিষ্ঠাবান সেবক, সুবক্তা, সুসংগঠকরূপে যা অন্তিম নিশ্বাস পর্যন্ত ছিল তার ধ্যান, জ্ঞান ও আকুতি। এই মহৎ মানবসত্তার উদ্দেশ্যে জানাই হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।

---

১. রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, প.ব.সরকার, ১৯৯২, পৃ.৫৯২

আমার জীবনের আলোকবর্তিকা প্রফেসর বিশ্বনাথ রায়

সুপ্রিয় বিশ্বাস
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কোলকাতা

প্রফেসর বিশ্বনাথ রায়কে আমি প্রথম দেখি যখন আমার বয়স মাত্র দশ। মা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দিরে, সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেই পরিচয় মুহূর্তের মধ্যে এক অদ্ভুত বন্ধনে রূপ নেয়; তিনি শিক্ষক, তিনি পথপ্রদর্শক, তিনি আমার জীবনের দার্শনিক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে; আমার পড়াশোনা, উচ্চশিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা, বিবাহ, প্রতিষ্ঠা কিংবা যে কোনো সমস্যার সময়; তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। কোন সিদ্ধান্তে দ্বিধায় পড়লে তাঁর আশ্বাস, তাঁর শান্ত কণ্ঠস্বর, আমাকে সবসময় নতুন শক্তি দিয়েছে। আমি যখন নবম শ্রেণিতে পড়ি, তিনি আমাকে তাঁর সাইকেলে করে পুদুচেরি আশ্রমের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে দেখান। সেই দিনগুলো আজও মনে পড়লে হৃদয়ে এক অদ্ভুত উষ্ণতা অনুভব করি। পরে আমি নিলয়ে, শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে দু'দিন কাটানোর সুযোগ পাই; সেই সময়ও ছিল অসাধারণ শিক্ষণীয় ও স্মৃতিমধুর। আমরা একসঙ্গে ওড়িশা সহ বহু জায়গায় গিয়েছি; অসংখ্য পিকনিক, ভ্রমণ, আড্ডা; সবই মনে পড়লে আজও মন ভরে ওঠে। কিন্তু তাঁর অবদান শুধু স্মৃতিতে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি আমার জীবনের এমন প্রতিটি কোণে হাত রেখে গেছেন, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আজও আমি প্রতিদিন অনুভব করি; তিনি আছেন। তিনি আজও আমার সাথে দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে দেখছেন, পথ দেখাচ্ছেন। প্রফেসর বিশ্বনাথ রায় শুধু একজন মানুষ নন; তিনি আমার জীবনের এক চিরন্তন আলো, যা কখনো নিভবে না।

মনের মানুষ বিশ্বনাথদা

ডাঃ মহেন্দ্র রায়
তাহেরপুর - নদীয়া

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ের সাথে প্রথম পরিচয় হয় ১৯৭৮ সালে রানাঘাটের শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটিতে। কথায় বলে প্রথম দর্শনধারী পরে গুণবিচারী। আমার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটাই ঘটেছিল। প্রথম দর্শনেই তাঁর সাধকোচিত ভাব আর সারল্যে ভরপুর মুখমণ্ডলখানি বড়ই ভালো লেগেছিল। তারপর এমন সহজ ও সরল ভাষায় সাবলীল ভঙ্গিমায় আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করতে কোন অসুবিধাই হয়নি। সেদিনের আলোচনার একটুখানি অংশ তুলে ধরছি – "রূপান্তরের বা পূর্ণযোগের পথ অনুসরণ করতে হলে মাকে ধরতে হবে, মা-ই আমাদেরকে রূপান্তরিত করবেন দিব্য কর্মীতে। আমাদের শুধু সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এই – মা; আমি তোমাকে চাই তুমি যা চাও না আমিও তা চাই না। দৃঢ় সংকল্পে অটল থেকে শুরু হবে পথ চলা।"

তন্ময় হয়ে আলোচনা শুনতে শুনতে ভাল লাগাটা কখন যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছিল বুঝতে পারিনি, আর সেই ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায়ই অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন বিশ্বনাথদাতে। সেদিনের আলোচনা শোনার পর একটি কেন্দ্র গড়ার তাগিদ অনুভব করেছিলাম, সেইমত ১৯৮০ সালের ১৫ই আগস্ট তাহেরপুরে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি স্থাপিত হয়, যা কিনা আজ কেবল শ্রীঅরবিন্দ ভবন নামে পরিচিত। ১৯৮৫ সালের ২৪শে এপ্রিল হতে ২০১৯ সালের ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতি বৎসর তাহেরপুর শ্রীঅরবিন্দ ভবনে এসে তাঁর সহজ ও সরল ভাষায় আমাদেরকে শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রীমায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে প্রেরণা জুগিয়ে গিয়েছেন।

ভ্রাতৃস্নেহ ও ভালোবাসার বাঁধনে বেঁধে কখনও রানাঘাট কখনও বহরমপুর কখনও বা চন্দননগরে নিয়ে গিয়েছেন। এছাড়াও সেই বাঁধনেই আমার বাড়ীতেও এসেছেন এবং রাত্রিযাপনও করেছেন। এমন নির্লোভ, সহজ, সরল ও উদারচেতা মনের মানুষকে কি ভোলা যায়? চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে, শ্রদ্ধায় মাথা নত করে মনের মণিকোঠায় সযত্নে তুলে রেখেছি মনের মানুষ বিশ্বনাথদাকে।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথদা

অনিতা চ্যাটার্জী
রিষড়া,হুগলী

১৯৯৫ সালের কথা। বাঁকুড়া শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ মাননীয় শ্রী আদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সস্নেহ আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম বাঁকুড়া কেন্দ্রের শ্রীঅরবিন্দ ভবনে। সকাল থেকে নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। ভগবত কৃপায় আমারও সুযোগ হয়েছিল , জগৎজননী এবং প্রভুর চরণে সঙ্গীতাঞ্জলি নিবেদন করার। মধ্যাহ্নকালীন প্রসাদ গ্রহণের সময় শুনলাম , সান্ধ্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আসছেন শ্রীঅরবিন্দ বলয়ের একজন বিদগ্ধ বক্তা সকলের প্রিয় মানুষ , 'বিশ্বনাথদা' । প্রত্যেকেই ভীষণ খুশি। তাঁকে নিয়ে আলোচনা সবার মুখে। অবশেষে তিনি এলেন, প্রসাদ গ্রহণ করলেন, ওনার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে বিশ্রাম করলেন। আমিও ওই বহুশ্রুত মানুষটিকে দেখার জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে মঞ্চে বরণ করে নেওয়া হল যে মানুষটিকে , তাঁকে দেখেই মন-প্রাণ আনন্দে ভরে গেল, অপলক চেয়ে রইলাম। দিব্য প্রভায় মুখ তাঁর উদ্ভাসিত। মনে হল যেন – 'মা'-ময় হয়ে আছেন। শুরু হল তাঁর প্রবচন। জলদগম্ভীর কন্ঠে সুস্পষ্ট উচ্চারণে তিনি প্রথমেই স্তোত্র পাঠ করলেন – মনে হল যেন 'মা' ও 'প্রভু'কে সাদরে আহ্বান জানালেন। দীর্ঘ একঘন্টা ধরে তিনি অনলস দিব্য কথা বলে গেলেন। মনে হচ্ছিল – 'মা'-এর কথা বলার সময় কি এক অপার্থিব আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সহজ কথায়, স্পষ্ট ভাষায় তিনি নিরন্তর বলে গেলেন – 'মা' ও 'প্রভু'র কথা। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছি, ঋদ্ধ হয়েছি। বুঝলাম – এই ঋষিতুল্য মানুষটিকে দেখে আমার চক্ষুদ্বয় সার্থক হল, ওনার কন্ঠ নিঃসৃত দেববাণী শুনে আমার কর্ণদ্বয় পবিত্র হল। আবার স্তোত্র পাঠ করে বিশ্বনাথদা মঞ্চ থেকে নামলে কাছে গিয়ে

সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালাম। স্মিত হেসে তিনি প্রতিনমস্কার জানালেন।

এরপর অনেক বার বহু অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথদার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি সঙ্গীত পরিবেশন করেছি, বিশ্বনাথদা দিব্য কথা শুনিয়েছেন। প্রতিটি শ্রোতা সেই কথা শুনে তাদের দিব্য তৃষ্ণা নিবারণ করেছে। এমন করে সহজভাবে 'মা' ও 'প্রভু'র কথা নিবেদন করা বোধহয় বিশ্বনাথদার পক্ষেই সম্ভব ছিল। অনেক বক্তার মুখে ভাগবত কথা শুনেছি, কিন্তু বিশ্বনাথদার আলোচনা যেন মন-প্রাণ এক পরম শান্তিতে ভরিয়ে দিয়েছে।

একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। বাঁকুড়ায় স্বাধ্যয় শিবির উপলক্ষ্যে আমরা অনেকবার বিকালের পুরুলিয়া এক্সপ্রেসে একসঙ্গে গেছি। চার-পাঁচ ঘন্টার সেই যাত্রা যেন স্বর্গীয় আনন্দে ভরে থাকত। কত কথা, কত গান, কত স্মৃতি রোমন্থন , খুব আনন্দে সময় কেটে যেত। বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠানের পরদিন সকালে আমরা ট্রেনে হাওড়া ফিরছি। সেবার আমি একা ছিলাম, সঙ্গে ছিল একটা ছোট হালকা স্যুটকেস। সারা রাস্তা কত গল্প হল, খাওয়া-দাওয়া হল। বেলা সাড়ে এগারোটায় হাওড়া পৌঁছে, ট্রেন থেকে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি রিষড়া ফিরব, ট্রেনের টিকিট কাটব, আমি আর বিশ্বনাথদা এগোচ্ছি। হঠাৎ টিকিট কাউন্টারের কাছে এসে বিশ্বনাথদা আমার হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে বললেন – 'অনিতাদি, আপনি তো একা। আপনি টিকিট কাটুন, আমি আপনার স্যুটকেসটা ধরে দাঁড়াচ্ছি।' আমি বারবার বললাম – 'আমার কোন অসুবিধা হবে না। আপনি অতদূর যাবেন, ধীরে ধীরে রওনা হয়ে যান।' বিশ্বনাথদা কোন কথায় কান না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি টিকিট কাটার পর আমার হাতে স্যুটকেসটা দিয়ে বললেন – 'এবার আপনি যেতে পারবেন তো অনিতাদি?' আমি সম্মতি জানালাম। নীরবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ওনার যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অমন একটা মানুষ, সারা ভারতবর্ষজুড়ে যিনি সকলের প্রিয়, সব মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র, তিনি এভাবে আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন – কিছুক্ষণের জন্য আমি নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে গেলাম। হাতজোড় করে 'মা'-এর চরণে বিশ্বনাথদার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করলাম। দুচোখ আমার জলে ভরে গেল। পরিপূর্ণ একজন মানুষকে সেদিন দেখতে পেলাম।

চন্দননগর, চুঁচুড়া — এসব জায়গায় বারবার গেছি, বিশ্বনাথদার পূত সান্নিধ্য লাভ করেছি, ওনার বচনামৃত শ্রবণ করে ধন্য হয়েছি। শুধু বিশ্বনাথদা নয়, শ্রদ্ধেয়া বৌদির-ও সান্নিধ্য পেয়েছি আমি। রঘুনাথগঞ্জের শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রে আমরা একসঙ্গে গেছি, গান করেছি। সেও এক দিব্য আনন্দময় পরিবেশ।

দাদার কথা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর ঋষিপ্রতিম চেহারার সামনে আপনি মাথা শ্রদ্ধায় নীচু হয়ে আসে। একজন প্রকৃত মানুষ হিসাবে তাঁর কাছে অনেক কিছু শিক্ষনীয়। 'মা'-এর সার্থক বরপুত্র দাদা।

যেদিন সকালে দাদার চলে যাবার খবরটা পেলাম, দীর্ঘ সময় নির্বাক হয়ে বসে ছিলাম। চোখের জলে মনে পড়ছিল কত কথা। হঠাৎ মনে হল – চোখের জল ফেলা উচিৎ নয়। স্বয়ং ভগবতী জননী দাদাকে কোলে তুলে নিয়েছেন – এ তো আনন্দের কথা। সারাজীবন দাদা যে দিব্যজননীর জয়গান গেয়েছেন, যে যুগঋষির মহিমা বর্ণনা করেছেন, জীবনের শেষ মূহুর্তে তাঁরা যে দাদাকে চরণে আশ্রয় দেবেন এ তো অনস্বীকার্য।

সত্যিই, বিশ্বনাথদাকে 'মা' স্বয়ং নিজে হাতে গড়ে তুলেছিলেন। দাদার জীবন-পথের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছেন স্বয়ং জগৎজননী 'মা'। দাদা শিশুর মত নিজেকে মাতৃচরণে সমর্পন করেছেন। 'নিজের' বলে তিনি কিছু রাখেননি। তাই তো জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে স্বয়ং ভগবতী জননী তাঁর এই সন্তানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, হাত ধরে নিয়ে গেছেন সেই অমৃতলোকে। অনন্তের যাত্রা তাঁর উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়েছে - একথা ধ্রুব সত্য।

বিশ্বনাথদার মত দেবমানবের চরণে জানাই আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ প্রণাম। তিনি নিজে হাতে তৈরি করেছেন অনেককে , যারা আজ শ্রীঅরবিন্দ এবং মাতৃকথা বহু পিপাসার্ত এবং জিজ্ঞাসু মানুষের কাছে সাবলীলভাবে বলে আনন্দ দিচ্ছেন। 'মা' শ্রীঅরবিন্দের কথা বলে তাঁদের জীবনও ধন্য, আমরাও সমৃদ্ধ।

সবশেষে, শ্রীভগবানের শ্রীচরণে দাদার মহান আত্মার শান্তি কামনা করে বলি ,

"তোমার আত্মার শান্তি হোক্,
এই কামনাই করি।
তোমায় যেন গো শ্রীচরণে
ঠাঁই দেন শ্রী হরি।"

ভগবানের মানুষী যন্ত্র

অমিয় মুখার্জী
ঢাকা

বীরের অস্ত্র ও কৌশল তার বিজয় নিশ্চিত করে, শিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিভার হস্তশৈলী সুনিপুন চিত্রকর্মের প্রতিষ্ঠা দেয়, গায়কের গায়কী সুরের সমাহিত ছন্দ আর স্থূল বাদ্যযন্ত্রের অনুরণনে নৈসর্গিক সঙ্গীতের মূর্ছনা নেমে আসে। এ সব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রতিটি স্থূলকর্মের পর্দার অন্তরালে এক মহতী সূক্ষ্ম হস্তক্ষেপ অনিবার্যভাবে ক্রিয়াশীল। শক্তিধরের পেশীশক্তি বাঁচিয়ে রেখে পরিচালনার নেতৃত্ব দান করে সূক্ষ্মতর অতিপ্রাকৃত এক বলবীর্য, যার অনুপস্থিতিতে স্থূলশক্তি মূর্ছিত।

প্রসঙ্গত শিল্পী যে ছবিটি আঁকে সর্বপ্রথম তা আসে তার সূক্ষ্মবৃত্তিযুক্ত বুদ্ধিমানসে, তারপর ধ্যান, ইন্দ্রিয় মানস, প্রাণ ও সূক্ষ্ম আবেগ সহায়ে কর্মেন্দ্রিয় নির্ভর হস্তলিপিতে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং বহুবিধ সূক্ষ্ম-স্থুল ধাপ পার হয়ে স্থূল চিত্ররূপে ধরা দেয়। জগতে সব শিল্পীর সুদক্ষ চিত্রকর্মের দৃষ্টান্ত এমনই যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে থাকে। এই যে শিল্পীর ভাস্কর্য, এর পিছনেও সেই ঊর্ধ্ব থেকে অধঃচেতনার স্তর ভেদ করে সৃষ্টি প্রকাশ সমর্থ হয়েছে। পরিকল্পনা, সূক্ষ্মরূপ, মানসরূপ, আবেগময় প্রাণিক অলংকার প্রভৃতি কর্মগুলো এক-একটি উচ্চতর লোক থেকে নেমে এসে জগতে তার স্থূলরূপটি প্রকাশ করে। সকল কর্মেই এমন দৃষ্টান্ত যুগ যুগ ধরে ঘটে চলেছে।

সুতরাং দেখা যায় স্থূলের সকল প্রকার বিবর্তন ক্রিয়ায় সূক্ষ্ম তথা পরাশক্তির পরোক্ষ হস্তক্ষেপ বিদ্যমান। এই বিষয়টি যে যত বেশী উপলব্ধিতে আনতে পারবে, তার ততোধিক সূক্ষ্মবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানালোক উন্মোচিত হবে। জগতে যত অবতার, বিভূতি মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে তার প্রতি ক্ষেত্রেই ঊর্ধ্বজগতের সংশ্লিষ্টতা

অনস্বীকার্য। সকল ঘটনার অন্তরালে একটি Divine Plan বা দিব্য পরিকল্পনা থাকে, যার রেখাচিত্র ধরে অমর্ত্য থেকে মর্ত্যে শক্তিপাত ঘটে; আর ঊর্ধ্ব থেকে এই দিব্যশক্তি অবতরণেরও নির্দিষ্ট কিছু বিধিবদ্ধতা দৃষ্ট হয়। সেই শক্তিকে মর্ত্যের জন্য আহ্বান করতে হয়। কথিত আছে সাতজন ঋষি একাগ্রতাসহ একমুখী হয়ে দিব্যশক্তি অবতরণের জন্য আকুতি জানালে তাঁর অনিবার্য আবির্ভাব অসম্ভব কিছু নয়। তবে পৃথিবীর ব্যাকুল আকুতি থাকতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ তা নিশ্চিত করেছেন তাঁর সাবিত্রী গ্রন্থে-A world's desire compelled her mortal birth. (Savitri Book 1–Canto III-P. 22) 'একটা জগতের আকুতি বাধ্য করে মর্ত্যজন্ম দিব্যনারীর।' দিব্যজননী সচ্চিদানন্দের পরাপ্রকৃতি, পৌরাণিক ছন্দে যাঁকে বলতে পারি অবতারী, অজ্ঞেয়ের অরূপ হয়েও জগতের প্রয়োজনে রূপের আশ্রয় নিয়ে আবির্ভূত হলেন। পৃথিবীর প্রয়োজনে চিন্ময় সত্তার অবতরণ ঘটে মৃন্ময় তনুতে। ইনিই অনিশ্চিত অন্ধকারময় পৃথিবীতে আলোর দিশারী। শ্রীঅরবিন্দ ভগবানের এই পার্থিব বিগ্রহ ধারণের উদ্দেশ্যকে বলেছেন- God's debt; জগতের কাছে তথা মানবের কাছে ভগবানের ঋণ এবং সেই ঋণ শোধ করতে তিনি হয় নিজেই জগতে অবতীর্ণ হন, নতুবা সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর শক্তি সঞ্চার করেন-তখন সেই মানুষগুলো আপন ক্ষুদ্রতা বিদূরিত করে যেন অসীমের লীলাক্ষেত্রে হারিয়ে যায়। মানবের বহিরাবরণ যেন কর্দমাক্ত জড়পিণ্ড -তাঁর সত্তার গভীর গহনে বাস করে এক দিব্যশক্তি। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়-This bodily appearance is not all; The form deceives; the person is a mask; Hid deep in man celestial powers can dwell. (ঐ-23) 'এই যে শারীর রূপ সব, নয় সে বস্তু; রূপ হল প্রতারণা, বাহ্য ব্যক্তির মুখোশ শুধু; মানুষের গভীরে প্রচ্ছন্ন বাস করে স্বর্গের শক্তি সব।' অশ্বপতির সাধনার ফলেই দিব্যজননী মর্ত্য আধারে নেমে এলেন জগতের সমস্যা নিরসনে। তাঁর জগতে আবির্ভূত হওয়ার অনুরূপ প্রমাণ মেলে চণ্ডীতেও-পরা প্রকৃতিরূপিনী আদ্যাশক্তি মহামায়া দেবতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে জগতে অবতীর্ণ হয়ে ঘোষণা করেন-''ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাবতীযাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ । (শ্রীশ্রীচণ্ডী-১১/৫৫) যখনই ভবিষ্যতে এইরূপে দানব উত্থানে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হবে, ঠিক তখনই আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রু নিধন করবো। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ৪/৭-৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত বাণীতে ভগবানের আবির্ভাব রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু অবতারের এই আগমন শুধু কি ধর্ম সংস্থাপণ, অসুর বিনাশ আর সাধুদের রক্ষা করা—অবতারের আর কী কোনো উদ্দেশ্য নেই? শ্রীঅরবিন্দ অবতারের আবশ্যকতা নিয়ে অতীব আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বলেছেন -The Avatar is necessary when a special work is to be done and in crises of the evolution. The Avatar is a special manifesta-

tion– while for the rest of the time it is the Divine working within the ordinary human limits as a Vibhuti. (Letters on Yoga I-P. 485) 'সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় বিবর্তনের লক্ষ্যে বিশেষ কর্ম সম্পাদনের জন্যই অবতারের প্রয়োজন পড়ে। অবতার ভগবানের এক অসাধারণ প্রকাশ; আর সময়ের বাকী অংশ জুড়ে দিব্যশক্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভূতিরূপে কাজ করে চলে।'

অবতার যেন এক জীয়ন কাঠি, তাঁর স্পর্শেই মানব খাঁটি সোনায় পরিণত হয়। তাঁর নির্দেশিত পথ পরিক্রমা করে কর্মমার্গ থেকে জ্ঞানমার্গে উপনীত হয়ে দৈবীসম্পদের আহরণ দ্বারা ভগবদপ্রাপ্তি ঘটে; তা সে অবতার মানব দেহে থাকতেও পারেন, না-ও পারেন। তাঁর এই অবতরণের আবশ্যকতা বহুমুখী। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত অবিনশ্বর পরমাত্মা হয়েও অসুরদমন, সাধুরক্ষা, অধর্মনাশ, ধর্মস্থাপন এবং সর্বোপরি মানবকে ভাগবত জীবন দানের মাধ্যমে দিব্য প্রকৃতিতে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যেই আপন যোগমায়া দ্বারা মানব শরীর ধারণ করে এই পৃথিবীতে আসেন। এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মানব যদি তার মূঢ়চেতনা থেকে দিব্য চেতনায় উন্নীত হতে না পারে তবে অবতারের আসার কি বা প্রয়োজন থাকতে পারে? শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছেন "গীতার সমস্ত শিক্ষার ন্যায় অবতারবাদও গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উত্তমম্ রহস্যম্—শ্রেষ্ঠ রহস্যের অন্তর্গত। এইরূপে মানুষকে তুলিয়া ভাগবত জীবনের মধ্যে লইয়া যাইতে সাহায্য করিবার জন্যই মানব শরীরে ভগবানের অবতরণ। যদি তা না হয় তাহা হইলে শুধু ধর্ম সংস্থাপনের জন্য অবতারের কোনো প্রয়োজন নাই।" (গীতা নিবন্ধ-১৩১-১৩২)

প্রতিটি ক্ষেত্রে দিব্যপরিকল্পনার একটা নকশা (Design) প্রণীত হয় এবং সেই নকশা ধরে ধরে দিব্যশক্তি বা অবতার ও তাঁর সহচরদের আগমন ঘটে এই জগতে। অবতার এক পুরু ছদ্মবেশ ধারণ করে জগতে আবির্ভূত হন যেখানে তাঁর অন্তঃসত্তায় ভগবানের দিব্যত্ব প্রকট থাকলেও বহিঃসত্তায় সদা মানুষীধারা বজায় রাখেন-এটা তাঁর লীলার স্বার্থে। কিন্তু যে সব রসিকজনেরা তা ঈক্ষণ করতে পারে, তারা অবতারের চারপাশে ভীড় করে থাকে। বস্তুত এটাও সেই দিব্য নকশার অন্তর্গত। এমন কি তিনি মানুষী তনু ছাড়ার পরও এসব মধুমক্ষিকারূপী ভগবদ্ যন্ত্র জগতে এসে তার লীলা মাধুর্যের সহায়ক হয় এবং অমৃতময় দিব্যত্বের স্বাদ সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে এতটুকুও কার্পণ্য করে না; মূলত এই উদ্দেশ্যেই তাদেরকে পাঠান হয়। এদেরকে বলা হয় ভগবানের মানুষী যন্ত্র।

এ প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটা উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য। তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, রানী রাসমণি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে একত্রিত করে তাঁর আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি সূতায় গ্রথিত করে একটা অলঙ্কৃত পুষ্পমাল্য সাধারণ মানুষের চেতনায় পরিয়ে দিলেন-" দক্ষিণেশ্বরের মন্দির জাতিতে কৈবর্ত ধনাঢ্য রানী রাসমণি কর্তৃক

নির্মিত হয় এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের অন্যতম পূজারীরূপে সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন।..... মানবিক দৃষ্টিতে দেখিলে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির না হইলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পাইতাম না, শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকিলে স্বামী বিবেকানন্দও আসিতেন না এবং স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত পাশ্চাত্যে দেশে কোনো প্রচার কার্যও হইত না। উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগের ঠিক পূর্বে কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে এক কালীবাড়ী নির্মাণের উপরই সমগ্র ব্যাপারটি নির্ভর করিয়াছে। তাহাও আবার নিম্নজাতির এক ধনবতী নারীর ভক্তির ফল।" (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি-পৃ. ১৬)

আরও একটু বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্চারিত শক্তি দ্বারা জগতের প্রয়োজনে একটা আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল গঠিত হয়েছিল, যার অধ্যক্ষরূপে স্বামী বিবেকানন্দ মানবকে ভাগবত জীবনে প্রবেশ করার লক্ষ্যে পথ নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতে যে সকল নাম পাই তার প্রায় সকলেই গৃহাশ্রমে থাকা যুব সম্প্রদায়; যেমন মাষ্টার (শ্রীম), শশী, রাখাল প্রমুখ পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাস ব্রত নিয়ে এক-একজন দিকপাল হয়েছিলেন, যাঁদেরকে আমরা অতি সহজে ভগবানের যন্ত্র (The Divine Instrument) বলে আখ্যায়িত করতে পারি। একই উপমা আমরা টানতে পারি শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে কেন্দ্র করে এক গুচ্ছ দিব্যপুরুষের দৃশ্যমান উপস্থিতি দ্বারা। যেমন শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্ত, নীরদবরণ, প্রণব ভট্টাচার্য, চম্পকলাল, পবিত্র, দত্তা, পূরাণী, অমৃত, পূজালাল, পুরুষোত্তম প্রমুখ উদ্দীপ্ত চেতনার ঐশী আধার। তাঁরা প্রত্যেকেই অবতারকে ঘিরে এক একটা শক্তিশালী ভগবদ্ যন্ত্র ছিলেন। এতো শুধু আশ্রমের কথা বলা হলো-আশ্রমের বাইরেও বহুসংখ্যক সাধক-সাধিকা ছিলেন যাঁরা সাধনার গভীরতায় কোনো অংশে পশ্চাদপদ্ ছিলেন না। তার প্রমাণ মিলে ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী অতিমানস শক্তি পৃথিবীতে অবতরণে অমল কিরণকে দেওয়া মায়ের একটা উক্তি থেকে। শ্রীমা তাকে বলেছিলেন, মাত্র পাঁচজন এই অতিমানস অবতরণের কথা জানতে পেরেছিল-দুজন আশ্রমে আর তিনজন বাইরে। (হাসি ও আলো, ষষ্ঠ ভাষণ-পৃ. ১৪০) মায়ের ভাষ্য অনুসারে বাইরের ওই তিনজনের মধ্যে অমল কিরণও একজন। দিব্যশক্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দূরত্ব কোনো বাধা নয়।

চুম্বকের সংস্পর্শে থাকলে কাঁচা লোহাও চুম্বক হয়ে উঠে, তাঁর প্রমাণ বিজ্ঞান দিয়েছে। কিন্তু অবতারের সংস্পর্শে থাকলে মানব যে দেবত্ব প্রাপ্ত হয় তার উদাহরণও কিন্তু এ জগতে বিরল নয়। ১৯২৬ সালের ২৪ নভেম্বর শ্রীকৃষ্ণ চেতনা স্থূল আধারে নেমে আসে; শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সমগ্র সত্তায় শ্রীকৃষ্ণের মহত্তম দৈবৈশ্বর্য ধারণ করেন। এ অবস্থায় তাঁর চারিপার্শ্বে যারা ছিলেন তাদের অন্যতম শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কিয়দংশ এখানে উপস্থাপিত হলো— Absolute silence prevailed

there and the verandah was full of Spiritual Light. Automatically we got into a state of meditation........ There was absolutely no talk– no sound. Neither the Mother nor Sri Aurobindo spoke a word– the atmosphere was charged with absolute calmness and peace and bliss– perfect silence reigned throughout the function......... We felt as if we had been transported to heaven. "অসীম নীরবতায় আচ্ছাদিত ছিল সেখানে, ওই বারান্দাটি ছিল আধ্যাত্মিক আলোয় পরিপূর্ণ। আমরা আপনা হতেই ধ্যানের গভীর ভূমিতে সমাহিত হলাম।...... সেখানে একেবারেই কোনো কথা বা শব্দ ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ এবং মা-ও ছিলেন নির্বাক, পরিমণ্ডলটি অসীম নিস্তব্ধতা ও অপার শান্তি ও আনন্দে ছিল ভরপুর, সমাবেশের সর্বত্রই নিখুঁত নীরবতার আধিপত্য বিরাজ করছিল।..... এমন মনে হচ্ছিল যে আমাদেরকে স্বর্গে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

অন্তরে স্ফুরিত দিব্যশক্তির জ্যোতির্ময় শিহরণের কতটুকুই বা বাকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায়, যা প্রত্যেক সাধকের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে? এইভাবে আশ্রম সাধকগণ অবতারের জ্যোতির্বলয়ে প্রবেশ করে তারাও এই মর্ত্য কোলাহলের মধ্যে বসেই দিব্যাধারে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীর ২/৮ মন্ত্রটি বেশ উৎসাহ যোগায়। বলা হয়েছে 'অকামহ শ্রোত্রিয়স্য আনন্দ' অর্থাৎ কামনারহিত একজন ব্রহ্মজ্ঞানী এ জগতে বসেই মনুষ্য গর্ন্ধব্য চেতনা, দেবগন্ধর্ব চেতনা, ঊর্ধ্বতর পিতৃলোকানন্দ, দেবলোকানন্দ, কর্মদেবানন্দ, শাশ্বত দেবানন্দ, দেবরাজ ইন্দ্রিয়ের আনন্দ, দেবগুরু বৃহস্পতির আনন্দ, প্রজাপতিলোকের আনন্দ (Supramental) এবং সর্ব্বোপরি ব্রহ্মানন্দ পেতে পারে। এসকল স্বর্গীয় বা অতিমানসিক উপলব্ধি অবতারের চতুস্পার্শ্বের সাধকগণের নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার অংশ বিশেষ। অবতারের মুখনিঃসৃত বাণীও স্বর্গীয় (অধিমানসজাত), এমনকি শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থাবলীর প্রতিটি চরণ স্বর্গের বাক্‌সমৃদ্ধ (পশ্যন্তি বাক) চেতনায় ভরপুর। যেমন শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী মহাকাব্যের প্রতিটি চরণই যেন উচ্চতর এক দেবচেতনার বাহক। এ নিয়ে তিনি তাঁর সাবিত্রী গ্রন্থের শেষে Letters on Savitri অংশে জানাচ্ছেন 'Moreover– there have been made several successive revisions each trying to lift the general level higher and higher towards a possible Overmind poetry. As it now stands there is a general Overmind influence. (Savitri P. 729) 'তাছাড়া পরে ক্রমে বহুবার সংস্কার করা হয়েছে, প্রতিবারের প্রচেষ্টাতে সাধারণ স্তর থেকে উচ্চতর তথা অধিকতর

উচ্চ ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একটা সম্ভাব্য অধিমানস কাব্যের অভিমুখে। বর্তমান অবস্থা হল, আমার মনে হয় একটা অধিমানস প্রভাব সর্বত্র রয়েছে।' যারা এই গ্রন্থটি স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছে, তারাও অধিমানস তথা স্বর্গীয় চেতনা প্রাপ্ত হবে তাতে আবার সন্দেহ কিসের।

চেতনার বিভিন্ন স্তর ও অংশ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাধক শ্রী মুরারী মোহন ভট্টাচার্য একটা উক্তি করেছেন। "শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমেই দেখা গেছে যে, পূর্বে যার কবিতা লেখার শক্তি ছিল না যোগের পথে এসে তার মধ্যে কবিত্ব শক্তির বিকাশ হয়েছে। যে কখনও জীবনে তুলি ধরেনি এবং ছবি কি করে আঁকতে হয় তা জানেও না, সে সুদক্ষ ও যশস্বী চিত্রকরে পরিণত হয়েছে।"

আশ্রমের First Generation চলে যাওয়ার পরও কিন্তু সেই প্রসার থেমে থাকেনি; কারণ এসবের নিয়ন্ত্রণ দিব্যজননীর হাতে। তা না হলে শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের মত ক্ষণজন্মা সাধক কীভাবে সৃষ্টি হয়। তাঁর কথা একটু না বললে অতৃপ্তি থেকে যায়। শ্রীবিশ্বনাথ রায় যখন সাবিত্রী অথবা দিব্যজীবন পাঠ করতেন, তাঁর ভিতর থেকে এক বলিষ্ঠ সন্দেহাতীত আত্মপ্রত্যয় প্রকাশিত হত। মনে হতো তিনি শুধু পড়ছেন না, তাঁর অন্তঃসত্তায় সেই চেতনা ধারণ করছেন। আমার প্রতি তার একটা নির্দেশিকা ছিল-আমি কোলকাতা এলেই যেন তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখি এবং তাঁর সুবিধামত যে কোনো সময় দেখা করি। চেষ্টাও করতাম তাঁর নির্দেশ পালন করতে। তাঁর কখনও ক্লান্তি দেখিনি-একদিন আমাকে বলছেন যে, তিনি ঘরে ঘরে এখন যাওয়া শুরু করবেন। বস্তুতঃ যাঁরা সেই ভগবদ্ চেতনা ধারণ ও বহন করেন, পার্থিব ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। তার প্রবচন শুনার পর পরিচয় না দিলে কেউ বুঝতেই পারতো না যে-ইনি গৃহী না আশ্রম সন্ন্যাসী। তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে অপার আনন্দ অনুভব করতাম। তিনি সীমিত জীবন ছেড়ে মাতৃকরুণার অসীম চেতনায় প্রবেশ করেছেন-একথা ভেবেও আনন্দ পাই। তিনি দেহ ছেড়ে চলে গেলে বার বার শ্রীঅরবিন্দের সেই উক্তি মনে পড়ে দিব্যশক্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভূতিরূপে কাজ করে চলে। তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করার চেয়ে তাঁকে আন্তর মানসে কিছুক্ষণের জন্য ভাবতে যেন বেশী স্বচ্ছন্দ অনুভব করি।

অবতার পুরুষ দেহ ছেড়ে যাওয়ার সময় তাঁর দিব্যশক্তি অংশত বা পূর্ণভাবে সাধক পরিমণ্ডলে সঞ্চার করে যান; এ ধারা পরম্পরাগত চলতে থাকে। এমন দৃষ্টান্ত খুবই রহস্যজনক। অমল কিরণের ছেষট্টি বছরের জন্মদিনে মাতৃ দর্শনের সময় মা তাকে বলেছিলেন, "দেখ, তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) যখন দেহ ত্যাগ করলেন, তাঁর সমস্ত অতিমানসিক শক্তি আমাকে দিয়েছিলেন। আমার কাছে তা এসেছিল খুবই স্পষ্টভাবে।" তিনি আরো বলেন, "শক্তি তাঁর দেহ হতে আমার দেহে স্থানান্তরিত হল। আমি

অনুভব করেছিলাম যেন এক ঝলক বাতাস আমার শরীরের উপরে এবং ভিতরে বয়ে গেল।" (হাসি ও আলো-পৃ. ১৪৬) মা-ও হয়তো দেহত্যাগের সময় তার শক্তি আশ্রম পরিমণ্ডলে ও বাইরে সাধকদের মধ্যে সঞ্চারিত করে গেছেন এবং এখনও তা অব্যাহতভাবে চলছে। এই দিব্যশক্তি সাধারণ মানুষের আধারে প্রবেশ করে মানবটি হয়ে ওঠে 'ভগবানের মানুষী যন্ত্র', যাঁর সঙ্গ পেতে সাধুজনেরা সর্বদা উতলা হয়ে রয়।

আমার চোখে বিশ্বনাথদা

অপরাজিতা চক্রবর্তী
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কোলকাতা

অনেকদিন বিশ্বনাথদা সম্পর্কে আমার স্মৃতির দরজাটা বন্ধ করে রেখেছিলাম। তাঁকে ছাড়া যে ভাবতে পারতাম না, তাই সেই দরজাটা খোলাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আজ যখন তাঁর সম্পর্কে লিখতে বসলাম তখন স্মৃতির সেই দ্বার খুললাম। আমি যখন পাঠমন্দিরের Youth group – এ যোগ দিলাম, তখন পাঠমন্দিরের সভাপতি বিশ্বনাথদা। তখনও মা-শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে খুব ভালো করে জানিনা। সবে এক-দুটো ক্লাস করছি। মাঝখানে বেশ কিছু সময় যাওয়াও হয়নি ঠিকমতো পাঠমন্দিরে। হঠাৎ খবর পেলাম পাঠমন্দিরের একটা অনুষ্ঠানে কয়েকজনকে বলতে দেওয়া হবে পাঁচ মিনিট করে। তার মধ্যে আমি একজন। বিশ্বনাথদা বলেছেন, আমি যেন বলি। চমকে উঠলাম, ভাবতেই পারিনি আমাকে বিশ্বনাথদা লক্ষ্য করেছেন। তখন তাঁর সাথে অত ভালো করে পরিচয়ও ছিল না। উৎসাহ পেলাম। বলার দিন বিশ্বনাথদা উপস্থিত ছিলেন পাঠমন্দিরে। সেই থেকে শুরু। এরপর আমরা সবাই মিলে বিশ্বনাথদার সঙ্গে পাঠমন্দিরের জন্য Relics আনতে গেলাম পণ্ডিচেরীতে। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। সারা ট্রেন বিশ্বনাথদার অমৃতবাণী শুনতে শুনতে গেলাম। খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখলাম। এত বড় একজন মানুষ, অথচ একতিলও অহংকার নেই। খুব সাধারণভাবে রয়েছেন। কিন্তু অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ তাঁর কথা, অসাধারণ তাঁর বিশ্বাস। কী তীব্র বিশ্বাস মা-শ্রীঅরবিন্দের ওপর। সমস্ত পৃথিবী যদি বিপরীত দিকে থাকে, তাহলেও তাঁর কিছু যায় আসে না। Relics আনতে গিয়ে দেখলাম কি দক্ষতার সঙ্গে তিনি পুরো যাত্রাকালকে পরিচালিত করলেন। কে কোন্ কাজের জন্য যোগ্য হতে পারে, নিয়মানুবর্তিতা, সবাইকে ঠিকভাবে পরিচালনা করা আবার সেইসঙ্গে সকলের দিকে দেখা— সবকিছু তিনি সম্পন্ন করলেন সুন্দরভাবে।

তাঁর দৃপ্ত পদক্ষেপে বক্তৃতামঞ্চে এগিয়ে যাওয়া, দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গি মুহূর্তে পরিবেশকে পরিবর্তিত করে দিত। শুধু কি তাই? তাঁর উপস্থিতি চারপাশের অলস হাসি-ঠাট্টার মুহূর্তকেও সচেতন, সজাগ করে তুলত। কতবার হয়েছে, সমস্যায় পরে তাঁকে ফোন করে বলেছি তিনি ধৈর্য সহকারে ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও সময় নিয়ে সব শুনেছেন, সমাধানের পথ বলে দিয়েছেন, কিন্তু কখনও জোর করেননি। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা কখন যেন পারিবারিক সম্পর্কে পরিণত হল। তাঁর স্নেহের পরশ আমরা প্রত্যেকে পেয়েছি। এ আমাদের এক পরম প্রাপ্তি।

জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যখন বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী করব তখন তিনি শুধু যে কী করতে হবে বলে দিয়েছেন তাই নয়, কোথায় যাব, কার সঙ্গে দেখা করে কি বলব, সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত পাশে থেকেছেন, যা সত্যিই ভাবা যায় না। মা - শ্রীঅরবিন্দের ওপর তাঁর বিশ্বাস এত জীবন্ত যা দেখে অবাক হয়েছি। তাঁর সংস্পর্শে থাকতে থাকতে কখন যেন সেই বিশ্বাস নিজের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে বুঝতে পারি।

তরুণদেরকে তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পারতেন। বয়সের ব্যবধান কোন বাধাই ছিল না তাঁর কাছে। তরুণদের কাছে বিশ্বনাথদা ছিলেন অমোঘ আকর্ষণ। এত সুন্দরভাবে তরুণদের সাথে মিশতে পারা, তাদের সমস্যা বুঝতে পারার ক্ষমতা আমি খুব কম জনের মধ্যেই দেখেছি, পাঠমন্দিরে বিশ্বনাথদা এলে তাঁকে ঘিরেই আমাদের সমাগম হতো।

তাঁর 'মা' গ্রন্থের ওপর সাধনা সম্পর্কিত class খুবই সহায়ক হয়েছে আমার পক্ষে মা-শ্রীঅরবিন্দের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, মা-শ্রীঅরবিন্দ যে দূরের নন বা শুধু পূজার জন্যই নন, তাঁরা যে আমাদের খুব কাছের, তাঁদের স্মরণ করাটাই সাধনা, তাঁদের যে প্রতি মুহূর্তে মনে রাখাই সাধনার পথে চলা , এত সহজ করে তিনি বুঝিয়ে দিতেন তা বলাই বাহুল্য। 'মা'-ই বিশ্বনাথদাকে আমাদের এত কাছে আপন করে নিয়ে এসেছিলেন যাতে আমাদের পথ চলাটা সহজ হয়। এ জীবনের লক্ষ্য যে জীবনকে পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিকতা নয়, জীবনকে নিয়েই আধ্যাত্মিকতা, তা বিশ্বনাথদা বারংবার বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি মা-শ্রীঅরবিন্দ পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন। তাঁর কর্মই ছিল তাঁর সাধনা। অশক্ত শরীরে একেবারে শেষ পর্যন্ত তিনি কর্ম করে গিয়েছেন। তাঁর মর্মস্পর্শী বক্তৃতা নিমেষে ভেতরটাকে জাগিয়ে তুলত। তাঁর উপস্থিতি চারপাশকে বদলে দিত। একজন মানুষ কি ভাবে চারপাশকে বদলে ফেলতে পারে, তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ বিশ্বনাথদা। কোথাও গিয়েছি সেখানে বিশ্বনাথদা এসেছেন, সব ফেলে মনে হত তাঁর কাছে গিয়ে বসি, তাঁর মুখ থেকে মা-শ্রীঅরবিন্দের কথা শুনি। এমন আকর্ষণ ছিল তাঁর, তাঁর কাছে মা-শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন সব কিছুর আগে।

যখন তাঁর চলে যাবার খবর পেলাম আমি তখন পণ্ডিচেরীতে। সঙ্গে সঙ্গে সমাধিতে চলে আসি। চোখের জল বাঁধ মানেনি, কিন্তু মনে প্রাণে জানি বিশ্বনাথদা মায়ের চরণে পরম শান্তিতে আশ্রয় পেয়েছেন।

তাঁর সম্পর্কে যত বলি কম বলা হয়, তাই তাঁর প্রিয় রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে বলতে ইচ্ছে করে -

"শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?"

Prof. Biswanath Ray–a profile

Dr. Soumitra Basu
Pondicherry

Professor Biswanath Ray, fondly referred to as Biswanathda, the erstwhile secretary of Sri Aurobindo Pathamandir in Calcutta was a man of strong higher vital coupled with an intuitive mind-set which made him the most dynamic worker in the Aurobindonian circle. I am reminded of the day when Bachchuda (the late Pulak Banerjee), while taking chemotherapy for his cancer in a nursing home, musing on two names who would succeed him as secretary of Pathamandir in his absence. He finally zeroed on to Biswanathda telling me that he would be the fittest person who could also complete the left over Bengali translations of The Mother's works. And how right he was.

This year I had been to Cuttack in September for the Annual Conference of Sri Aurobindo Medical Association. Just before I was going to give my Keynote address, Dr. Shyama Kanungo requested me to speak not in English but Bengali. I was taken aback and she then told me that Biswanathda had spoken in Bengali for 40 years to the Orissa audience and everybody understood him. People would appreciate if I spoke in Bengali. Such was the influence of Biswanathda, even two years after his demise.

Personally I remember the simple and austere life he led. When about forty years back I had gone to Hooghly to see his centre, he came rushing in a cycle to entertain me. That simple gesture has always remained fresh in my memory. I have always seen him dressed in a simple dhoti. I still remember the day he had pulled all

shots for registering Pathamandir as a trust, the hectic lobbying, the extremely difficult arrangement to bring all the very elderly people to sign and he finally did it with calm, equipoise and in a grand style while remaining as always as simple as ever.

শ্রীঅরবিন্দ-সাধক-ভক্ত শ্রী বিশ্বনাথ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

শুভা মল্লিক
কলকাতা

শ্রীঅরবিন্দের 'মন ও চিন্তাধারার' প্রতিমূর্তি তাঁর 'মহাগ্রন্থ সাবিত্রী' র পাঠ ও আলোচনা, আমরা বিশ্বনাথদার মুখে শুনেছি। এত অপূর্ব করে পড়াতেন; একদম স্কুলের ছেলেদের পড়ানোর মত। অত্যন্ত ভালো লেগেছিল।

শ্রীঅরবিন্দ ভবনে যাতায়াতের শুরু থেকেই ওঁকে দেখেছি। প্রতিটি দিনই একই বেশে। কোথাও কোনো বাহুল্যের প্রকাশমাত্রও ছিল না। একই সাদা সাধারণ ধুতি ও সাদা পাঞ্জাবী। মুখে অমায়িক হাসি। ভাবেভঙ্গীতে সর্বদাই অতি সাধারণ ব্যক্তিত্ব কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' যিনি পড়াচ্ছেন তাঁর অন্তশ্চেতনা ও পাণ্ডিত্য - দুটিরই গভীরতার কথা চিন্তা করলে অবাক হয়ে যাই।

উনি নিজে একজন অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনার মূল মন্ত্রটি ছিল ওঁর একান্তই নিজস্ব। আজ উনি, শ্রীবিশ্বনাথ রায়, আমাদের মধ্যে স্থূল শরীরে হয়ত অনুপস্থিত, সারাটি জীবনব্যাপী ওঁর শ্রীঅরবিন্দ চর্চা ওঁকে চিরবন্দিত করে রাখবে শ্রীঅরবিন্দের সব ভক্তদের মনে।

উনি, শ্রীবিশ্বনাথ রায়, বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদের) সুবিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বৈকুন্ঠনাথ সেনের প্রতিও অত্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন সেইটিরও পরিচয় পাওয়া যায়। আমার পরম সৌভাগ্যক্রমে 'নলিনীকান্ত গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার' সভায় বারংবার শুনেছিলাম আমি বৈকুন্ঠনাথ সেনের প্রপৌত্রী বলে উনি খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। যখনই দেখা হত হাতজোড় করে নমস্কার ও মুখের নির্মল হাসিটি সব সময়েই মনে পড়ে।

শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া , ২০২০ সনের 'স্মরণিকা' পত্রিকায় ''শ্রীঅরবিন্দ ও হুগলী অধিবেশন এর সভাপতি বাবু বৈকুন্ঠনাথ সেন'' , শীর্ষক নিবন্ধের জন্য

বিশ্বনাথদা আমাকে টেলিফোন করে বলেছিলেন যে, ঐ প্রবন্ধের মধ্যেই একটি অংশ বিশেষে বৈকুণ্ঠনাথ সম্পর্কে আমি (ওঁর প্রপৌত্রী হিসাবে) যা জানি সেই কথাগুলি লিখে দিতে।

আমার এই পরম সৌভাগ্য ও সম্মান আমি তখন গ্রহণ করতে পারিনি ফলে কিছু লিখে দিতে পারিনি। উনি বলেছিলেন যে, এখন না হলেও পরে আপনি যোগাযোগ করে লেখা দিতে পারবেন।

তখন ওঁর সঙ্গে বৈকুণ্ঠনাথ সেন সম্পর্কে এবং শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলাম। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ছিলেন আমার বড়দাদুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের ২৩ নং যতীনদাস রোডের বাড়ীতে উনি (হেমেন্দ্র প্রসাদ) মাঝে মধ্যেই দাদুর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। পরিবারের সকলকেই খুব আন্তরিক ভালবাসতেন।

আমরা তখন অনেক ছোট। 'হেমেন দাদু' এলেই বাবা আমাদের ডেকে প্রণাম করতে বলতেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতেন উনি। এখন বুঝছি যে কেন বাবা প্রণাম করতে বলতেন।

শ্রীবিশ্বনাথ রায় লিখতে বলেছিলেন বলেই, ওনাকেই স্মরণ করে ক'লাইন লিখছি বৈকুণ্ঠনাথ সেন সম্পর্কে।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পুরুষ। শৈশবের দরিদ্র অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় (সব পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে) ওকালতি পাশ করেন এবং প্রসিদ্ধ আইনজীবী হয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদের বহু জনহিতকর কাজে ওঁর অতি নিঃস্বার্থ অবদান এখনও পর্যন্ত মানুষের মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার করে। কৃষ্ণনাথ কলেজ এবং আরও বহু প্রসিদ্ধ ও সাধারণ বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের উনি ছিলেন প্রাণপুরুষ। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সমস্ত কার্যাবলীর পিছনে ছিল ওঁর (বৈকুণ্ঠবাবুর) সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরামর্শ। স্বর্ণময়ীর দেহত্যাগের সময় উনিই একজন সৎ ব্যক্তিত্বরূপে মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীকে গ্রাম থেকে আনিয়ে স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারী করেছিলেন। [মণীন্দ্র চন্দ্র ছিলেন মহারাণীর ভাগিনেয়]

বৈকুণ্ঠবাবুর ছিল অসাধারণ বিদ্যোৎসাহিতা ও পরোপকারচিকীর্ষা। নিজের বাড়ীতেই স্কুল-বাড়ী ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করে ১০০ জন ছাত্রের থাকা-খাওয়া, পড়াশুনার সমস্ত ব্যবস্থা ও ব্যয়ভার বহন করতেন। বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব ঐ বাড়ীতে থেকেই কৃতী হয়েছিলেন।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথদাকে স্মরণ করে ও প্রণাম জানিয়ে ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। সকলকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

‘ও অকূলের কূল’

শ্রীজা রায়
বাঁকুড়া

২৩/০৫/২০২৩

কালকে তুমি চলে গেছ এই পার্থিব জগতের মায়া ত্যাগ করে। আশ্রয় নিয়েছ মায়ের দু-বাহুবেষ্টনে। মায়ের সন্তানদের মধ্যে অন্যতম আদর্শ একজন ‘তুমি’ ছিলে।

কাল বিয়েবাড়ির আনন্দের মাঝে জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃখের কথাটা জানার পর নিজেকে আর সামলাতে না পেরে বাড়ি চলে আসি ও শ্রাবণের বারিধারা চোখ দিয়ে ঝরে পড়তে থাকে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে করতে। এমতাবস্থায়, তোমার সেই অন্তরের ভালোবাসা ঢালা বিরাট আশ্বাসের কথা খুবই মনে পড়ছে, দাদু: “তোমার কেউ থাক্ না থাক্, জানবে তোমার একজন দাদু আছে।” তোমার মতো একজন এত বড়ো সাধককে ‘দাদু’ বলে সম্বোধন করতে পারায় নিজেকে আমি পরম সৌভাগ্যবান মনে করছি। হ্যাঁ, আমি জানি যে তুমি যেমন কালও ছিলে, আজও আছ এবং পরের দিনগুলোতেও থাকবে। তুমি সবসময় আমাদের সেই মিষ্টি হাসি হেসে আশীর্বাদ করবে স্বয়ং শ্রীমায়ের কোল থেকে।

বাবা যেমন তোমার স্নেহের পাত্র ছিলেন, ঠিক তেমনই একজন ছিলাম আমি-সেই সূত্র ধরেই তুমি আমাকে চিনতে অনেকদিন। কিন্তু সেই দিনটা থেকে তুমি আমায় গভীরভাবে ভালোবাসতে শুরু করলে। সেই দিন, আমি তখন খুবই ছোটো, বয়স হবে যথাসম্ভব ৮ কি ৯। সেই স্বর্ণালী সময় বাঁকুড়া শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির সমাধির কাছে তুমি আর আমি, আর কেউ না। তুমি জানতে যে পণ্ডিচেরিতে মায়ের স্কুলে আমার ভর্তি হবার জন্য ফর্ম ফিল-আপ করা হয়েছে। তাই তুমি আমায় জিজ্ঞেস করলে, “তুমি যে সেখানে থাকবে, তোমার একা লাগবে না?” আমার শিশুমনে কী যে বুঝে আমি বললাম, “একা কেন? মা (শ্রীমা) তো আছেন।” স্পষ্ট মনে আছে তুমি

আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে মা-কে স্মরণ করে বললে একটা ছোট্টো কথা- ‘‘মাগো দেখো।’’ সেই থেকে আমাদের সম্পর্কের বাঁধনটা আরও মজবুত হয়ে গেল। তুমি বাবাকে বলেছিলে- ‘‘শিবশঙ্কর, আমি ওর প্রতি দায়বদ্ধ।’’ আরও কত না কথা হত তোমার সঙ্গে বাবার। তুমি ছিলে বাবার সব সমস্যার সমাধানের রাস্তা। শ্রীঅরবিন্দ পরিমণ্ডল বিরাট এক ক্ষতির সম্মুখীন হল। ৩-৪ বছর লকডাউনের কারণে তোমার সঙ্গে দেখাই হয়নি। তুমি কথা দিয়েছিলে বাঁকুড়া এলে আমাদের এখানে অবশ্যই আসবে। কিন্তু, তা আর হল না। বাবার মতো আমার কাছেও তুমি ছিলে আমার Friend, Philosopher and Guide। মনে আছে দু-তিন বার বাঁকুড়ায় ও এক বার কলকাতায় তোমার সেই শ্রুতিমধুর কণ্ঠের ভাষণ শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। সত্যি, বক্তৃতা দিলে মনে হত যেন স্বয়ং মা সরস্বতী তোমার কণ্ঠ দিয়ে কথা বলে চলেছেন। অবশেষে বলব, তুমি আশীর্বাদ করো, দাদু, আমি যেন সম্পূর্ণরূপে মায়ের হয়ে উঠতে পারি ও আমার জন্য তোমার সকল স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারি।

তুমি চলে যাওয়াতে আমার হৃদয়ের বিচ্ছেদ বেদনা প্রকাশ করার কোনো ভাষা নেই। শুধু এটুকুই বলব-ভালো রেখো, মা, দাদুকে।

জয় মা।

ওঁ শ্রীঅরবিন্দ মীরা।।

[পুর্ণমুদ্রণ : শৃণ্বন্তু জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ সংখ্যা]

কর্মী বিশ্বনাথ রায় ও শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া

অজিত কুমার মল্লিক
হুগলী

বিশ্বনাথ রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় পন্ডিচেরীতে, ১৯৭৮ সালে মায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে। আশ্রমের সঙ্গীত সাধক শ্রী তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। দুজনেই গরমের ছুটিতে আশ্রমে যেতাম তখন নানা বিষয়ে কথাবার্তা হত। হুগলীতে ফিরে এসে এই জেলায় শ্রীঅরবিন্দ মায়ের কাজের নানা দিক ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতাম। তখন থেকেই বিশ্বনাথের সঙ্গে আমার সংযোগ আরও নিবিড় হয়েছিল। সুদীর্ঘ কাল ধরে তখন চুঁচুড়ায় ২টি কেন্দ্র 'দ্য নিউ রে' ও 'মাতৃসেবক' নীরবে শ্রীঅরবিন্দ মায়ের কাজ করে যাচ্ছিল। বিশ্বনাথ ঐ দুটি কেন্দ্রে নিয়মিত যাতায়াত করতেন এবং ভক্ত কর্মীদের কাছে মা শ্রীঅরবিন্দের বার্তা পৌঁছে দিতেন। সেই সময় হতে বিভিন্ন জায়গায় মা শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে বক্তৃতা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিলো। সাবলীল বক্তৃতায় কর্মীদের কাছে মা শ্রীঅরবিন্দের কথা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে বহুকর্মীকে এই পথে যুক্ত করার জন্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

সে সময় স্থানীয় ভাবে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা খুব সহজ ছিলো না। প্রথম দিকে ভক্তদের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে পাঠচক্র চলতে থাকে। পরে চুঁচুড়ার মল্লিক গলিতে ভাড়া বাড়ীতে একটি অস্থায়ী কেন্দ্র গড়ে উঠলো। সেখানেই পাঠ আলোচনা প্রভৃতি চলতে থাকে। এই অস্থায়ী কেন্দ্রে বিশ্বনাথ বেশ কয়েক বছর ধরে শ্রীঅরবিন্দের সুবিখ্যাত 'মা' গ্রন্থের ক্লাস ও আলোচনা করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে অনেককে বিশেষ করে যুবকদের এ পথে আকৃষ্ট করেন, তাঁরা আজও ভবনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ও কর্মধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

১৯৭৮ সালের এক শীতের সকালে ‘মোগলপুরা লেন’ এ তাঁর নিজস্ব বাস ভবনে আহবায়ক রূপে প্রাচীন দুই কেন্দ্রের সমস্ত ভক্তদের আহবান করে তিনি তৈরী করেন ‘শ্রীঅরবিন্দ ভবন’ প্রস্তুতি সমিতি। তাঁর স্বপ্ন ছিলো এই শহরে মা শ্রীঅরবিন্দের স্থায়ী আসন। এই লক্ষ্যে ভবন প্রস্তুতি সমিতিকে সরকারি রূপ দেওয়ার জন্য চুঁচুড়ায় শ্রী মানবেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রী হিমাংশু নিয়োগী মহাশয়ের সভাপতিত্বে গঠন করেন **শ্রীঅরবিন্দ ভবন হুগলী চুঁচুড়া ট্রাস্ট**। এই ট্রাস্টের স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থান নির্বাচন, অর্থ সংগ্রহ, জমি কেনা ও বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনার ও নির্দেশনায় তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিলো।

আজ ভবনের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জগুদাস পাড়ায় ‘শ্রীঅরবিন্দ ভবন’, মোগলপুরা লেনে তাঁর স্বীয় বাসভবনে (যেটি তিনি ভবন কে দান করেছেন) একটি শিক্ষাকেন্দ্র ও চুঁচুড়া ডাচ্ ভিলায় শ্রীঅরবিন্দের স্পর্শধন্য স্থানে ‘চরণতীর্থ’ প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর প্রচেষ্টা ও অবদানের কথা আমরা শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি।

এই প্রতিষ্ঠানকে মর্যাদার সঙ্গে ও মা শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকল ভক্ত কর্মীদের কাছে আবেদন রাখলাম। সেটিই হবে ঐ কর্মপুরুষের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সর্বোত্তম উপায়।

অনুলিখন—রজত উপাধ্যায়, হুগলী

আমার স্মৃতিতে শ্রী বিশ্বনাথ রায়

ডাঃ শৈলেন্দ্র লাহা
কোলকাতা

দিনটার কথা এখনও বেশ মনে আছে , ১৮ই মার্চ ২০২৩। শ্রীঅরবিন্দের সার্ধজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতার শিশির মঞ্চে এক শ্রদ্ধার্ঘ্যের আয়োজন করেছেন শ্রীঅরবিন্দ ভবন কর্তৃপক্ষ। মঞ্চোপরি উপবিষ্ট শ্রী বিশ্বনাথ রায়, বাংলাদেশের বগুড়া কেন্দ্রের অধিনায়ক চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডাঃ বিপুল চন্দ্র দে সহ বেশ কিছু মানুষ, যাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। ঘোষকের ভূমিকায় ও সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন শ্রী বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল বাংলার প্রায় সব কেন্দ্রের প্রতিনিধিসমেত সাধারণ ভক্তের উপস্থিতিতে। পাশেই গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় চলেছে তিনদিনব্যাপী এক চিত্র প্রদর্শনী , বিষয়: শ্রীঅরবিন্দ। বিশ্বনাথদার সঙ্গে আমার সেই শেষ সাক্ষাৎ ও দু'একটা কথাবার্তা, ডাঃ বিপুল চন্দ্র দে-র সঙ্গে সেটাই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতা। আজ তাঁরা কেউই ইহলোকে নেই, কর্ম শেষ করে লোকান্তরিত হয়েছেন। বিশ্বনাথদা যথেষ্ট প্রবীণতা অর্জন করলেও বগুড়া কেন্দ্রের বিখ্যাত চক্ষুবিশারদ ডাঃ বিপুল চন্দ্র দে অনেক কম বয়সে চলে গেছেন। তবে দু'জনের জন্যেই শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্রের এই লাইনটা মনে পড়ছে , "মাতঃ দুর্গে! যুগে যুগে মানবশরীরে অবতীর্ণ হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কার্য্য করিয়া তোমার আনন্দধামে ফিরিয়া যাই।" বিশ্বনাথদার সঙ্গে ঠিক কবে প্রথম আলাপ হয়েছিল আজ আর তা মনে নেই। তবে বেশ কয়েকবার দেখা ও কথাবার্তা হয়েছে। আমার দীর্ঘ চিঠি 'তথ্য যখন মিথ্যা বলে মিথ্যাই বলে' শিরোনামে ১৯৯৯ সালের ১০ই জুলাই 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে যখন শ্রীঅরবিন্দ ভক্তসমাজে বেশ প্রচারিত হয়েছে, তখন বিশ্বনাথদা একদিন শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির থেকে আমাকে ফোন করে অনেক সাধুবাদ জানালেন। ঐ চিঠিটা ছিল ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিতে নিবেদিত 'দেশ' পত্রিকার এক পূর্ববর্তী সংখ্যায় কিছু প্রথিতযশা ব্যক্তির রচনায়

উঠে আসা শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্কে বেশ কিছু ভ্রান্ত তথ্যের প্রতিবাদে লেখা দীর্ঘ এক পত্র, যা ঐ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছিল পত্রের ভূমিকায় 'প্রসঙ্গ' নামক প্রতিবেদনে। এমনও লিখেছিলেন তিনি, "এই চিঠি হয়ত কিছু প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করবে।" 'দেশ' পত্রিকা ছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময় (তখন তা ছিল দ্বিমাসিক) প্রভৃতিতে লেখা আমার বিভিন্ন পত্র শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কলকাতার কর্মকর্তাবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দের সঙ্গে বিশ্বনাথদাও আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন।

এরপর বিশ্বনাথদা আমাকে পাঠমন্দিরের 'বর্তিকা' পত্রিকায় লিখতে অনুরোধ করেন। সেইমত আমার প্রথম লেখা 'শ্রীঅরবিন্দ ও অনিলবরণ রায়ের গীতাভাষ্য/কিছু নতুন তথ্য' বর্তিকায় ছাপা হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮। এই রচনার একটা ইতিহাস আছে। সেটা এই রকম: শ্রী অনিলবরণ রায়ের শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যাবলম্বনে সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) বিপুল চাহিদা সত্ত্বেও বেশ কিছুকাল অমুদ্রিত থেকে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল। শ্রী অনিলবরণ রায় প্রতিষ্ঠিত 'সর্ব সেবক সঙ্ঘ' এই মূল্যবান গ্রন্থটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করার পর প্রতিষ্ঠানটির অধিকাংশ বর্ষীয়ান কর্মকর্তা প্রয়াত হওয়ায় বইটা আর নতুন করে ছাপা যাচ্ছিল না। আমি উদ্যোগ নিতে শুরু করি। এক বইমেলায় (তখন বইমেলায় নিয়মিত যেতাম) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির স্টলে গেছি, দেখি বিশ্বনাথদা বসে আছেন। তাঁকে গিয়ে ধরি এবং একটা অমূল্য তথ্য পরিবেশন করি। সম্প্রতি শ্রীঅরবিন্দ-সংক্রান্ত এক রুশ ওয়েবসাইটে আবিষ্কার করেছিলাম এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে সেই অসাধারণ তথ্যটি। তা হল, ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার বিখ্যাত 'Modern Review' পত্রিকায় বইটির সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে একটা বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তর তিনি নিজেই লিখতে বসেন তাঁর গোপন নোটবইতে, যদিও তা তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি। প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৭৮-এর এপ্রিলে, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের 'Archives and Research' পত্রিকায়, পরে শ্রীঅরবিন্দের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত তাঁর রচনাসম্ভারের ১২-তম খণ্ডে 'Essays Divine and Human' গ্রন্থে। কোন শিষ্যের রচিত বই-এর সমালোচনার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং কলম ধরেছেন , এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। বিশ্বনাথদাকে এই তথ্য সবিস্তারে জানিয়ে বললাম, "আপনি তাত্ত্বিক মানুষ। বুঝতেই পারছেন অনিলদার 'গীতা'র গুরুত্ব। এটা পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে।" তিনি সানন্দে রাজি হন এবং তারই ফলশ্রুতিতে ২০০৮-এর জানুয়ারিতে বইটির নতুন কলেবরে প্রকাশ , প্রকাশক শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা। বিশ্বনাথদা বলেছিলেন বইটির কমা,

ফুলস্টপও যেন অপরিবর্তিত থাকে; আদি সংস্করণের গাম্ভীর্য যেন পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে এই নব সংস্করণে। এরজন্য পাঠমন্দিরের কর্মীদের সঙ্গে আমিও প্রুফ সংশোধনের কাজ করেছি বইটির মুদ্রণের সময়—একাধিকবার। এই পুস্তকের নবপ্রকাশকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমার প্রাসঙ্গিক লেখা 'শ্রীঅরবিন্দ ও অনিলবরণ রায়ের গীতাভাষ্য/ কিছু নতুন তথ্য' বিশ্বনাথদার আগ্রহে বর্তিকায় ছাপা হয় শ্রীমা'র পুণ্য জন্মদিন ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ সংখ্যায়। বইটির নবতম প্রকাশকে আরও স্মরণীয় করে রাখার জন্য পাঠমন্দিরে এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। বক্তা ছিলাম আমি, ইচ্ছা সত্ত্বেও শ্রী বিশ্বনাথ রায় থাকতে পারেননি, কারণ তাঁকে বিশেষ কাজে উড়িষ্যায় যেতে হয়েছিল, তবে আমার জন্য একটা স্বাগত ভাষণ লিখে গিয়েছিলেন, যা ঐ অনুষ্ঠানে পড়া হয়েছিল। রোমন্থন করার মত আরও কিছু স্মৃতি আছে , সে প্রসঙ্গ বারান্তরের জন্য রইল।

শ্রোতা ও বক্তা: শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ রায়

তপন মণ্ডল
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কলকাতা

আমাদের সর্বজন প্রিয় বিশ্বনাথ (রায়)দার কথা বলতে গেলে, বিশ্বজিৎ (গাঙ্গুলী)দার কথা মনে আসে তিনি একবার শ্রীঅরবিন্দ ভবনে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সেন্টারদের নিয়ে সমন্বয় মিটিং ডাকেন। তাতে বিশ্বনাথদার উপস্থিতিতে শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথদা কে "সেতু পুরুষ" বলে উল্লেখ করেন। তার কারণ বিশ্বনাথদাই একমাত্র সমস্ত কেন্দ্রে অবাধ যাতায়াত করতেন, তাঁদের মা ও শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে সুচিন্তিত, সুপরামর্শ ও বক্তৃতা দিতেন। এজন্য আমাদের পশ্চিমবাংলা পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যা ও বিহারে বক্তা বিশ্বনাথদা হিসাবে আমাদের স্বর্গীয় বিশ্বনাথ রায় অত্যধিক সু -পরিচিত ছিলেন। এটি আমরা সকলেই জানি। কিন্তু 'বক্তা' বিশ্বনাথদা হবার পূর্বে 'শ্রোতা' বিশ্বনাথদার একটি ঘটনা। যেটি বিশ্বনাথদার কাছ থেকেই আমার শোনা, সেটি আমি উল্লেখ করছি। বিশ্বনাথদা, তখন দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া অঞ্চলে, দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত। সে সময় বিশ্বনাথদা, সেভাবে তাঁর বলা শুরু করেননি। যেদিন কলেজে ক্লাস থাকত না; সেদিন বিশ্বনাথদা হুগলিতে বাড়ি ফেরার পথে তাড়াতাড়ি ভবনে এসে লাইব্রেরিতে বই পড়তেন। একদিন উনি সেই ভাবে বই পড়ছেন। সেদিন কোন এক বিশেষ বক্তা (যতদূর মনে হয় পন্ডিচেরী আশ্রমের, অরিন্দম বসু)র লেকচার ছিল কলকাতা শ্রীঅরবিন্দ ভবনের দোতলায়। মানিক (মিত্র)দা, তখন ভবনের সম্পাদক, কলকাতায় কোন এক রাজনৈতিক দলের মিছিল মিটিং এর কারণে সেদিন তখনও কোন শ্রোতা ভবনে উপস্থিত হন নি । যিনি ক্লাস নেবেন তিনি ঠিক সময় উপস্থিত। এইরকম এক পরিস্থিতিতে বিশ্বনাথদা কে লাইব্রেরীতে পড়তে দেখে, মানিক দা, ওঁনাকে ডেকে উপরে নিয়ে যান শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য।

শ্রীঅরবিন্দ পথে এক অক্লান্ত পথিক — বিশ্বনাথ রায়

আশিস কুমার রুদ্র
রঘুনাথগঞ্জ

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের বিনিময়ে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে পূর্ব বাংলার ঢাকা শহরের উপকণ্ঠের বাসিন্দা পৃথ্বীনাথ রায় মহাশয় ১৯৪৬ সালে তথায় পরিবারের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি সহ জীবিকার মায়া ত্যাগ করে প্রায় সর্বহারা হয়ে স্ত্রী মনোরমা ও পুত্রকন্যাদের সকলকে নিয়ে ভারতভূমির হুগলী শহরে এসে আশ্রয় নেন। তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথ তখন সবে পাঁচ বছরের গণ্ডী পার হয়েছেন। এই শিশু বিশ্বনাথই পরবর্তী সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকরূপে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে গিয়েছেন।

কৃতী ছাত্র হিসেবে হুগলী মহসীন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তীতে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে তিনি বাংলা ভাষায় অনার্স এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে সসম্মানে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর দক্ষিণ কলকাতার রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভবনে তাঁর শিক্ষকতা জীবনের শুরু। তিনবছর পরে ১৯৬৭ সালের ১৬ই আগস্ট তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অরঙ্গাবাদ ডি. এন. কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সেখানে তিনবছর সুনামের সাথে অধ্যাপনার পরে ঐ জেলারই বেলডাঙা কলেজে একই পদে তিনি নিযুক্ত হন।

মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি কলেজে প্রায় দশ বছরের অধ্যাপনাকালে বিশ্বনাথ রায়ের ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে যায় এক বিরাট ও মহৎ পরিবর্তন। ডি. এন. কলেজে ইংরাজি ভাষার বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপকের নামও ছিল বিশ্বনাথ রায়। একই কলেজের দুই বিশ্বনাথের মধ্যে ছিল খুবই আন্তরিকতা। ইংরাজির বিশ্বনাথের সহোদর কাশীনাথ

ছিলেন জিয়াগঞ্জ ধণ্যাকুমারী কলেজের একজন অধ্যাপক। শ্রীমা- শ্রীঅরবিন্দের একান্ত ভক্ত ও অনুরাগী কাশীনাথবাবু ছিলেন একজন সুবক্তা ও প্রচারক। ১৯৭২ সালে সারাদেশে শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান মর্যাদার সাথে পালনের প্রস্তুতির জন্য প্রচারকাজে মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্যতম মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন কাশীনাথবাবু।

আমাদের আলোচ্য বিশ্বনাথ রায় তখন ছিলেন কিছুটা বামপন্থী ভাবাপন্ন আদর্শবাদী রবীন্দ্রানুরাগী একজন অধ্যাপক। তাঁর লেখা সাহিত্য ও সমাজ-সচেতনতামূলক কিছু প্রবন্ধ তখন সাময়িক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। সর্বহারা মানুষের অধিকারলাভের সংগ্রামের পটভূমিকায় তাঁর লেখা একটি নাটক ‘অধিকার’ সেই সময়ে গণনাট্য সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয় যেটি পরে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করে। চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মের তিনি খুবই অনুরাগী ছিলেন। তাঁর এই অনুরাগের মাত্রা সম্বন্ধে পারিবারিক সূত্রে জানা যায় যে সত্যজিৎবাবুর প্রতিটি ছবি মুক্তির প্রথম দিনের প্রথম শো দেখা এই নবীন অধ্যাপকের অবশ্য কর্তব্য ছিল।

অধ্যাপক কাশীনাথ রায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারার সাথে আদর্শবাদী বিশ্বনাথবাবুর প্রথম পরিচয় হয়। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমা- শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারা সদ্য ৩০ বছরে পা দেওয়া নবীন অধ্যাপককে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে। পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শ্রীমা তখন দেহে আছেন। জগদ্বাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর একটি আন্তরিক আহ্বান “পৃথিবী এক বিপুল পরিবর্তনের জন্য তৈরি, তুমি কি তাতে সহায়তা করবে?” বিশ্বনাথবাবুর মনোজগতে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই আহ্বানে তাঁর জীবনের গতিপথ গেল বদলে।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই উভয়ের প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, তাঁরা ছিলেন একই লক্ষ্যের যাত্রী, কিন্তু ভিন্ন পথের পথিক। ছাত্রাবস্থায় ও অধ্যাপনাকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বনাথবাবুর প্রেরণার উৎস স্বরূপ। বিধির লিখনে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধের সিঁড়ি বেয়েই তিনি প্রবেশ করলেন শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক প্রাঙ্গণে। একজন ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু, অন্যজন হলেন তাঁর দীক্ষাগুরু, আদর্শগত ভাবে।

“মা-ই গন্তব্যস্থান, তাঁর মধ্যে সবই আছে, তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁর চেতনার মধ্যে বাস করলে আর সব আপনিই ফুটে যায়”— শ্রীঅরবিন্দের এই সরল পথনির্দেশিকা বিশ্বনাথবাবুর জীবনের গতিপথ ঠিক করে দিল। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলী নিবিড়ভাবে পাঠের সাথে সাথে কলেজের কিছু ছাত্রছাত্রী ও প্রতিবেশীদের আহ্বান করে বেলডাঙা শহরে তাঁর বাসাবাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ চর্চার জন্য শুরু করলেন একটি পাঠচক্র। ক্রমে জেলা সদর বহরমপুরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে আমন্ত্রণ পেয়ে বিশেষ বিশেষ দিনে উপস্থিত থাকতেন এবং অনুরুদ্ধ হয়ে সেখানে

উপস্থিত শ্রীঅরবিন্দ-অনুরাগীদের সামনে সুললিত ভাষায় তাঁর ভাষণ দেওয়া শুরু হল। ক্রমরূপান্তরিত সত্তার কাজের পরিধি ক্রমশঃ প্রসারিত হতে থাকল। কলেজের ছুটির দিনগুলোয় হুগলীতে নিজবাড়িতে থাকাকালীন হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর শহরে অল্পবিস্তর শ্রীঅরবিন্দচর্চায় যাঁরা যুক্ত ছিলেন , ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি তাঁদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। আগ্রহী জনেদের সংখ্যার দিকে না তাকিয়ে একাধিক পাঠচক্র গঠন করে নিয়মিতভাবে সেখানে ক্লাস নেওয়া শুরু করলেন। অচিরেই এভাবে এলাকায় শ্রীঅরবিন্দ চর্চা দানা বেঁধে উঠল। এর সফল পরিণতিস্বরূপ বেশ কিছু নিষ্ঠাবান সক্রিয় শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী সংগঠিত হলেন। পাঠচক্র থেকে ক্রমশঃ গড়ে উঠতে থাকল শহরে শহরে শ্রীঅরবিন্দ চর্চার স্থায়ী কেন্দ্র। তাঁর সহজ সরল জীবনযাত্রা, সকলকে একসাথে অনুপ্রাণিত করে নিয়ে চলার এক দেবদত্ত ক্ষমতা, আন্তরিক ব্যবহার, পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য সকলের মধ্যে এক অনলস আস্পৃহা জাগিয়ে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা এই পূর্ণতা লাভের পথে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়েছিল।

ফুলের সুগন্ধ , ধূপের সৌরভ যেমন ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশঃ উর্ধ্বগামী হয়, অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বনাথ রায়ের সৌরভও সেইরূপ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। বেলডাঙা থেকে চুঁচুড়া আসা যাওয়ার মাঝখানে উষাগ্রাম, তাহেরপুর, কালীনারায়ণপুর, রানাঘাট প্রভৃতি স্থানের শ্রীঅরবিন্দচর্চা কেন্দ্রগুলিতে তাঁর যাতায়াত শুরু হল। শুরু হল সেইসব কেন্দ্রে সপ্তাহান্তে নিয়মিত ক্লাস নেওয়া। সহজ সরল ভাষায় আন্তরিকভাবে দীপ্ত কণ্ঠে শ্রীমা- শ্রীঅরবিন্দের উপর তাঁর আকর্ষণীয় ভাষণ শুনে বহু মানুষ উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হতে থাকলেন। উত্তরপাড়ায় শ্রীঅরবিন্দ পরিষদ গঠিত হল। শুরুর দিনগুলো থেকেই বিশ্বনাথবাবুর সেখানে যাতায়াত। সুবক্তা হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ল। নগর কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, শ্রীঅরবিন্দ ভবন, লক্ষ্মী হাউস, নিউ আলিপুর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দিতে তিনি আমন্ত্রিত হলেন, এইসব কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে তাঁর ক্লাস নেওয়া শুরু হল।

১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীমতি প্রণতি দেবীর সাথে পরিণয়সূত্রে তিনি আবদ্ধ হলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দ ভবন, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন কর্মকর্তাগণ যথা মানিক মিত্র, হিমাংশু নিয়োগী, সত্যকুমার বসু প্রমুখজনেরা তাঁর অসাধারণ সংগঠন শক্তির পরিচয় পেয়ে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করেন। পরবর্তীতে ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ল।

“ শ্রীঅরবিন্দ মানুষের জন্য এক মহত্তর উষার স্বপ্ন দেখেছিলেন। পার্থিব জীবন দেবের জীবনে রূপান্তরিত হবে , সে উদ্দেশ্যেই তিনি উৎসর্গ করেছিলেন নিজেকে”—

শ্রীমায়ের এই বাণীকে তাঁর চলার পথের মন্ত্র ও প্রেরণা হিসেবে বরণ করে নিয়ে বিশ্বনাথ রায় এরপরে দিব্য কাজে মায়ের যন্ত্র হিসেবে নিয়োজিত হলেন। শহর কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে বাংলার জেলায় জেলায় নতুন ও পুরোনো কেন্দ্রগুলিতে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হতে থাকলেন অক্লান্তভাবে। তাঁর তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর, জাদুকরী শব্দচয়ন ও অপূর্ব বাচনভঙ্গী সমৃদ্ধ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ সর্বশ্রেণীর শ্রোতাদের অন্তরে গভীর প্রেরণা সঞ্চার করল।

১৯৭৮ সালে তাঁর শিশুকন্যা পরমা পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে স্ত্রী ও কন্যা পণ্ডিচেরীবাসিনী হলেন। এর কিছুদিন পরে তিনি বেলডাঙা কলেজ থেকে কলকাতার দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে বদলী হয়ে এলেন। ফলে প্রায় সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে তাঁর কাজের পরিধি সম্প্রসারিত হল। গ্রীষ্মকালীন ও দুর্গাপূজায় কলেজের দীর্ঘকালীন ছুটির দিনগুলি তিনি পণ্ডিচেরীবাসী হতেন। এখানে এসে একে একে আশ্রমের প্রবীণ ও নবীন আশ্রমিকদের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠল। আশ্রমের লাইব্রেরী, আর্কাইভ, প্রেস, রিডিংরুমে তিনি সময় দিতে শুরু করেন। তাঁর নিরলস প্রয়াসের ফলস্বরূপ তাঁর জীবনের দুই গুরু শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিষয়ক বেশ কিছু নতুন তথ্য তাঁর হাতে এল। একাধারে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের স্নেহধন্যা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভাগ্নী আশ্রমবাসিনী সাহানাদেবী তাঁর স্নেহের বিশ্বনাথকে এই বিষয়ে খুবই উৎসাহিত করেছিলেন। নীরদদা, দ্যুমান্‌ভাই সহ অনেক প্রবীণ আশ্রমিকের উদ্যোগে আশ্রম স্কুলের হল অফ হার্মনিতে তাঁর গবেষণালব্ধ নতুন তথ্য সমৃদ্ধ বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হতে লাগলেন। সেইসব সভায় তাঁর সুললিত কণ্ঠে তেজোদীপ্ত ভাষায় নবলব্ধ তথ্য সমৃদ্ধ ভাষণ শুনতে নবীন-প্রবীণ আশ্রমিকগণ সহ ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে প্রশস্ত হলঘর উপচে পড়ত।

সেই সময়ে ব্যালকনি স্ট্রিটে একটি বাড়িতে বিশিষ্ট সাধক ও শ্রীমা- শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ধন্য একনিষ্ঠ ভক্ত-শিষ্য বাবাজি মহারাজ অবস্থান করতেন। পণ্ডিচেরীতে থাকাকালীন বিশ্বনাথবাবু প্রতি রবিবার বাবাজি মহারাজের বাড়িতে একটি পাঠচক্রে মূল বক্তা হিসেবে যোগ দিতেন। সেখানে যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন উড়িষ্যাবাসী শ্রীমা- শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী। বাংলা ভাষায় 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের ওপর নেওয়া ক্লাসে তাঁরা নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন। এছাড়াও 'নবজ্যোতি' কার্যালয়ের ধ্যানগৃহেও তিনি মাঝে মাঝে আমন্ত্রণী ভাষণ দিতেন।

বাবাজি মহারাজের অনলস প্রয়াসে সেই সময়ে ওড়িশার গ্রামে গঞ্জে একের পর এক শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্রগুলি সুগঠিত হলে সেখানে একে একে যথোচিত মর্যাদার সাথে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহাংশ (Relics) স্থাপন শুরু

হয়। এতে অনুপ্রাণিত বিশ্বনাথ রায়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রগুলিতে শুরু হল প্রভুর দিব্য দেহাংশ আনার জন্য আলোচনা ও প্রস্তুতি। নিজের উদ্যোগের কথা তিনি এভাবে লিখে গিয়েছেন , "..... চাকরির দায়িত্বটুকু ছাড়া বাকিটা সরাসরি মায়ের ভাঁড়ারের দিকে রওনা হল। জেগে থাকার সময়ে রেলিক্সের কাজ আর ঘুমালেও তারই স্বপ্ন।" সামর্থের ঘাটতি থাকলেও শ্রীঅরবিন্দের একটি বাণী , "যদি তোমার লক্ষ্য হয় সুমহান আর সঙ্গতি সামান্য, তাহলেও কাজ করে চলো, কেননা কেবলমাত্র কাজের মধ্যে দিয়েই তোমার সঙ্গতি বেড়ে উঠতে পারে"— হয়ে উঠল তাঁদের এগিয়ে চলার পথের প্রেরণা। একে একে মালা, হুগলী-চুঁচুড়া, হাওড়া, আন্দুল, ঊষাগ্রাম, চন্দননগর, উত্তরপাড়া, মালদহ, বহরমপুর, শিলিগুড়ি, ব্যারাকপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, আকুনী, লক্ষ্মী হাউস, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির প্রভৃতি কেন্দ্রগুলিতে যথোচিত মর্যাদার সাথে স্থাপিত হল শ্রীঅরবিন্দের দিব্য দেহাংশ (রেলিক্স)– আশ্রম সম্পাদক নলিনীদার ভাষায়, "পৃথিবীর ওপর শাশ্বতের পদক্ষেপের জন্য স্থান এক।" সর্বত্রই মহা উৎসবের আয়োজন হল শ্রীঅরবিন্দের সজীব সত্তার আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলিতে। বিশ্বনাথবাবুর কথায়, ''সে দিনগুলো ছিল দিব্যস্পর্শ-স্নাত।" হুগলী কেন্দ্রে রেলিক্স আসার বিবরণ লিখতে গিয়ে তিনি আরও লিখলেন "... আর এতো স্বয়ং প্রভুর আগমন! .... নীরব ধ্বনি গুঞ্জরিত প্রতি বক্ষে 'চলো পণ্ডিচেরী'- 'স্বাগত শ্রীঅরবিন্দ'। ... সারা আশ্রমে সাড়া পড়ে গেল, শ্রীঅরবিন্দের দেহাবশেষ নিতে বাংলা থেকে অনেক লোক এসেছে। এমনটা হয় না। এমনকি দ্যুমন্‌ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, আশিজন লোক এসেছে! ..... সেদিন রাতে আশ্রম স্কুল কোর্ট ইয়ার্ডে বক্তৃতা হল। বিষয়, 'শ্রীঅরবিন্দ ও হুগলী'। জীবনের বোধহয় সেরা আবহাওয়ায় বক্তৃতা। উন্মুক্ত মঞ্চে, শ্রীঅরবিন্দের সোফায় আসীন ছবির ঊর্ধ্বদেশ আলোকিত। সামনে উঠোন ভর্তি শ্রোতারা প্রভুর জীবনের সেই সময়গুলির কথা শুনে চললেন।" এটি ছিল পণ্ডিচেরীতে সেরা পরিবেশে বিশ্বনাথবাবুর সেরা ভাষণ। সেদিন যেন মহাসরস্বতীরূপে দিব্য জননী বিশ্বনাথবাবুর কণ্ঠে এসে ভর করেছিলেন। প্রতিটি কেন্দ্রেই রেলিক্স আনার সময়ে একই ছবি ফুটে উঠেছিল। বাংলার প্রবীণ শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগীদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় হিমাংশুদা, সত্যদা, জয়াদি, গোবিন্দদা, সুধীরদা, সুপ্রিয়দা, অজিতদা, পুলকদা, সৌমিত্রদা, আদিনাথদা, ঊষাদি, উমাদি, অনিমাদি, বিশ্বজিৎদা, দীপকদা, দিলীপদা, শ্যামলদা, আভাসদা সহ আরও কত নাম এসে যায় যাঁরা এইসব রেলিক্স সংস্থাপন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও রূপায়নের কাজে অক্লান্তভাবে যুক্ত ছিলেন। ক্যানিং থেকে শিলিগুড়ি , পুরুলিয়া থেকে হাবরা , কতশত নবীন ভক্ত যুবক সেইসব দিনে প্রবীণদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন। বিশ্বনাথবাবুর লেখায় এভাবে তা ফুটে উঠেছে , "আমরা তখন আমরা ছিলাম না,

অন্য কিছু হয়ে উঠেছিলাম।” পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা এইসব রেলিক্স-প্রদান অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলেছিল তাঁদের নামের তালিকাটাও ছিল দীর্ঘ—নীরদদা, মনাদা, মনোজদা, রঞ্জুদা, সাহানাদি, ছোটেনারায়ণ শর্মা, কিশোরীলালজী, বিজয়ভাই, প্যারীচাঁদজী, মোহনলাল বাজপেয়ী, বংশীধরজী, গজরাজদা, ডা. অরুণ ঘোষ, সুদর্শনাদি, সলিলাদি, বিশ্বজিৎ তালুকদার, উৎপলদা সহ আরও কতজন। বিশ্বনাথবাবুর আন্তরিকতা, সকলকে একসূত্রে বেঁধে কাজে নামার মানসিকতা, কল্পনাশক্তি ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্লান্তিহীন প্রয়াস সর্বোপরি দিব্য জননীর দিব্য সহায়তা লাভ করে সব বাধা অতিক্রম করে বাংলার বুকে দিকে দিকে শাশ্বতের অপার্থিব অধিষ্ঠান পর্ব সুসম্পন্ন হল। সাবিত্রী মহাকাব্যে প্রভুর মন্ত্র , “All can be done if the god-touch is there” , পরমের স্পর্শে সকলই যেন সফল হল। শ্রীমা- শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তিনি যেন নিত্য গাইতেন এই গানের কলি,

“প্রভু, আমি তোমার ফুল বাগানের মালি, গাছে গাছে ফুল ফুটিয়ে যাই।”

তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, ‘মানব তার প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করে মানবতার আন্তর সত্যকে আবিষ্কার করে দিব্যজীবন লাভের পথে এগিয়ে যেতে পারে। মানুষ চাইবে আর ভগবান এগিয়ে আসবেন, দিব্যজীবন লাভের জন্য কাউকে স্বর্গ বা অন্য কোথাও যেতে হবে না, মর্ত্যভূমিতেই নেমে আসবে ভগবানের প্রকাশ।’

শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের উপর নিবিড় অধ্যয়ন, গভীর গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও আন্তর উপলব্ধির ফসল নিয়ে এরপরে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় একে একে প্রায় কুড়িটি বই তিনি রচনা করে গিয়েছেন ‘ত্রিজ রায়’ নামের আড়ালে। ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হিসেবে যথাসময়ে তাঁর উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। উপনয়ন অনুষ্ঠানে উপবীতধারণকে সাধারণভাবে ‘দ্বিজত্ব’ লাভ বলে। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের করুণার আলোয় আলোকিত হয়ে তাঁর জীবনের ধারা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। শ্রীমা বলেছেন , “A change of consciousness is equivalent to a new birth— a birth into a higher sphere of existence.” চেতনার স্তরে এই নব উত্তরণে এক নবজীবনের অধিকারী হয়ে তাঁর দ্বিজত্ব থেকে ত্রিজত্বে উত্তরণ হল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি থেকে প্রকাশিত সাময়িক ও বাৎসরিক স্মারক গ্রন্থগুলিতে তাঁর লেখা শতাধিক গবেষণালব্ধ তথ্যসমৃদ্ধ শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ক আধ্যাত্মিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বনাথবাবুর সুযোগ্য নেতৃত্বে শ্রীমায়ের প্রতিষ্ঠিত ‘শ্রীঅরবিন্দ কর্মধারা’ নামের প্রতিষ্ঠানটি বাংলায় কাজ শুরু করে। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রগুলি ও শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগীদের

মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজে সচেষ্ট হয়। "For all problems of existence are essentially problems of harmony"- শ্রীঅরবিন্দের এই আপ্তবাক্যটি সকলের চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত করাই ছিল তাঁর ব্রত।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ের বহুধা বিস্তৃত জীবনের কথা লিখে শেষ হওয়ার নয়। তবু তো কোথাও থামতে হবে। তাই সংক্ষেপে তাঁর জীবনের আরও কিছু জলছবি তুলে ধরলাম।

১৯৮৬ সালে ওড়িশার রাজগাঙপুর শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রে তিনি ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পান। ওড়িশার কোন কেন্দ্র থেকে সেটাই প্রথম তাঁকে আমন্ত্রণ। এরপরে দীর্ঘ ৩৭-৩৮ বছরে নিয়মিতভাবে ওড়িশা রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে তিনি প্রায় একশত বার আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে গিয়েছিলেন। সেখানে বাংলা ভাষায় দেওয়া তাঁর ভাষণে বক্তব্যের গভীরতা ও আন্তরিকতা ভাষার দূরত্বকে মুছে দিয়ে ওড়িয়াভাষীদের মুগ্ধ করেছিল। যে রাজগাঙপুর শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র থেকে তাঁর ওড়িশা বিজয়পর্ব শুরু হয়েছিল দীর্ঘ পথচলার পরে সেই রাজগাঙপুর কেন্দ্রেই তাঁর ওড়িশা অভিযান শেষ হয় ২০২৩ সালের ১৮ই এপ্রিল।

বঙ্গপর্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অংশে শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি ব্যবহৃত চেয়ারের কথা জানা যায়। প্রথম চেয়ারটি ছিল জাতীয় মহাবিদ্যালয় থেকে পদত্যাগের সময় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তাঁর শেষ ভাষণদানের সময়ে যে চেয়ারটিতে তিনি বসেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের সহকর্মীদের সাথে নিয়ে 'বসুমতী মন্দির'-এর মূল অফিসঘরে সমারোহের সাথে তার স্থায়ী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয়টি চুঁচুড়া শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিতে এসে শ্রীঅরবিন্দ যে গৃহে (ডাচভিলা) অবস্থান করেছিলেন সেই গৃহে ব্যবহৃত চেয়ারটি উদ্ধার করে হুগলী-চুঁচুড়া কেন্দ্রে তা মর্যাদার সাথে সংরক্ষণ করেছিলেন। এছাড়া উত্তরপাড়ায় বিখ্যাত অভিভাষণ দিতে আসার সময়ে সভা শুরুর আগে যে বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেই সময়ে তাঁর ব্যবহৃত চেয়ারটি। যে চেয়ারগুলি এতদিন অবহেলিত, অন্ধকার গুদামঘরে পড়ে ছিল , ধুলো-নীরবতা ও বিস্মৃতির অতল থেকে সেগুলিকে উদ্ধার করে যথামর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা তিনি পালন করেছিলেন। তাঁর কাছে ঐ চেয়ারগুলি তো নিছক চেয়ার ছিল না, ঐ চেয়ারগুলিতে বসেই শ্রীঅরবিন্দ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে , দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আত্মশক্তির জাগরণের, জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইতিহাসের এই স্পন্দন অনুভব করেছিলেন বিশ্বনাথ রায়।

'করোনা' মহামারীর সময়ে সারা বিশ্বময় এক মহাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত পৃথিবী প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল। ইতিহাসের এই ক্রান্তিকালে 'শ্রীঅরবিন্দ কর্মধারা' প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার ৫০তম বর্ষ এল ২০২০ সালে। পশ্চিমবঙ্গে এই সংগঠনটির

তিনি প্রধান অভিভাবক ছিলেন। হুগলীর নিজ বসতবাটিটি বহু আগে শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষাকেন্দ্র গঠনকল্পে দান করে দিয়ে তিনি তখন বেহালার ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতেন। সেখান থেকে ফোনে নির্দেশ দিলেন বেশ কিছু কর্মীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য। যোগাযোগ সম্ভব হলে নির্দিষ্ট দিনে উত্তরপাড়া কেন্দ্রের সহায়তায় এক অনলাইন মিটিং-এর মাধ্যমে তিনি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী কর্মীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে ঐ সংকটকালে পথচলার দিশা জানিয়ে এক স্মরণীয় ভাষণ দিলেন। প্রভুর কৃপায় এভাবেই 'সঙ্কট সুযোগে পরিণত হল, ব্যর্থতা সার্থকতায়, দুর্বলতা অমোঘ সামর্থ্যে পরিবর্ত্তিত হল।' তারপরে নিয়মিতভাবে অনলাইন মিটিং-এর মাধ্যমে তিনি যে ক্লাস নেওয়া শুরু করলেন , জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। ২০২৩ সালের ১৬ই এপ্রিল তাঁর জীবনকালের শেষ জন্মদিনে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের নির্দিষ্ট অংশ তিনি পাঠ করলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বোঝা গেল তার ব্যাখ্যা তিনি এড়িয়ে গেলেন। পাঠশেষে জানা গেল পরদিন তিনি ওড়িশার রাজগাঙপুর শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রে ভাষণ দিতে রওনা হবেন। "এবারে না গেলেই নয়?" বিরত করার চেষ্টায় এই প্রশ্নের উত্তরে অল্প কথায় জানালেন , "জানুয়ারি মাসে ওদের কথা দেওয়া আছে।" বোঝা গেল সত্যপালনের জন্য তিনি যাবেনই। "ক'দিনের জন্য?" প্রশ্নের উত্তরে বাম হাতের তর্জনী তুলে দেখালেন অর্থাৎ একদিনের জন্য। সেই ওড়িশা যাত্রার একমাসের মধ্যেই তাঁর জীবনতরীর শেষ যাত্রার দিনটা এগিয়ে আসবে সে ভাবনা তখন না হলেও একটা অজানা আশঙ্কার কালো মেঘ এসে দেখা দিল। ওড়িশা থেকে ফিরে এসে বললেন "একবার পণ্ডিচেরী যেতে চাই , টিকিট কাটো।" ৪ঠা জুনের টিকিট পাওয়া গেল। এবারে চিকিৎসকের নির্দেশে শরীরে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে জানা গেল এক কালান্তক রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। "শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন আপনি" , এই স্তোকবাক্য শুনে উত্তর দিলেন , "জানো- আমার কি রোগ হয়েছে?" মুহূর্তের স্তব্ধতা ভেঙে আবার বলে উঠলেন , "লিউকোমিয়া , ব্লাড ক্যানসার।" মৃত্যুর প্রথম পদধ্বনি বুঝি তিনি শুনতে পেয়েছেন। বিহঙ্গের যাওয়ার সময় বুঝি এল। কবিগুরুর লেখা কবিতার লাইন দুটো কি তাঁর মনে পড়ে গেল ঃ "ধূসর গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন/মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত।"

শরীরে রোগের লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে উন্মুক্ত জানলা দিয়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে মায়ের চেতনায় অবগাহন করে উদাস মনে প্রিয় সাহানাদির লেখা কবিতার লাইনগুলো হয়ত বা তিনি গুনগুন করে গাইলেন,

"জীবন তব চরণে বাঁধি
করগো চির চলার সাথি

তরণী মম আপন হাতে
আপন পানে ভাসাও।”

কখনও বা তিনি কবিগুরুর গানের কলি প্রায় অনুসরণ করে মৃত্যুকে যেন আহ্বান করলেন,

ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়ন প্রান্তে
এসো বরবেশে,
আমার পরাণ বন্ধু ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালবেসে
ধরিও আমার বাহু নিয়ে যেও‘তাঁর’ পাশে।।

স্বল্প রোগভোগের পর ২০২৩-এর ২২শে মে সন্ধ্যাকালে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় তাঁর অগণিত স্নেহের জনকে দুঃখ সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে অস্ফুট স্বরে যেন বলে গেলেন, “পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহ ভাই।”

যাত্রা করলেন শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের অমৃতলোকে—

“যেথা নাই নাম, যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশ্বের পরিচয়,
নাই আর আছে, এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে।”

তবু সাবিত্রী মহাকাব্যে প্রভুর দেওয়া সেই আশ্বাস বাণীটুকু আজ আমাদের ভরসা,

“চলে গিয়েছে সে কালের সীমা পার হয়ে অনন্তের মধ্যে,
আকাশের পরিধি পরিহার করে হয়ে উঠেছে এখন অসীম;
সত্তা তার উত্তীর্ণ হয়েছে দুরারোহ শিখরে সব
তবু শেষ হয় নাই যাত্রা তার আপনার আত্মার মধ্যে।”
(পর্ব ৭ সর্গ ৭ পৃ: ৬৮০)

(তথ্য সমূহ পারিবারিক সূত্র ও ব্যক্তিগত আলাপচারিতা বিভিন্ন কেন্দ্রের ও পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগীগণ সূত্রে সংগৃহীত)

চিত্ররূপময়

বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কোলকাতা

কোনো মানুষের চলে যাবার পর তাঁর স্মৃতিচারণার জন্যে যখনই কলম ধরি কবিরা সবাই যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়ান। যাঁদের সর্বাগ্রে পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ। জীবনানন্দের একটি কবিতাও অবশ্য আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়, যে কবিতায় রবীন্দ্রনাথও জড়িয়ে আছেন। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় জীবনানন্দের 'মৃতুর আগে' কবিতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ছিল 'চিত্ররূপময়'। আমার স্মৃতিচারণার নামকরণে আমি তাই রবিঠাকুরের কাছে ঋণী রইলাম। কিন্তু কী ছিল সেই কবিতায়? যা ছিল তা হল মৃত্যু ভাবনায় রবীন্দ্রনাথকে ছায়ার মতো অনুসরণ না করে মৃত্যুর নতুন একটি বন্দনা মন্ত্রের সৃষ্টিসুখে ডুব দেওয়া। এই কবিতা পড়তে পড়তে বিশ্বনাথদার কথাই মনে পড়ে

> আমার মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি
> আহা
> সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
> ধূসর মৃত্যুর মুখ—একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা
> ছিল যাহা....

'মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা'— এই বাংলা ভাষারই অধ্যাপক ছিলেন বিশ্বনাথ রায়—অর্থাৎ তাঁর জীবিকা। তাই রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের স্থায়ী আসন ছিল তাঁর কণ্ঠে। শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকলেও, সবাই জানতেন তাঁর হৃদয় অধিকার করে আছে শ্রীঅরবিন্দ চর্চা।

বিশ্বনাথ রায় অথবা আমাদের সকলের বিশ্বনাথদার প্রয়াণের পর মাত্র কয়েকটি

বছর আমরা অতিক্রম করেছি। জগৎ প্রকৃত অর্থেই চলমান—তাই দীর্ঘস্থায়ী শূন্যতা বলে বোধহয় কিছু হয় না। প্রকৃত কর্মীরা কাজ করে যান, প্রস্থানের সময় রেখে যান সূচি— পরিকল্পনার কর্মসূচি। সার্থক সংগঠক আসলে অনেকটা রিলেরেসের অধিনায়ক, কর্মদণ্ডটি ধরে নেবার মতো মানুষ প্রস্তুত করে যান। আর ক্ষেত্র প্রস্তুত করার একটা জন্মগত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বিশ্বনাথদা।

আমাদের মৃত্যুর দিনটি আমরা কেউই জানি না। কিন্তু সবাই সচেতনভাবে সেটি পিছিয়ে দিতে চাই। সেই পিছিয়ে দেবার রহস্যটা কিন্তু লুকিয়ে আছে কাজের মধ্যে। প্রসঙ্গত বেলুড় মঠের এক প্রবীণ মহারাজের কথা মনে পড়ে গেল। প্রিয়লাল মহারাজ, দীর্ঘদিন গত হয়েছেন। তিনি বলতেন, যখন কাজ করবে তখন ভাববে আমি হাজার বছর বাঁচব আমার মৃত্যু নেই। আর যখন প্রার্থনায় বসবে তখন আকুল হয়ে তাঁকে ডাকবে, যেন এটাই তোমার শেষ প্রার্থনা। বিশ্বনাথদার জীবন পরিক্রমা দেখলে এই কথাগুলোই যেন মনে পড়ে যায়। জীবনানন্দের কবিতার মতো তিনিও বোধহয় হাজার বছর ধরে পথ হাঁটতে চেয়েছিলেন তার কাজকে সঙ্গী করেই। স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর চলে যাওয়ার বয়স হয়নি একথা বলব না, কিন্তু তবুও বলব বিশ্বনাথদার মৃত্যু অকালমৃত্যু। শ্রীমা ৮০ বছরের পর প্রকৃত জীবন শুরুর কথা বলেছিলেন। তাই মাত্র ৮২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু তো অকালমৃত্যু বটেই।

'চিত্ররূপময়' জীবনে তাঁর কাজের ধারাগুলো ছিল সুস্পষ্ট। বিভিন্ন কাজে যথাযথ ভূমিকা যেমন পালন করেছেন সেই ভূমিকা ভাগ করে দিয়েছেন তাঁর কর্মসঙ্গীদের মধ্যেও সেই একই বিচক্ষণতায়। তাঁর কাজের একটি বিশেষত্ব ছিল তিনি কাউকে অনুসরণ করেননি। পূর্বসূরিদের মধ্যে role model খোঁজেন নি। চিত্রনাট্য তিনি নিজে তৈরি করেছেন। মানস কোষাগারে তিনি ছিলেন প্রকৃতই বিত্তশালী। তাই গতানুগতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে সহজেই নির্মাণ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ পথের স্বর্ণচতুর্ভুজ। পথের সাথীদের নিয়ে এই নতুন পথে শুরু হয়েছিল তাঁর এগিয়ে চলা। এই এগিয়ে চলার গতি তাঁর অগ্রগামী বার্ধ্যক্যেও বিন্দুমাত্র শ্লথ হয়নি।

প্রথমেই যে ভূমিকাটির কথা মনে পড়ে, তা হল তাঁর বক্তৃতার মুন্সিয়ানা। তিনি ছিলেন কথার architect, শব্দচয়নে পারদর্শী। প্রতিটি বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতি ও অধ্যবসায় ছিল তুলনাহীন। বিষয় সম্বন্ধে ছিলেন সচেতন, অকারণে বিভিন্ন বিষয়ে মিশ্রণের পক্ষপাতী ছিলেন না। বক্তৃতায় তাঁর মতো সময়নিষ্ঠ কম বক্তাই দেখা যায়। তিনি শুধু কুশলী বক্তা ছিলেন না, গতানুগতিকতার প্রাচীর অতিক্রম করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভাষণের এক উচ্চশ্রেণীর শিল্পী— জীবনমুখী artist। নন্দলাল বা যামিনী রায় যেমন ক্যানভাসে তুলির টান দিয়ে একটা সময় চিত্রকলা শেষ করতেন, বিশ্বনাথদাও যেন বক্তৃতার তেমনি এক রূপকার। শ্রোতারা আসলে বিশ্বনাথদার ক্যানভাস। তাঁর

কণ্ঠস্বরের ওঠানামা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেন ক্যানভাসে একটা ছবি আঁকা। শ্রোতারা সেই কণ্ঠের জাদুতে হতেন মুগ্ধ প্রতিবারেই পেতেন অনাস্বাদিত তৃপ্তির পরশ। তাঁর ভাষণ আসলে ছিল শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে একটা সমান্তরাল আনাগোনা। তাই তিনি ভাষণ-বিলাসী নন, ভাষণের যাদুকর।

তাঁর ভাষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল—যে সব ভক্তদের spiritual নিদ্রা বা আলস্য কাজের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত, তিনি ভাষণের তীব্র ঝংকারে তা চুরমার করে দিতেন। তাই তিনি শুধু একজন ভাষ্যকার নন, শ্রীঅরবিন্দ পরিমণ্ডলে তিনি একটি বিশেষ symbol হয়ে উঠেছিলেন—যেন মোহরাঙ্কিত। শুধু শিক্ষিত মানুষজনেরা নয়, অতি সাধারণ মানুষও আলোকিত হত এই symbol এর জোরে।

এবার আসি কেন্দ্রের কথায়। অনেক নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি, অসময়ে প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হয়ে যাওয়া কেন্দ্রকে নতুন উদ্যমে চালু করেছেন। যখন বলতে গেছেন একবারও দেখেননি কজন মানুষ তাঁর কথা শুনতে এসেছেন। দুজন বা চারজনের উপস্থিতিই তাঁর প্রাণশক্তিতে শতভক্তের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠত। মনে রাখতে হবে যে ইন্টারনেট যখন ভবিষ্যতের গর্ভে, সেই যান্ত্রিক অনগ্রসরতার যুগে তিনি কেন্দ্র গঠনে তাঁর উদ্বৃত্ত সময়ের সৎ ব্যবহারে হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃত শ্রমজীবী। এক অদৃশ্য শক্তির বলে,শুধু চুঁচুড়া নয়, আশ্রমের প্রবীণ আশ্রমিকদের একাধিকবার বিভিন্ন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মূলত কেন্দ্র গড়ার কারিগর।

'আমি সব জানি' এই বাক্যসমষ্টি তার অভিধানে ছিল না। তাই শেষদিন পর্যন্ত গবেষকের মানসিকতা বিসর্জন দেননি। শুধু শ্রীঅরবিন্দ বা শ্রীমা নয়, সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। মৌলিক গবেষণার সাফল্য নির্ভর করে পরিশ্রমী পাঠকের উপর। অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা তাঁর জন্মগত। শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে অনেক প্রয়োজনীয় পুস্তিকা তাই তৈরি হয়েছে তাঁরই সৌজন্যে। গবেষণায় দিন, তারিখ পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে কোনো গোঁজামিল তিনি বরদাস্ত করতেন না। ভবনে একদিন একটি ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলতে গিয়ে বললেন যে তিনি বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের জীবনের ঘটনাপঞ্জীতে এমন একটি তারিখও পাননি যেটি দুজনের মধ্যে সূত্রের স্মারক হতে পারে। বক্তৃতার শেষে আমি তাকে একটি সূত্রের কথা জানালাম। তিনি দেখার জন্য প্রায় ছুটতে ছুটতে আমাদের লাইব্রেরিতে এলে তাঁকে ১২ই জানুয়ারি শ্রীঅরবিন্দের ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে রওনা হবার তারিখটি দেখাই। সেই মুহূর্তের তৃপ্তির হাসিটি সত্যিই ভোলার নয়। বললেন, এত খুঁজেছি অথচ এমন একটি যোগাযোগ কি করে যে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল! এ যেমন একটা দিক, অন্যদিকে নিজেকে আবার তৈরি করেছিলেন এই বলয়ের একটি পরিপূর্ণ encyclopedia হিসেবে। যে কোনো জিজ্ঞাসার তাৎক্ষণিক জবাব দিতে পারতেন অনায়াসেই। তাই হয়ে উঠেছিলেন নবীন গবেষকদের মূল কাণ্ডারী। ধর্মশাস্ত্র নয়, অলংকার শাস্ত্র নয়, নীতিশাস্ত্র নয় তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দশাস্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারী।

শ্রীঅরবিন্দের গৌরবের দীপ্তি যখন বাংলায় কিছুটা ম্রিয়মাণ— তাঁকে জানা বা বোঝার জন্য সাধারণ মানুষের সামনে যখন একটি কুয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ, ঠিক তেমনি একটা সময় নতুন একটি স্বপ্নকে সঙ্গে নিয়ে সেই লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিশ্বনাথদা। যেন হয়ে উঠেছিলেন নবজাগরণের বার্তাবাহক:

"একদিন শুনেছ যে সুর,—
ফুরায়েছে — পুরানো তা, কোনো এক নতুন কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি, আমার মতন
আর নাই কেউ"

শ্রীঅরবিন্দের বোধিবলয়ে শ্রীমা যেন একটি শূন্যস্থান তাঁর জন্যে সংরক্ষিতই রেখেছিলেন। অচিরেই তাই দৃঢ় হয়েছিল হৃদয়ের কুটুম্বিতা। তাই শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর আনুগত্য চিরকাল ছিল ষোলআনা খাঁটি— কখনো খাদ মিশতে দেননি। এই ঋজুতাই তাঁকে সাহায্য করেছে শ্রীঅরবিন্দ চেতনার আলোকে মুক্তমনে বামপন্থী ভাবনার স্বরূপ মূল্যায়নে। আবার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর মননের সঙ্গী। শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের খতিয়ান বিশ্লেষণ তাই তাঁর যুগান্তকারী কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। youtube বা whatsapp যখন মানুষের মনোভূমি দখল করেনি তখন তিনিই একের পর এক যুগান্তকারী জিনিস প্রচলন করেছেন। 'class' কথাটা জনপ্রিয় হয়েছে তাঁর উদ্যোগেই। ভক্তদের মুখে মুখে তখন ঘুরত সেই শব্দ দুটি— 'বিশ্বনাথদার ক্লাস'। কলকাতা শ্রীঅরবিন্দ ভবনে 'মা' এবং 'সাবিত্রী'র ক্লাসে, লক্ষ্মী হাউস বা পাঠমন্দিরে বা হুগলির ভবনে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ক্লাস প্রত্যক্ষ করেছে প্রায় তিনটি প্রজন্ম। তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে তাই তিনি 'মাস্টার', আবার কনিষ্ঠদের কাছে 'মাস্টারমশাই'—এই ডাক শুনতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।

সর্বোপরি নবীন প্রাণে ঝংকার তোলার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। প্রবীণরা নয়, তাঁকে ঘিরে থাকত কচিকাঁচা—সবুজের দল। এই তরুণদলকে নিয়ে, প্রাজ্ঞ প্রবীণদের তত্ত্বাবধানে বিপুল জাঁকজমকের সঙ্গে একক অধিনায়কত্বে ১৯৮৯ সালে হুগলি চুঁচুড়া ভবনে রেলিক্স প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করেছিলেন।

বিভিন্ন কেন্দ্রে রেলিক্স প্রতিষ্ঠায় তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের ৭৫ তম বর্ষে প্রায় একক উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্স প্রতিস্থাপন করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের 'শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে'র পুনর্গঠনের প্রস্তুতিতে আর্থিক অনুদানের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ চর্চার একটি বাতাবরণ প্রস্তুতিতে। দীর্ঘ দিন নিয়মিত ক্লাস নিয়ে প্রায় মাঝরাতে কলকাতায় ফিরে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে

গেছেন। রাজ্যের বাইরে উড়িষ্যায়—সেই রাজ্যের সকল কেন্দ্রের ভক্তরা তাঁর কথা শোনার অপেক্ষায় থাকতেন। বয়স তাঁর কাছে সত্যিই ছিল একটি সংখ্যা মাত্র। দেহাবসানের আগে সেই রাজ্যেই গিয়েছিলেন তাঁর দীর্ঘ দিনের বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে।

বিশ্বনাথদাকে নিয়ে নানা কথার ফাঁকে তাঁর সংসার জীবনটাও যেন আমরা ভুলে না যাই। ব্যক্তিগত জীবন ও সংঘজীবন পরিচালনায় তিনি কোন ফারাক করেননি। তাঁর দিনযাপনে সদর আর অন্দর একাকার হয়ে গেছিল। কন্যার (পরমা) শিক্ষা উপলক্ষে তাঁর সহধর্মিণীকে (আমাদের প্রণতিদি) দীর্ঘদিন থাকতে হয়েছে পণ্ডিচেরিতে। এদিককার সংসার সামলেছেন তাঁর জন্মদাত্রী মাতাকে সঙ্গে নিয়ে। সেখানেও কোন ফাঁক রাখেননি।

বিশ্বনাথ রায়ের চলে যাওয়ায় আমরা এমন একটি বর্ণের মানুষকে হারিয়েছি যে জাতের ভদ্রলোক ক্রমশ যেন বিরল। সবার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন তিনিই। পরিপূর্ণ বাঙালি মানসিকতায় মোড়া এক অনন্য চরিত্র। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি আধুনিকতার smartness মিশে থাকত, কিন্তু বেশভূষায় কখনো স্বধর্ম ত্যাগ করেন নি, বিলিতি পোষাক কখনোই তাকে কর্জ করতে হয়নি। ধুতি চাদরে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের যথার্থ উত্তরসূরি।

শহর থেকে জেলা — তাঁর কাছে সবারই ছিল অবারিত দ্বার। কাকে দিয়ে কোন কাজ হবে এটি যথার্থভাবে নির্ধারণ করার শক্তি সবার থাকে না। অথচ এই নিবার্চনে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হত নির্ভুল। বাস্তব চিন্তা শক্তি তাঁকে এই দুরূহ কাজে সফল হতে সাহায্য করেছে। ম্যানেজমেন্টের আধুনিক রীতিনীতির প্রশিক্ষণ তাঁর ছিল না। অথচ সাফল্যের জন্য তথাকথিত বাণিজ্যিক দাপট তাঁকে দেখাতে হয়নি। বরং তাঁর শারীরিক ভাষায় ছিল একটা গভীর কোমলতা— এমন একটি অকপট ভঙ্গিমা যা ভেতর থেকে ফুটে ওঠে, কোন কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় তা অর্জন করা যায় না। এমন একটি মানুষ যখন বিদায় নেন তখন মনে হয় সত্যিই কি সব শেষ হয়ে গেল? পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে কি কিছুই পৌঁছবে না? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের কিছুটা আশ্বস্ত করেছেন। আমাদের শরীরের সব অংশই নাকি মিশে যেতে থাকে বায়োস্ফিয়ারে। তাঁর কথাতেই বলি "মোদ্দাকথা শরীরের প্রতিটি পরমাণু রয়ে যায় এই পৃথিবীর মায়াবিস্তারের কোলে। ধীরে ধীরে এর একটি বড় অংশ শোষণ করে গাছ। গাছ বেয়ে সেই সব পরমাণু পৌঁছায় প্রাণীতে। প্রাণ বেয়ে ফের প্রকৃতিতে..."। তাই অনেক যুগ পরে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যখন ডাল-ভাত খাবে সেই ডাল-ভাতে মিশে থাকবে বেশ খানিকটা আমাদেরই শরীর। আমাদের শরীরের অংশ দিয়েই তৈরি হবে তারও শরীর—'তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা'। এমন সব ব্যাখ্যা শুনলে ভরসা আসে বৈকি। আসলে শেষ নেই যার শেষ কথা কে বলবে।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে আশ্রয় করেই তাঁর জীবন প্রবাহ। এই সুদীর্ঘ জীবন-পথের

গন্তব্য নিয়ে তাঁর কোন সংশয় ছিল না। শ্রীঅরবিন্দই সেটি স্থির করে দিয়েছিলেন — 'মা-ই গন্তব্যস্থান, —তার মধ্যে সবই আছে, তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁর চেতনার মধ্যে বাস করলে আর সব আপনিই ফুটে যায়'।

শেষ প্রহরের কাছে এসে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে 'আরোগ্য নিকেতনে'র দিন বোধহয় ফুরোল। তারাশঙ্করের 'মশাই' এর মতো ধমনীতে মৃত্যুর নূপুরের ধ্বনি যেন শুনতে পেয়েছিলেন। তাই শেষের কদিন 'ডাকঘরের' 'অমলের' মতো ছিলেন চিঠির প্রতীক্ষায়। অবশেষে এক শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় সোমবার ১৪৩০ বঙ্গাব্দের ৯ ই জ্যৈষ্ঠ (২২.৫.২০২৩) সেই চিঠি এলো। পৃথিবী ছাড়ার ছাড়পত্র পেলেন বিশ্বনাথ রায়। গন্তব্য তো স্থির করাই ছিল।

ভুলিনি তোমায়

সুজন ঠাকুরতা
হুগলী

ভুলিনি তোমায়, হে সুজন কলমের প্রণতিতে
আজও তোমায় খুঁজে চলেছি, ভুলিনি যে তোমায়।
শ্রীমা-ঋষির ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে
সদাই তুমি ছুটে বেড়িয়েছ কলকাতাসহ ভারতের প্রান্তে প্রান্তে।

তোমার মহৎ কর্মধারায় আমরা প্রাণ পেয়েছি
উজ্জীবিত হয়েছি আজ তুমি নেই বলে
সেপ্টেম্বরের বিশেষ স্মৃতি কাঁদে,বছর জুড়ে ব্যথা
অনুভূত হয় শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস।

হুগলীতে যখন ঋষি অরবিন্দের পদার্পণ ঘটে,
তাঁর বাণী পৌঁছে দিতে তুমি করেছ নিরলস প্রয়াস।
আজ তোমার সৃষ্টি বিরাজমান—অক্লান্ত চেষ্টায়
গড়া এই ভবন, সাধনার নীরব প্রকাশ।

হুগলী থেকে উত্তরপাড়া, কলকাতা থেকে পণ্ডিচেরি,
ছিলে তুমি ঋষি অরবিন্দের বাণীর অন্যতম দূত।
যা পরম সৌভাগ্য আমার, প্রাপ্তি আমাদের
তোমার সুমধুর পরিভাষায় সাবলীল কণ্ঠে শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের বাণী
যেন ফিরে পেত প্রাণ।

কত সকাল সন্ধ্যা কাটিয়েছি এই পবিত্র অঙ্গনে,
ভুলিনি তোমায়, স্মরি শ্রাবণের বৃষ্টি ভেজা মনে,
তোমার বাগ্মীতায় প্রাণ পেত যে সাবিত্রী-গীতা।
মনের কোণে রয়ে গেছে সেই অস্মিতা।

বিশ্বনাথ দা

স্পন্দন মুখার্জী
কলকাতা

প্রায় কুড়ি বছরের যোগাযোগ বিশ্বনাথদার সঙ্গে। আমাদের জীবনে তাঁর প্রভাব একটা অন্য মানে খুঁজে দিয়েছে। তাঁর জীবনকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বাণীর উপর ভিত্তি করে। তার একটি হলো, তোমার লক্ষ্য যদি হয় অসীম আর সঙ্গতি সামান্য, তবুও কাজ করে চল কারণ কাজের দ্বারাই তোমার সঙ্গতি বেড়ে উঠবে। তিনি ছিলেন মূলত কর্মী। এই কর্মী অভিধাটিকে তিনি বিশেষ মূল্য দিতেন। একবার পণ্ডিচেরীতে একটি ছোটো ছেলে প্লেগ্রাউন্ডে বিশ্বনাথদাকে দেখে প্রশ্ন করেছিল- " তুমি কি শ্রীঅরবিন্দ অফিসের চাকরি করো?" বিশ্বনাথ দা হেসে উত্তর করেছিলেন "হ্যাঁ"। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন "এই আমার জীবনের সেরা সার্টিফিকেট"। স্বাভাবিক ভাবেই মা-শ্রীঅরবিন্দের কর্ম সংক্রান্ত বাণীগুলো তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে থাকত। তিনি স্মরণ করতেন, প্রয়োজনে ধ্যান বাদ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু কাজ নয়। একমাত্র কাজের মাধ্যমেই রূপান্তর আসা সম্ভব। আর এই কর্মপ্রবাহের কেন্দ্রে রয়েছেন মা, যিনি শিখিয়েছেন প্রতিদিনের কাজ কীভাবে হয়ে উঠতে পারে রূপান্তরের সাধনা। আর শ্রীঅরবিন্দের কথায়, "মা-ই গন্তব্য স্থান, তাঁর মধ্যে সব আছে, তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁর চেতনার মধ্যে বাস করলে আর সব আপনি ফুটে যায়।" শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে বিশ্বনাথদা এই মহামন্ত্রটির, যেটি আসলে শ্রীঅরবিন্দের বাংলায় লেখা একটি চিঠির অংশ, একটি ফ্যাকসিমিলি কপি বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের যোগের এটাই শুরু এবং শেষেরও কথা।

বিশ্বনাথবাবু

১৯৮৮ -'৮৯ সাল নাগাদ হবে, শ্রীঅরবিন্দ সাধনপীঠের (মালার) বড়রা আমাকে ভবনে পাঠালেন ১০ই এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দের Rclics প্রতিষ্ঠার উৎসব উদযাপনের চিঠি দিয়ে আসতে-

শ্রীঅরবিন্দ ভবনে - সেই আমার প্রথমবার যাওয়া..

চিঠিখানা কাকে দেই ?... কোথায় দেই ? কেউ একজন বললেন, .. ওঁনাকে দাও...

যাঁকে চিঠিখানা দিলাম এবং তিনি যেভাবে সেটি গ্রহণ করলেন .. তা আমার আজও মনে আছে..

মনে হ'ল যেন তিনি আমাকেই গ্রহণ করলেন.. চিনতাম না তাঁকে , মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলেছিলাম," যাবেন ।"

তাঁর উত্তর.. " নিশ্চয়ই "...

তারপর থেকে মালার ১০ ই এপ্রিলের উৎসবে প্রত্যেকবারই তিনি গিয়েছেন (অতিমারীর ওই বছর দুটি ছাড়া) .. হ্যাঁ, মালার ২০২৩ এর ১০ই এপ্রিলের উৎসবেই তাঁর শেষবার যাওয়া - অন্তিম ভাষণ.. শেষ মন্ত্রোচ্চারণ..

" নমো মাত্রে জগন্মাত্রে ভগবতৈ নমো নমঃ ।

মহাশক্তৈ , মহামূর্তৈ,মহাব্যক্তৈ নমো নমঃ ।।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত অঞ্চলের শতাব্দী প্রাচীন এই শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্রটির প্রসঙ্গ আসলেই আরও দশখানা কেন্দ্রের নাম চলে আসে, সেগুলি কোনো না কোনোভাবে সাধনপীঠের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত.. বেহালার সখের বাজার থেকে ডায়মন্ড হারবারের দলনঘাটা পর্যন্ত..

বিশ্বনাথবাবু সেগুলিতে প্রাণ সঞ্চারের সুকঠিন কাজটি করে গেছেন জীবনের শেষ দিন অবধি ..অর্ধমৃত.. মৃতপ্রায়.. জনশূন্য কেন্দ্রগুলি ক্রমে ক্রমে পুনর্জাগ্রত হয়েছে..

দক্ষিণবঙ্গের শুধু এই প্রতিষ্ঠানগুলিই বা কেন রাজ্যের জেলাগুলোতেও..আমাদের পরিচিত খ্যাতনামা অধিকাংশ কেন্দ্রগুলিতেও.. আজ যাঁরা কর্মপরিচালনার হাল ধরে আছেন , বক্তৃতায় - পাঠে- কথকতায় ছড়িয়ে দিচ্ছেন মা- শ্রীঅরবিন্দের অমৃতালোক...তাঁরা প্রায় সকলেই .. বিশ্বনাথদার হাতে গড়া ' ভাই- বোন' ।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলয়ে হিমাংশু নিয়োগীর পরে এই যুগ - বিশ্বনাথদার যুগ।

একবার কেউ একজন মাকে কলকাতায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানায় তার উত্তরে তিনি বলেন তিনি যেতে পারেন যদি সেখানকার শ্রীঅরবিন্দের স্পর্শ করা প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয় । বিশ্বনাথবাবু যেন এই দিব্যহস্তান্তরের কাজটিই করে গেলেন জীবনভর । কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় বিস্মৃতির ধূলায় আচ্ছন্ন শ্রীঅরবিন্দের কর্মস্থল গুলিকে সনাক্তকরণ করতে, সেগুলির ইতিহাস পুনরুদ্ধার করতে, তাদের প্রতি আমাদের সচেতন করতে, শ্রীঅরবিন্দের স্পর্শে পুণ্য ক্ষেত্রগুলিকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর যে কী আকূল প্রচেষ্টা ছিল.. তা তাঁর ভাবনা কর্মধারার মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে বার বার । কলেজ স্কোয়ারের হৃদকেন্দ্র পাঠমন্দিরে শ্রীঅরবিন্দের Relics সংস্থাপনা .. বিশ্বনাথবাবুর সেই অনন্য কৃতিত্ব, সেই আলোক বর্তিকার প্রজ্জ্বলন সূচনা..যা থেকে হয়তো কোনদিন মা ফিরে পাবেন ভগবানের ক্ষেত্রগুলি.. বিশ্বনাথ রায় সেই দিব্যকর্মেরই এক আধিকারিক পুরুষ ।

কেমন মানুষ তিনি ? সে বিচারের অধিকার আমার নেই। সেই কাজ করতে গেলে যতটা নিকটে যেতে হয়.. তাঁর তত কাছে আমি যাইনি.. প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ভারে তাঁর প্রতি আমার ভাব হারানোর ভয়ে..
খুব প্রয়োজন পড়লে.. কালেভদ্রে ভয়ে ভয়ে ফোন করতাম.. উত্তর আসতো.. " যাক্! তবু মনে পড়লো !"
তিনি আমার মন জুড়েই থাকতেন , আমাদের সাধনপীঠের সকলেরই.. আমরা জানি, শ্রীঅরবিন্দ সাধনপীঠ তার প্রায় শূন্য হ'য়ে যাওয়া অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তাঁর হাত ধরে কিভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে.. তাঁরই মনোনীত কর্মী, লোক,দান,পরামর্শ, সাহচর্য.. সব কিছু সম্বল করে..
সাধনপীঠের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে তাঁর মতামত ব্যাতিরেকে একটিমাত্র পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয় নি। আর মালা- শ্রীঅরবিন্দ সাধনপীঠকে জনমানসে পরিচিত করার ক্ষেত্রে বিশ্বনাথবাবুই সবথেকে বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। অনেকটা শ্রীমার মতো, শুনেছি আশ্রমে তিনি নাকি জনে জনে বলতেন ," মালায় যাও..মালার ভবিষ্যৎ আছে।"
সাধনপীঠকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল বিশ্বনাথবাবুর ...
আগামী বছর,২০২৬ এর ১০ই এপ্রিল.. মালার শ্রীঅরবিন্দ সাধনপীঠের পুণ্য অঙ্গনে গুরুদেবের Relics প্রতিষ্ঠার ৫০ বর্ষপূর্তি উৎসব হবে..
এই পরম লগ্নে তাঁকে কাছে পাবো না..
পাবো না তাঁর বক্তৃতার ' মাতৃপ্রসাদ' যা শুনে বুকে আশা জাগে.. শরীর মন জুড়ায়..
পাবো না তাঁর অমূল্য পরামর্শ , বুক ভরানো আশ্বাস..
মনে পড়ে, ২০১০ এ শ্রীঅরবিন্দের বঙ্গপর্বের শতবর্ষ উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দের এক ছোট আবক্ষ মূর্তি ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে ঘুরিয়ে কোলকাতায় আনা হয় জানুয়ারিতে, শ্রীঅরবিন্দ ভবনে,যেখান থেকে মূর্তিটিকে পন্ডিচেরী নিয়ে যাওয়া হবে.. শতবর্ষ আগে গুরুদেবের বঙ্গত্যাগের দিনক্ষণ অনুসারে ১লা এপ্রিল।
তখন ভবন থেকে বিভিন্ন কেন্দ্র পরিভ্রমণ করিয়ে মালায় সাধনপীঠে সেই মূর্তি এনে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল ৩১ শে জানুয়ারী। এবং শ্রীঅরবিন্দের বঙ্গপর্বের শতবর্ষ স্মারক উৎসবে আমরা এক দর্শন কার্ড প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই ; কিন্তু কোন বাণী দেওয়া যায় ?
শরণাপন্ন হলাম তাঁর.. তিনি বললেন ," ওই সালের ... ওই বাণীটা দ্যাখ।"
১লা এপ্রিল মূর্তি নিয়ে বিশ্বনাথবাবুর নেতৃত্বে যে দলটি কলকাতা থেকে পন্ডিচেরী গিয়েছিল সেই দলে ছিলাম আমি.. পন্ডিচেরীতে ৪ঠা এপ্রিল। গেষ্ট হাউসের বারান্দায় বিকাল ৪ টায় মূর্তিটিকে স্থাপন করা হয়, আজও সেখানে রয়েছে মূর্তিখানি..
৪ঠা এপ্রিল,২০১০ এর দর্শনে আশ্রমের মেসেজ কার্ডে ছিল..

" শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীকে বলতে এসেছিলেন এক সৌন্দর্যমন্ডিত ভবিষ্যতের উপলব্ধির কথা। তিনি কেবল আশা দিতেই আসেননি , এসেছিলেন পৃথিবী যে অত্যুৎকর্ষতার দিকে এগোচ্ছে সেই বিশ্বাসকে প্রতীয়মান করতে। এই পৃথিবী কোনও দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা নয় , এ এক অভিনব বিস্ময় যা প্রকাশিত হবার দিকে এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর প্রয়োজন সেই সুন্দর ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস রাখা। এবং শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন সেই নিশ্চিত আশ্বাস। "

-- শ্রীমা

২৭ নভেম্বর,১৯৭১

সকালে কার্ডখানা হাতে পাওয়া মাত্রই রোমাঞ্চিত হল আমার সর্বশরীর .. ছুটলাম কটেজে বিশ্বনাথবাবুর কাছে , আমার পাশের রুমে.."স্যার, দেখুন.. "
বিছানার উপর খালিগায়ে বসে থাকা মানুষটি চোখ দুটো বড় বড় করে পড়লেন বাণীটি.. তাঁর মুখপানি অপূর্ব হাসিতে ভরে উঠলো .. এই বাণীটিই তো তিনি মালার উৎসবের জন্য নির্বাচন করে দিয়েছিলেন......

কখনো নিভৃতে পেলে আমায় জড়িয়ে ধরে চুপচাপ বসে থাকতেন তিনি.. আমি জানি তাঁর এই ভালোবাসার প্রসাদ আমার মতো অনেকেই পেয়েছে .. কোন নির্জন নীরবতায়..

তাঁরই অযাচিত অন্তরঙ্গতায় তিনি আমার অনেক আব্দার..অনেক কথার প্রশ্রয় দিতেন..
খুব ইচ্ছা ছিল মালায় রাত কাটানোর..
আর আমি তাঁকে একা পেলে বলতাম ," সারাক্ষণ দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন, এবার একটু বসুন । সব ছেড়ে ছুড়ে চলে আসুন এখানে, থাকুন ক'টা দিন চুপ করে ।"
তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলতেন ," হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসবো, আসবো.. দুটো দিন এখানে থাকবো , কখন আসবো বলতো ?"
বলতাম, " পূর্ণিমায় আসুন ..

সাধনপীঠ জোৎস্নায় ডুবে যাবে..
ধীরে ধীরে নামবে Silence ..
.. ঝংকৃত তার ঝিল্লীর মঞ্জীর..."

"উফ্".. চীৎকার করে তিনি পাশে বসা আমাকে জড়িয়ে ধরতেন..

২০২৩ এর ৫ই মে দলনঘাটায় Relics প্রতিষ্ঠা উৎসব , গিয়ে শুনলাম বিশ্বনাথদা আসতে পারেন নি, অসুস্থ ।
কয়েকদিন পর স্বপ্ন দেখছি..
অনাবৃত উর্ধাঙ্গ, হাঁটু অবধি মালকোচা মারা ধূতি পরা, কাঁধে একখানা ঝোলা -- তেজোদৃপ্ত ঝকঝকে বিশ্বনাথ বাবু একখানা রাজকীয় ভবনের দালানে দাঁড়িয়ে.. তাঁর পাশে ছয় সাতজন তরুণ - আমিও আছি তাদের পিছনে ।
তিনি দলটির দিকে মুখ ঘুরিয়ে .. " চল্" বলে হন্ হন্ করে যাত্রা শুরু করলেন - দলটি তাঁকে অনুসরণ করলো...

বুঝলাম.. বিশ্বনাথবাবুর এখানকার পুরানো পথে চলা শেষ হয়ে গেছে .. শুরু হয়েছে তাঁর নূতন চলা... নূতন নির্মাণে ...

১০ই এপ্রিল,২০২৬ এ শ্রীঅরবিন্দ সাধনপীঠে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যদেহাবশেষ প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের প্রথম পত্রখানি তাঁকেই উৎসর্গ করবো আমি...

সুব্রত দলুই,১১/১১/২৫

রাণাঘাটে শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ সংস্থাপন ১লা আগস্ট ১৯৯৮

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে সংরক্ষিত বঙ্গীয় জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে
শ্রীঅরবিন্দের ব্যবহৃত চেয়ারের সামনে প্রণামরত বিশ্বনাথদা

ওড়িশার রাজগাংপুরে বক্তৃতারত ১৮/০৪/২০২৩

ওড়িশার রাজগাংপুরে ১৮/০৪/২০২৩

ওড়িশার রাজগাংপুরে ১৮/০৪/২০২৩

শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষাকেন্দ্র হুগলীর এক অনুষ্ঠানে ০৫/০৯/২০০৪

ঊষাগ্রাম বিকাশ কেন্দ্র নদীয়ায় শ্রীঅরবিন্দ জন্মজয়ন্তীতে বিশ্বনাথদা

শ্রীমায়ের রেলিকস্ হুগলী ভবনের সামনে ২০/১১/২০০৪

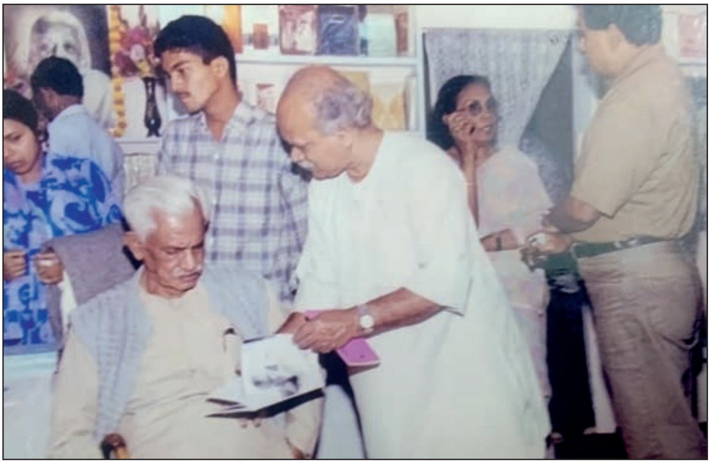

পাঠমন্দিরের স্টলে ১৯৯৮ বইমেলায় হিমাংশু দা, বিশ্বনাথ দা ও অন্যান্যরা

শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষাকেন্দ্র হুগলীর এক অনুষ্ঠানে ০৫/০৯/২০০৪

মায়ের পাদুকা প্রসাদ ভবন থেকে হুগলী ভবনে আনয়ন ২৪/০৪/১৯৯০

মায়ের পাদুকা হুগলী ভবনের সামনে ২৪/০৪/১৯৯০

হুগলী ভবনে শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ সংস্থাপন ০৬/০৯/১৯৮৯

হুগলী ভবন শ্রীঅরবিন্দ সৌধে ধ্যান ০৬/০৯/১৯৮৯

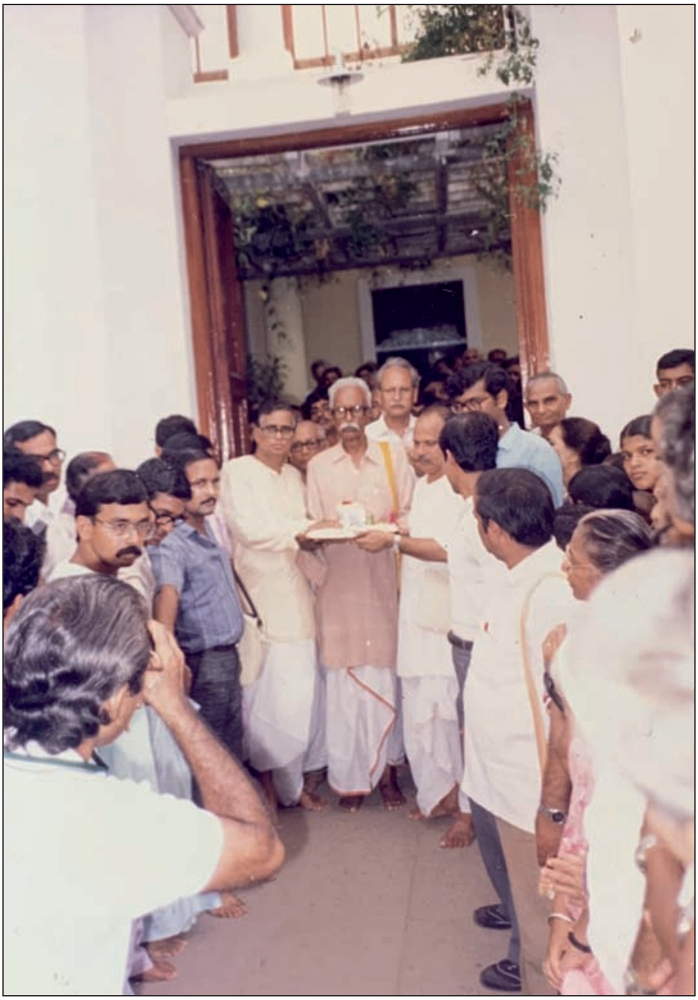

হুগলী ভবনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ নিয়ে
আশ্রম থেকে বেরোচ্ছেন ১৯৮৯

হুগলী ভবনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ কলকাতা ভবনে ০২/০৯/ ১৯৮৯

হুগলী ভবনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ নিয়ে
আশ্রম থেকে ৩০/০৮/১৯৮৯

হুগলী ভবনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ হাওড়া স্টেশনে ০১/০৯/১৯৮৯

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নামছেন
হুগলী ভবনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ নিয়ে ০১/০৯/১৯৮৯

পাঠমন্দিরের জন্য আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ গ্রহণ আগস্ট ২০১৬

চন্দননগর রেল স্টেশনে হুগলী ভবনের জন্য
শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ ০৪/০৯/১৯৮৯

শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ এলো শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
কলকাতায় ১৫ ই আগস্ট ২০১৬

পাঠমন্দিরে হিমাংশু নিয়োগীর স্মরণসভা ২০০১ সাল

কলকাতা পাঠমন্দিরে শ্রীঅরবিন্দের পাদপীঠিকা
foot-stool স্থাপন অক্টোবর ২০০২

শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির কলকাতা থেকে
আন্দুল কেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা

শ্রীমা

শ্রীমা

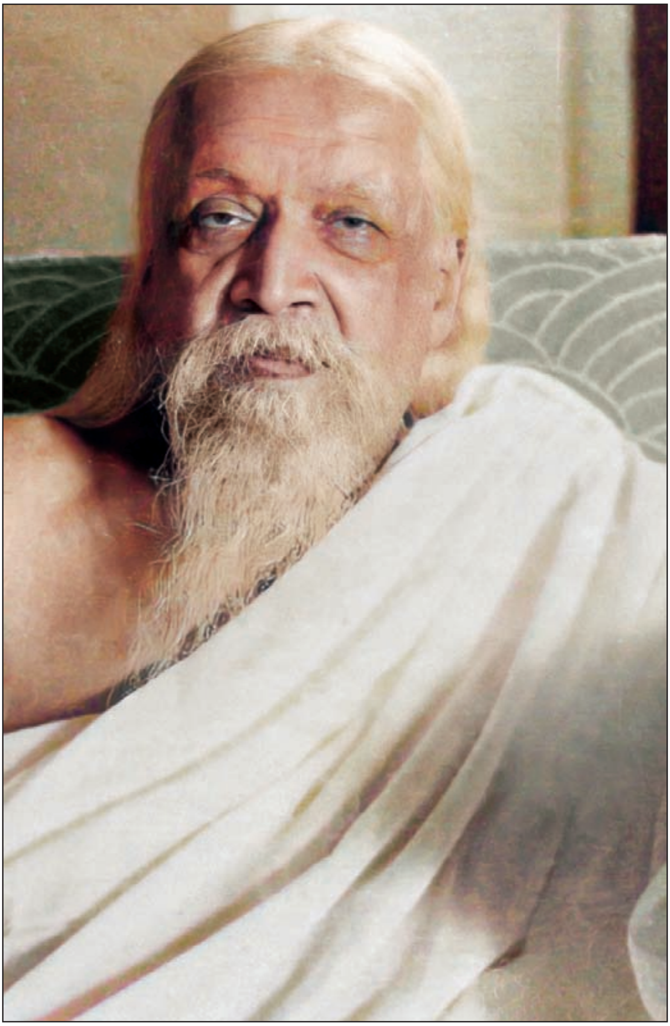

শ্রীঅরবিন্দ

২৭ শে জুন ২০২২ হাওড়া টাউন হলের নিচে
বন্দেমাতরম্ সংগীতের পর, বিশ্বনাথদার বক্তৃতা।

শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ সংস্থাপন শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির কলকাতায়
মনোজ দাশের সঙ্গে ১৫ ই অগাস্ট ২০১৬

পন্ডিচেরী থেকে পাঠমন্দিরের উদ্দেশে শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ নিয়ে রওনা

২রা মে, শ্রীঅরবিন্দের উত্তর কলকাতাতে গ্রেপ্তার হবার দিন উপলক্ষে,
কলকাতা শ্রীঅরবিন্দ ভবনের অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথ দা ও বিশ্বজিৎ দা।

শ্রীঅরবিন্দ সাধনপীঠ মালা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

উষাগ্রামে গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে

৩০শে মে ২০০৯ উত্তরপাড়া শ্রীঅরবিন্দ পরিষদ-এর জন্য
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ গ্রহণ

৩১শে আগস্ট ২০১৫ মালদায়

শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ সংস্থাপন পাঠমন্দির, কলকাতা ১৫ই আগস্ট ২০১৬

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়

গ্রন্থ পরিচিতির জন্য নির্ধারিত স্থানে তাঁকে নিয়ে দু-একটি কথা। অতিরিক্ত এই দু-একটি কথা আসলে প্রাককথনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রসারণ মাত্র—মূলকথার পর সারকথা। গত চারটি দশকেরও অধিক বিশ্বনাথদা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের ও এই রাজ্যে মায়ের স্পর্শধন্য তাঁর পূর্বসূরী ও যে সব প্রবীণ অগ্রজদের নির্দেশে ও পরামর্শে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউই প্রায় আজ আর ইহলোকে নেই। নাই বা পেলাম তাঁদের মূল্যায়ন—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা তাঁদের দেহাবসানের আগে এই নিশ্চিন্ততাটুকু নিয়েই বোধহয় দেহত্যাগ করেছেন যে মায়ের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে 'বিশ্বনাথ' রইলো।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় স্বনামধন্য শ্রীঅরবিন্দ বিশেষজ্ঞ শুধু নন— গবেষক, বিশিষ্ট সংগঠক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী ও বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে শিক্ষক এবং শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ—ব্যক্তিত্বের এমন ব্যাপ্তিকে 'স্মরণ অর্ঘ্য'র বাক্যবন্ধে বেঁধে রাখবে কে? তাঁর নিজস্ব রচনার পাশাপাশি এখানে রয়েছে আকর্ষণীয় আলোকচিত্রের সম্ভার। নবীনে-প্রবীণে মিলে কমবেশি যাটোর্দ্ধ রচনার এই সংকলনের লেখাগুলি কিন্তু কষ্টকল্পিত নয়—অতিরঞ্জনের প্রচেষ্টাও নেই বিন্দুমাত্র। এ হলো প্রিয়জনদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির অর্ঘ্য। দুই মলাটের মধ্যে ধরা আছে চেনা-অচেনা বিশ্বনাথদা। একদিকে পাঠক তৃপ্তিবোধ করবেন চেনা মানুষটিকে ফিরে পেয়ে, অন্যদিকে আবার পাঠক অনুভব করবেন অচেনা বিশ্বনাথ রায়কে আবিষ্কারের রোমাঞ্চ।